সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক দর্শন
ও
সাম্প্রতিক বিশ্বে এর ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি.
ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. এ. কে. এম. হারুনার রশীদ
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
সিত্তুল মুনা হাসান
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৯৫
শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

জুন, ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
কলা অনুষদ

অনুমোদনপত্র

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, ***সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক দর্শন ও সাম্প্রতিক বিশ্বে এর ভূমিকা*** শিরোনামে রচিত যে অভিসন্দর্ভটি **সিত্তুল মুনা হাসান** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে উপস্থাপন করেছেন, সেটি আমার তত্ত্বাবধানে করা একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এ অভিসন্দর্ভে প্রণীত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তসমূহ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ইতোমধ্যে কোনো ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, গবেষণাকর্ম বা এ জাতীয় কোনো কাজে ব্যবহার করা হয়নি।

স্থান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
তারিখ: সেপ্টেম্বর, ২০১৫ ইং

তত্ত্বাবধায়ক: ড. এ.কে.এম. হারুনার রশীদ
বিভাগ: দর্শন

নির্যাস

১৯১৬ সালে লেনিন প্রদত্ত সাম্রাজ্যবাদতত্ত্বটি সাম্প্রতিক বিশ্বেও প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। সাম্প্রতিককালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে এ বাস্তবতার প্রতিফলন পাওয়া যায়। সমকালীন সাম্রাজ্যবাদী তাত্ত্বিকদের অনেকেই বলতে চেয়েছেন, একটি নির্দিষ্ট ধারা অতিক্রান্ত হওয়ার পর আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদের আর কোনো অস্তিত্ব নেই, তবে উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী যুগের পর 'সাম্রাজ্য' এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রথম অধ্যায়ে আমি এ দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করেছি। লেনিন পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের যে চরিত্র নিরূপণ করেছিলেন, বহু ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পরেও তার মূল বৈশিষ্ট্য এখনও অটুট রয়েছে। এ বিষয়টি প্রমাণ করতে গিয়ে আমি পুরো অভিসন্দর্ভজুড়ে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে তাঁর তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। বাজার ও সম্পদ দখলের মতো অর্থনৈতিক শোষণকে বিশ্বায়নের তাত্ত্বিক আবরণে বৈধ করে তোলার কৌশলটিও দার্শনিক বিশ্লেষণের দাবিদার। এছাড়াও তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের পরিচালিত অন্যায় যুদ্ধ, হত্যা, নির্যাতন, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত আগ্রাসন নৈতিকতার নিরিখে যাচাইযোগ্য। এই বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশের অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং মানব-উন্নয়ন খাতসহ সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কতটা নির্মমভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার একটি রূপরেখা দাঁড় করানো হয়েছে।

এ গবেষণায় লেনিনপ্রদত্ত সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতামূলক তথ্যের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা আমাদের বলে দেয়, ক্ষয়িষ্ণু পর্বে এসে সাম্রাজ্যবাদ আরও উগ্র ও যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠেছে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে নতুন করে যুদ্ধোন্মাদনা কীভাবে বিশ্বকে আরও একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তৃতীয় অধ্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের সমরবাদী চরিত্র বিশ্লেষণ করে এ সত্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো কীভাবে বিশ্বায়নকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে নতুনভাবে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছে তার একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে, আমি দেখাতে চেয়েছি পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব (যার ঐতিহাসিক ভিত্তি ও সাম্প্রতিক বিকাশ সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে) একটি বিশ্ববিপ্লবের পটভূমি নির্মাণ করবে।

সর্বশেষ অধ্যায়টি সার্বিক বিশ্বপরিস্থিতির একটি চূড়ান্ত ফলাফলের ইঙ্গিত বহন করে। সাম্প্রতিক বিশ্বের প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা বলে দেয়, একটি বৈষম্যমূলক অন্যায্য বিশ্বব্যবস্থা দীর্ঘদিন চলতে পারে না। মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদে সমাজকাঠামো পরিবর্তনের এরকম একটি দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। এ অভিসন্দর্ভের শেষ কাজটি হলো কেন ও কীভাবে একটি অসাম্যভিত্তিক আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমতা ও ন্যায্যতার দিকে ধাবিত হবে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা। অর্থাৎ, লেনিনের বিশ্ববিপ্লবের ধারণাটি পুনর্মূল্যায়নের একটি প্রয়াসও এখানে নেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের আমার অনেক শিক্ষকের কাছ থেকে উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় সমর্থন পেয়েছি। বিশেষ করে যাঁর সহযোগিতা ছাড়া কখনোই এ কাজটি সুসম্পন্ন হতো না, তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. এ.কে.এম. হারুনার রশীদ। এছাড়া অধ্যাপক ড. নাইমা হক এবং অধ্যাপক মোঃ নূরুজ্জামান গ্রন্থ, সাম্প্রতিক গবেষণা কর্ম এবং পরামর্শ দিয়ে আমার কাজকে সহজ করে দিয়েছেন। আমি তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমার অভিভাবকবৃন্দের আবেগাত্মক ও বৌদ্ধিক অনুপ্রেরণা সবসময়ই আমার চলার পথের পাথেয়। এ অভিসন্দর্ভটি আমি রচনা করেছি তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য যারা আগামি দিনে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
অনুমোদনপত্র	....	অ
নির্যাস	....	আ
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	....	ঈ
সূচিপত্র	....	উ
প্রথম অধ্যায়	**সাম্প্রতিককালে সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ....**	১
	সাম্প্রতিককালের সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি	২
	সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি	৫
	লেনিনের সাম্রাজ্যবাদতত্ত্ব	১১
	সাম্প্রতিককালে লেনিনের তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা	১৮
	লেনিনের তত্ত্ব মূল্যায়ন	৩৯
	উদারপন্থী তাত্ত্বিকদের যুক্তি খণ্ডন	৪৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	**বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা ....**	৬৮
	রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান	৬৯
	প্রান্তিক অর্থনীতির দেশ	৭৮
	মানব-উন্নয়নে দূরবস্থা	৮৩
	সাম্রাজ্যবাদী সামরিকায়ন	৮৮
তৃতীয় অধ্যায়	**সাম্রাজ্যবাদের সমরবাদী নীতি...........................**	৯৬
	লেনিন প্রদত্ত যুদ্ধের শ্রেণীবিভাগ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ	৯৭
	মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমরবাদী নীতি	৯৯
	ডকট্রিন আকারে সমরবাদ	৯৯
	সমরবাদী নীতির প্রকৃত কারণ	১০১
	যেসব মিথ্যাচারের মাধ্যমে সামরিক আগ্রাসন চালানো হয়	১০৪

	মার্কিন সমরবাদের ন্যায্যতা প্রতিপাদন	১১০
	নৈতিকতার নিরিখে মার্কিন সমরবাদ	১১৫
চতুর্থ অধ্যায়	**সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন........................**	১৪২
	অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতি	১৪৩
	রাজনৈতিক বিশ্বায়ন ও গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া	১৫১
	সামরিক বিশ্বায়ন ও হস্তক্ষেপের বৈধতা	১৬০
	পরিবেশগত বিশ্বায়ন ও অস্তিত্বের সংকট	১৬৮
	সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন ও মানসিক দাসত্ব	১৭৩
পঞ্চম অধ্যায়	**সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নৈতিকতা ....**	১৮৩
	অন্যায় যুদ্ধ, হত্যা ও নির্যাতন	১৮৬
	অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক কূটকৌশল	২০১
	পরিবেশ বিপর্যয়	২০৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	**সাম্রাজ্যবাদের পরিণাম ও একটি বিশ্ববিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতা ....**	২৩৫
	পুঁজির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব	২৩৫
	প্রজাতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের মধ্যকার দ্বন্দ্ব	২৩৮
	শোষক শ্রেণীর সঙ্গে শোষক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব	২৪৪
	পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব	২৪৬
	সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে তার জনগণের দ্বন্দ্ব	২৪৬
	তৃতীয় বিশ্বের জনগণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব	২৪৮
	একটি বিশ্ববিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতা	২৫২
	গ্রন্থপঞ্জি	২৮১

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার শিরোনাম: সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক দর্শন ও সাম্প্রতিক বিশ্বে এর ভূমিকা

নির্যাস

১৯১৬ সালে লেনিন প্রদত্ত সাম্রাজ্যবাদতত্ত্বটি সাম্প্রতিক বিশ্বেও প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। সাম্প্রতিককালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে এ বাস্তবতার প্রতিফলন পাওয়া যায়। সমকালীন সাম্রাজ্যবাদী তাত্ত্বিকদের অনেকেই বলতে চেয়েছেন, একটি নির্দিষ্ট ধারা অতিক্রান্ত হওয়ার পর আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদের আর কোনো অস্তিত্ব নেই, তবে উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী যুগের পর 'সাম্রাজ্য' এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রথম অধ্যায়ে আমি এ দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করেছি। লেনিন পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের যে চরিত্র নিরূপণ করেছিলেন, বহু ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পরেও তার মূল বৈশিষ্ট্য এখনও অটুট রয়েছে। এ বিষয়টি প্রমাণ করতে গিয়ে আমি পুরো অভিসন্দর্ভজুড়ে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে তাঁর তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। বাজার ও সম্পদ দখলের মতো অর্থনৈতিক শোষণকে বিশ্বায়নের তাত্ত্বিক আবরণে বৈধ করে তোলার কৌশলটিও দার্শনিক বিশ্লেষণের দাবিদার। এছাড়াও তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের পরিচালিত অন্যায় যুদ্ধ, হত্যা, নির্যাতন, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত আগ্রাসন নৈতিকতার নিরিখে যাচাইযোগ্য। এই বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশের অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং মানব-উন্নয়ন খাতসহ সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কতটা নির্মমভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার একটি রূপরেখা দাঁড় করানো হয়েছে।

এ গবেষণায় লেনিনপ্রদত্ত সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতামূলক তথ্যের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা আমাদের বলে দেয়, ক্ষয়িষ্ণু পর্বে এসে সাম্রাজ্যবাদ আরও উগ্র ও যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠেছে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে নতুন করে যুদ্ধোন্মাদনা কীভাবে বিশ্বকে আরও একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তৃতীয় অধ্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের সমরবাদী চরিত্র বিশ্লেষণ করে এ সত্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো কীভাবে বিশ্বায়নকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে নতুনভাবে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছে তার একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে, আমি দেখাতে চেয়েছি পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব (যার ঐতিহাসিক ভিত্তি ও সাম্প্রতিক বিকাশ সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে) একটি বিশ্ববিপ্লবের পটভূমি নির্মাণ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশেষ অধ্যায়টি সার্বিক বিশ্বপরিস্থিতির একটি চূড়ান্ত ফলাফলের ইঙ্গিত বহন করে। সাম্প্রতিক বিশ্বের প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা বলে দেয়, একটি বৈষম্যমূলক অন্যায্য বিশ্বব্যবস্থা দীর্ঘদিন চলতে পারে না। মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদে সমাজকাঠামো পরিবর্তনের এরকম একটি দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। এ অভিসন্দর্ভের শেষ কাজটি হলো কেন ও কীভাবে একটি অসাম্যভিত্তিক আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমতা ও ন্যায্যতার দিকে ধাবিত হবে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা। অর্থাৎ, লেনিনের বিশ্ববিপ্লবের ধারণাটি পুনর্মূল্যায়নের একটি প্রয়াসও এখানে নেওয়া হয়েছে।

গবেষকের নাম: সিত্তুল মুনা হাসান
রেজি. নং.: ৯৫
শিক্ষাবর্ষ: ২০১০-২০১১
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

সাম্প্রতিককালে সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র

মার্কস পুঁজিবাদের গতি ও বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। পুঁজিবাদ বিশ্লেষণের মার্কসীয় ধারণার উপর ভিত্তি করে লেনিন প্রতিষ্ঠা করেছেন সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক তত্ত্ব *সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়*[১] গ্রন্থে তিনি এ মতবাদকে সূত্রবদ্ধ করেন। লেনিন বলেন, পুঁজিবাদের বিকাশের সেই পর্যায়কে সাম্রাজ্যবাদ বলা হয় যে পর্যায়ে একচেটিয়া কারবার ও মহাজনী পুঁজি প্রাধান্য লাভ করে।[২] শিল্প ও ব্যাংকে কীভাবে একচেটিয়ার উদ্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি তাঁর গ্রন্থে ব্যাপক তথ্য প্রদান করেছেন। তিনি আরো দেখান, শিল্প ও ব্যাংকের সংমিশ্রণে যে ফিন্যান্স পুঁজির জন্ম তা গোটা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অধিকতর মুনাফার স্বার্থে এই ফিন্যান্স চলে যায় অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশে। ফিন্যান্স পুঁজি ও তাকে ঘিরে যে ফিন্যান্সিয়াল অলিগর্কি[**] তৈরি হয় তারাই এ যুগের শাসক ও শোষক শ্রেণী এবং তাদের স্বার্থে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নীতি তৈরি হয়। মার্কসের ভবিষ্যদ্ববাণী, হবসনের *Imperialism*[৩] (১৯০২) ও হিলফর্ডিং-এর *Finance Capital*[৪] গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর সময়কার রাজনৈতিক-অর্থনীতি পর্যালোচনা করে লেনিন তাঁর (১৯১৬ সালে রচিত) গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের যে চরিত্র বিশ্লেষণ করে গেছেন তা সাম্প্রতিককালেও অক্ষুণ্ন রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে শোষণ আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করায় সমগ্র বিশ্ব শোষিত ও শোষক–এ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে সাম্প্রতিককালে পুঁজিবাদী উৎপাদনের ব্যাপক আন্তর্জাতিকীকরণ ও পুঁজির অবাধ চলাচল জন্ম দিচ্ছে সমাধানহীন পুঁজি সংকটের যা দেশে দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতার জন্ম দিচ্ছে। আলোচ্য অধ্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি নিরূপণের পাশাপাশি লেনিনের তত্ত্বের মূল্যায়ন এবং সাম্প্রতিককালে তাঁর তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা ও সাম্রাজ্যবাদতত্ত্বের সমালোচকদের যুক্তি খণ্ডনের একটি প্রয়াস নেয়া হবে।

---

[*] লেনিন মনে করেন, পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক ও শিল্প পুঁজির সংমিশ্রণের প্রক্রিয়াটিও বিপুল গতিতে এগিয়েছে। গুটিকয়েক মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত ও একচেটিয়া অধিকারে প্রতিষ্ঠিত মহাজনী বা ফিন্যান্স পুঁজি এখন কোম্পানি চালু করা, বাজার স্টক ছাড়া, সরকারী লোন ছাড়া প্রভৃতি থেকে বিপুল থেকে বিপুলতর মুনাফা অর্জন করছে। এই ফিন্যান্স পুঁজি তাই ফিন্যান্সিয়াল অলিগর্কি বা মহাজনী মোড়লতন্ত্রের আধিপত্যকে আরও বৃদ্ধি করছে। এই ফিন্যান্সিয়াল অলিগর্কি একটি রাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম ও সরকারের ওপরও পূর্ণাঙ্গ আধিপত্য বিস্তার করে। এভাবে সমগ্র প্রজাতন্ত্রই হয়ে ওঠে মহাজনী মোড়লতন্ত্রের করতলগত।

সাম্প্রতিককালে সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি

পুঁজির ক্রমাগত ঘনীভূতকরণ ও কেন্দ্রীকরণের ফলে একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভব হয়। পুঁজিবাদের পরিণতাবস্থায় একচেটিয়া পুঁজির জন্ম। লেনিন বলেছেন, বিংশ শতাব্দীতে আমরা নতুন ধরনের একচেটিয়া গড়ে উঠতে দেখেছি। প্রথমত, সকল পুঁজিবাদী উন্নত দেশে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর সমিতি গড়ে উঠেছে এবং দ্বিতীয়ত, অল্পসংখ্যক খুবই ধনী দেশের একচেটিয়া অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে পুঁজির পুঞ্জীভবন বিশাল আকার ধারণ করেছে। অগ্রসর দেশগুলোতে বিপুলাকার পুঁজির উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, এই উদ্বৃত্ত পুঁজি নিজ দেশের অনগ্রসর অঞ্চলকে উন্নত করা বা ক্ষুধার্ত মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যবহৃত হওয়ার পরিবর্তে উচ্চ মুনাফার আশায় রপ্তানি করা হচ্ছে অনুন্নত দেশগুলোতে। কেননা এসব অনুন্নত দেশে সাধারণত উচ্চ মুনাফা অর্জন সম্ভব। সেইসঙ্গে এসব দেশে পুঁজির ঘাটতি আছে, জমির দাম কম, মজুরীর মাত্রা নীচু, কাঁচামাল সস্তা। এই পুঁজি রফতানির মধ্য দিয়ে অনুন্নত দেশগুলো বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আওতায় আসছে। সাম্প্রতিককালেও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে তাদের আধিপত্য বহাল রাখতে সচেষ্ট। সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, বহুজাতিক কোম্পানি বা কর্পোরেশনগুলোর* ক্ষমতা এখন সমস্ত জাতি রাষ্ট্রের উর্ধ্বে স্থান পাচ্ছে। গ্যাট চুক্তি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) নামে ১২০টি দেশের এক আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরি করেছে যার আইনগত অবস্থান জাতিসংঘের অনুরূপ। তাই আজকের বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র অপরাপর শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর সাম্রাজ্যবাদী আচরণ কিছুটা ভিন্নতর হলেও মূলত তার চরিত্র সাম্রাজ্যবাদীই এবং লেনিনীয় বিশ্লেষণ এখানেও একইভাবে কার্যকর।

সাম্প্রতিককালে প্রায় চারশো ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানি পৃথিবীর মুক্তবাজারের মূলধনী সম্পদের প্রায় ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। এছাড়াও উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের তিন-চতুর্থাংশ দখল করে রেখেছে। 'তৃতীয় বিশ্ব' বলে পরিচিত এসব দেশের দারিদ্র্যকে অধিকাংশ পশ্চিমা পণ্ডিতই একটি মৌলিক ঐতিহাসিক অবস্থা

---

* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বহুজাতিক কোম্পানির আবির্ভাব ঘটে। বহুজাতিক কোম্পানি হচ্ছে সেইসব বৃহদাকার কোম্পানি যারা পৃথিবীর বহু দেশে ব্যবসা, শিল্প স্থাপন করে বিভিন্ন দেশে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

বলে বিবেচনা করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মার্কিন লেখক মাইকেল প্যারেন্টি* মন্তব্য করেন: "...... এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে সুদীর্ঘকাল ধরে উৎপাদিত হয়েছে খাদ্যশস্য; খনিজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে তাদের। কেবল এ কারণেই ইউরোপীয়রা এগুলো চুরি ও লুট করার জন্য এত বিপদ-আপদ মাথায় নিয়ে এসব দেশে গিয়েছে। বড়লোক হবার জন্য কেউই কোনো সম্পদহীন জায়গায় যায় না। তৃতীয় বিশ্ব খুবই সম্পদশালী। দরিদ্র কেবল সেসব দেশের মানুষ। সীমাহীন লুণ্ঠনের কারণেই শুধু এর মানুষেরা দরিদ্র।"[৫] তাই এ ধরনের দারিদ্রকে 'কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট' বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিশ্বের বৃহত্তম পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন নিজের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্য বৃহত্তম তেলক্ষেত্রগুলো দখলে আনাকে অপরিহার্য বলে মনে করছে। এ লক্ষ্যেই যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ায় নিজ সামরিক ঘাঁটিগুলো সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করছে।

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের প্রচারিত 'উন্নয়ন তত্ত্ব'কে তৃতীয় বিশ্ব শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। উন্নয়ন তত্ত্ব অনুযায়ী, পশ্চিমা বিনিয়োগের ফলে দরিদ্র দেশের শ্রমিকরা আধুনিক সব ক্ষেত্রে বাড়তি মজুরিতে অধিক উৎপাদনশীল কাজ পাবে। পুঁজি বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীরা তাদের মুনাফা পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে আরও পণ্য, কাজ, ক্রয়ক্ষমতা এবং বাজার সৃষ্টি করবে। এভাবেই অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ ও বিকশিত হবে।[৬] তবে বাস্তবতার সঙ্গে এ তত্ত্ব খুবই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলোর বিনিয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটেছে।[৭] সরাসরি ভর্তুকি ও বরাদ্দকৃত ভূমি প্রাপ্তি, সহজলভ্য কাঁচামাল, সস্তা শ্রম, বিনা করে অথবা ন্যূনতম করে ব্যবসা করার সুযোগ পাওয়া, স্বল্পসংখ্যক দুর্বল শ্রমিক ইউনিয়ন, ন্যূনতম মজুরির বিধান না থাকা, শিশু শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ, কর্মস্থলে দুর্ঘটনা হতে সুরক্ষা এবং ক্রেতা ও পরিবেশ রক্ষামূলক কোনো আইন না থাকা প্রভৃতি সুবিধালাভের কারণে তৃতীয় বিশ্ব এখন পশ্চিমা বৃহৎ বিনিয়োগকারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের শাসকগোষ্ঠী ভিন্ন পুঁজিবাদের বলয়ে বন্দী থাকায় নিজ দেশের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে প্রথম বিশ্বের দেশগুলোকে উপর্যুপরি বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করে এবং বিপুল পরিমাণে মুনাফা লোটার সুযোগ করে দেয়।

---

* মাইকেল প্যারেন্টি মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ঘোরতর সমালোচক একজন বামপন্থী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ। দেশে-বিদেশে বহু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করলেও মার্কিন মূলধারার বিরুদ্ধ মতাবলম্বন ও রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য তাঁকে সত্তরের দশক থেকে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে দেয়া হয়নি। তাঁর রচিত *দ্য এ্যাসাসিনেশন অব জুলিয়াস সিজার* পুলিৎজার পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল।

উপর্যুক্ত বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তৃতীয় বিশ্ব থেকে উচ্চহারে মুনাফা লুটেই ক্ষান্ত হয় না। আধিপত্যের জাল আরও সুদূরপ্রসারী বিস্তৃত করতে সৃষ্টি করে অসম বাজারব্যবস্থা, সেই সঙ্গে বৈদেশিক সাহায্যের নামে আরোপ করে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক দমন-পীড়ন। এছাড়াও প্রয়োজনে সামরিক আগ্রাসনের ভিত্তিতেও আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে পশ্চিমা শক্তিগুলো অত্যন্ত তৎপর। শুধু তাই নয়, ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলোর বিশ্বব্যাপী অবাধ বিনিয়োগ সুবিধা নিশ্চিত করতে ১৯৯৩ সালে GATT (General Agreement on Tariffs And Trade) চুক্তি সাধিত হয়। এর মধ্য দিয়ে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোই লাভ করছে অবাধ লুণ্ঠনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। একারণেই এনক্রুমাহ্ তাঁর *Neo-colonialism, The Last Stage of Imperialism* গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন, নব্য-উপনিবেশবাদের সারমর্ম হচ্ছে একটি রাষ্ট্র তাত্ত্বিকভাবে স্ব-শাসিত ও স্বাধীন এবং আন্তর্জাতিক সার্বভৌমত্বের সকল প্রকার কৌশলে বন্দী। বাস্তবে এর অর্থনৈতিক পন্থা ও রাষ্ট্রনীতি নির্দেশিত হয় বাইরে থেকে।[৮] গণতান্ত্রিক ধারণাসমূহ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 'পুরানো রীতির সাম্রাজ্যবাদ' জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলছে। একারণেই আজকের যুগের সাম্রাজ্যবাদ প্রায়শই 'মানবতাবাদ' এর ছদ্মাবরণে লুকায়িত থাকে এবং আন্তর্জাতিক সংঘগুলো সেভাবেই কাজ করে। এসব আন্তর্জাতিক সংঘ এমনভাবে কাজ করে যাতে প্রধান শক্তিগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘ এসব শক্তিশালী দেশগুলোকে যুদ্ধ বাধাতে সাহায্য করে। আবার জাতিসংঘ সেখানেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয়, যেখানে ধনী দেশগুলোর প্রয়োজন মিটে গেছে। তাই সুবোধসম্পন্ন অনেক মানুষই আজকাল জাতিসংঘকে আমেরিকা বা ন্যাটোর বিকল্প বলে থাকেন। যদিও জাতিসংঘকে সব জাতির মানুষের এক মহাসম্মিলন বলে মনে করা হয়, তথাপি যেকোনো ফলপ্রসূ সশস্ত্র আক্রমণের ক্ষেত্রে অল্পসংখ্যক শক্তিশালী সামরিক শক্তিগুলোই কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। শুধুমাত্র স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রই নিরাপত্তা পরিষদে তাদের স্বার্থবিরোধী সশস্ত্র আক্রমণের প্রস্তাব নাকচ করতে পারে।

জাতিসংঘ এখন বিশ্বমানবতার পরিবর্তে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে। এসব দেশের মুনাফা লোটার যুদ্ধে জাতিসংঘ সমর্থন জোগাচ্ছে। যেমন, ১৯৯১ সালে কুয়েতিদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার নামে জাতিসংঘ উপসাগরীয় যুদ্ধে সমর্থন জোগায়। কিন্তু ১৯৮০ সালে আমেরিকার রিগ্যান প্রশাসন যখন নিকারাগুয়ায় মাইন পেতে সেদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করছিল, তখন জাতিসংঘ

বাহিনী সেখানে হস্তক্ষেপ করেনি। সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনীতির এ সংকটকালে বেপরোয়া হয়ে ওঠা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শাসক শ্রেণীকে অব্যাহত সামরিক অভিযান বহাল রাখার জন্য চাপ দেয়। তাই একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে সাম্রাজ্যবাদ প্রকাশ্য সমরবাদের আশ্রয় নিচ্ছে। এসব সশস্ত্র আক্রমণে নেতৃত্বদানকারী দেশ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালির মতো নির্দিষ্ট অল্প কিছুসংখ্যক দেশকেই দেখা যায়। NATO*-ভুক্ত দেশগুলো এখন এ গ্রহের জন্য যেকোনো জাতির উপর কর্তৃত্ব করতে পারে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি

সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস পুঁজিবাদের চেয়েও সুপ্রাচীন। দাসযুগ ও সামন্তযুগেও সাম্রাজ্যবাদ ছিল। দাসযুগ বা সামন্তযুগে একটি দেশের দাসপ্রভু বা সামন্তপ্রভুদের রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশ গঠন করে দাসপ্রথা বা সামন্ত প্রথায় অপর দেশকে শোষণ করে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করা। পুঁজিবাদ বিকাশের পূর্বে পারস্য, মেসিডোনিয়া, রোম ও মুঘল সাম্রাজ্যে এরূপ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। তখনকার সম্রাট ও বিজয়ীরা মূলত লুণ্ঠন, উপঢৌকন, সোনা ও নামযশে অধিক আগ্রহী ছিল। এটি ছিল সাম্রাজ্যবাদের আদি রূপ। এভাবে বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত দেরীতে বিকাশমান ইউরোপীয় সাম্রাজ্য সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়। সভ্যতার প্রাথমিক পর্বে দেখা যায় যে, তারা আমেরিকা থেকে সোনা-রূপা লুণ্ঠনের পাশাপাশি এশিয়া থেকে মরিচ, আদা, লবঙ্গ, জায়ফল, দারুচিনি এবং সিল্ক ও অন্যান্য বস্ত্র আহরণের উদ্দেশ্যে অভিযান চালায়।

সুতরাং, ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাথমিক বিকাশ সম্ভব হয় বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে। এ বহির্বাণিজ্য আবার সম্পন্ন হতো অন্য দেশ দখল, জলদস্যুতা এবং লুটতরাজের মধ্য দিয়ে। এটাই ছিল পুঁজিবাদের প্রথম পর্বের যুগ, যাকে বলা যায় বাণিজ্য পুঁজির যুগ। তখনও পর্যন্ত বণিকশ্রেণী অর্থাৎ বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটেনে শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ঘটে। এ যুগকে বলা হয় শিল্প পুঁজির যুগ। এ যুগেই বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভে সক্ষম হয়। প্রথম পর্বে ইউরোপীয়রা আমেরিকা থেকে সোনা-রূপা লুট করে এশিয়ায় শান্তিপূর্ণভাবে বাণিজ্য

---

* North Atlantic Treaty Organization

Dhaka University Institutional Repository

করতো । কারণ তখনও তারা শিল্পগত ও সামরিক ক্ষেত্রে ভারত ও চীনের মত অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধিত হয়। এসময়ে পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়ারা সামন্তবাদকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। তাই এ যুগে তারা চীন ও ভারতেও উপনিবেশ স্থাপনে সক্ষম হয়।

পুঁজিবাদের প্রথম পর্বে রাজ্য দখলের দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, রাজস্ব হাতে রেখে জনগণকে নির্মমভাবে শোষণ করে রাজস্ব আদায় করা। এতে দখলকৃত দেশের অর্থ দিয়ে বিদেশ থেকেই পণ্য ক্রয় করা যায়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে থাকলে দখলকৃত দেশটি থেকে সস্তায় পণ্য ক্রয় করা যায়।[৯] অর্থাৎ, দখলকৃত দেশটির জনগণকে শোষণ করেই ইউরোপীয় বণিকরা প্রভূত মুনাফা সঞ্চয় করেছিল। পরবর্তীকালে এ মুনাফাই ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের শিল্প বিকাশে 'প্রাথমিক পুঁজি' হিসেবে কাজ করেছিল। ইউরোপীয়রা এরূপ ক্ষমতা ও রাজত্ব কায়েম করেছিল প্রচলিত ক্ষমতা কাঠামোর সহায়তায়। এভাবেই এশিয়া ও আফ্রিকার স্থানীয় শাসকরা ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রজা হিসেবে তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

পুঁজিবাদের দ্বিতীয় পর্বে শোষণের কৌশল পরিবর্তন হয়। এ পর্বে উপনিবেশবাদী নীতি পরিচালিত হয় শিল্পপুঁজির স্বার্থে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, পুঁজিবাদের প্রথম পর্বে, ভারতবর্ষ থেকে কুটির শিল্পজাত পণ্য রপ্তানী হতো ইউরোপে। এ পর্বে ব্রিটেন থেকে শিল্পজাত পণ্য আসতে শুরু করে ভারতবর্ষের বাজারে। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটেনে যেতে শুরু করলো শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য। ফলে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শিল্পপুঁজির জন্য বাজার ও কাঁচামালের যোগানদারে পরিণত হয়।

শিল্পপুঁজির যুগের পরে শুরু হয় পুঁজিবাদের তৃতীয়, সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ পর্যায়। এ যুগকে লেনিন একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগ বা ফিন্যান্স পুঁজির যুগ বলে আখ্যায়িত করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বৃটেনে পুঁজি একচেটিয়া রূপ পরিগ্রহ করে এবং ফিন্যান্স পুঁজির আবির্ভাব ঘটে। এসময় থেকে পুঁজির রপ্তানীর মধ্য দিয়ে শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদের আধুনিক যুগ। এ যুগের প্রকৃতি বোঝা যাবে সেসময়কার ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে যে পুঁজি

বিনিয়োগ করেছিল তা দিয়ে এদেশে কোনো শিল্পেরই বিকাশ ঘটেনি। এ পুঁজি দিয়ে যে রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছে, তাতে ব্রিটিশ শিল্পপণ্যের বাজার বিস্তৃত হয়েছে। এ পুঁজি দিয়ে যে খনিজদ্রব্য উত্তোলন করা হয়েছে, সেই খনি ব্রিটিশ শিল্পকে লাভবান করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদ নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। কারণ বিশ্বযুদ্ধের পরে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো রাজনৈতিক দখল ছাড়াই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কৌশল আবিষ্কার করে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, আইবিআরডি'র মতো প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ওপর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য। এ সময়ে পুঁজিবাদী বিশ্বের নেতৃত্ব চলে আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। ফিন্যান্স পুঁজির আধিপত্যের প্রাথমিক পর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নামে ভারতবর্ষ থেকে প্রভূত মুনাফা সঞ্চয় করেছিল। আর ফিন্যান্স পুঁজির দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী যুগে অর্থনৈতিক সাহায্যে'র ছদ্মাবরণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ওপর সর্বতোভাবে আধিপত্য বিস্তার করে। তাই সাহায্যের মাধ্যমে যে উন্নতির কথা বলা হয় সে উন্নতি সাধিত হয় দাতা দেশগুলো ও তাদের পুঁজিবাদী মহলের স্বার্থের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতি রেখে।

প্রতিটি যুগের সাম্রাজ্যবাদেরই কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। তাই যেকোনো যুগের সাম্রাজ্যবাদকে বিশ্লেষণ করতে হলে সেই যুগের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে বুঝতে হবে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অর্থে সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাম্রাজ্যবাদের নীতি ও শোষণের কৌশল ভিন্ন হলেও সব যুগের সাম্রাজ্যবাদই নিজ নিজ ক্ষমতা বিস্তারের জন্য ভিন্ন দেশের জনগণকে শোষণ করে। শোষণের ক্ষেত্র রক্ষা করার জন্যই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভূ-খণ্ড দখল করে এবং আগ্রাসী সমরবাদী নীতি গ্রহণ করে। ২০০৫ সালে ডেভিড হার্ভে[*] তাঁর *New Imperialism* গ্রন্থে [১০] অন্যান্য যুগের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বর্তমান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাদৃশ্যগুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক

---

[*] নিউ ইয়র্কের সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব ও ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ডেভিড হার্ভে বর্তমান বিশ্বে মানববিদ্যার শীর্ষ ২০ জন প্রভাবশালী লেখকের একজন। হার্ভের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে *Social Justice and the City* (1973), *Limits of Capital* (1982), *The Condition of Post-Modernity* (1989), *Justice, Nature and the Geography of Difference* (1996), *Spaces of Hope* (2000), *The New Imperialism* (2000), *A Brief History of Neo-liberalism* (2005), *The Enigma of Capital* (2010) প্রভৃতি।

শাসনের অবসান ঘটায় বহু বুর্জোয়া তাত্ত্বিকই*১ সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসানের পর সাম্রাজ্যবাদ অবলুপ্ত হয়েছে বলে কিছুসংখ্যক চিন্তাবিদ*২ মত প্রকাশ করেন। হার্ভে এসব মতের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। কিভাবে সাম্রাজ্যবাদ এখনও টিকে আছে এ মতের সমর্থনে তিনি নিম্নোক্ত যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন।

প্রথমত, হার্ভে মনে করেন, আমেরিকা বিগত পঞ্চাশ বছরে ধীরে ধীরে এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। এখনও বিশ্বের বহু দেশে মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে যা ইতিহাসের যেকোনো জাতির তুলনায় অনেক বেশি।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশদের মতো ভূ-খণ্ড দখল ও উপনিবেশ গঠনের মধ্য দিয়ে নয়, বরং সম্পদ ও বাজার দখলের মধ্য দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গড়ে ওঠে। সুতরাং, সরাসরি ক্ষমতা দখলের পরিবর্তে তারা তাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অধিকাংশ দেশকে দুর্গের মতো দখলে রাখে। তাই আমেরিকার সাহায্য, অর্থ, মনোযোগ, সৈন্য সাধারণত সেসব জায়গায় প্রেরিত হয় যেখানে তাদের বাণিজ্য ঘাঁটি গঠন বা তেলক্ষেত্র দখল কিংবা বৃহৎ কোনো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধি প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, ১৯০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত আমেরিকা দুটি মহাযুদ্ধ ছাড়া বহু দেশে সামরিক হামলা (বোমা হামলা, সশস্ত্র আক্রমণ, দখল) পরিচালনা করেছে। আমরা যদি মার্কিনী আক্রমণের শিকার দেশগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করি তাহলে একটি সুদীর্ঘ তালিকা পাওয়া যাবে। পৃথিবীর ইতিহাসে

---

*১ স্ট্র্যাচিসহ বহু উদারনৈতিক তাত্ত্বিকই মনে করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদ বিলুপ্ত হয়েছে।

*২ মাইকেল হার্ট ও এন্টনিও নেগ্রি ২০০০ সালে তাঁদের *Empire* গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা করেন, ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটেছে। এছাড়া ২০০৪ সালে হার্ট ও নেগ্রি তাঁদের *Multitude* গ্রন্থে, নেগ্রি তাঁর *Reflections on Empire* গ্রন্থে, ২০০৪ সালে লিও প্যানিচ ও স্যাম গিনডিন তাঁদের 'Global Capitalism and American Empire' প্রবন্ধে, ২০০৫ সালে তাঁদের ' Finance and American Empire' প্রবন্ধে এবং উইলিয়াম রবিনসন ২০০৪ ও ২০০৭ সালে তাঁর *A Theory of Global Capitalism* ও 'The Pitfalls of Realist Analysis of Global Capitalism : A Critique of Ellen Micksins Wood's Empire of Capital' প্রবন্ধে, এ্যালেক্স ক্যালিনিকস 'Toni Negri in Perspective'(২০০৩) প্রবন্ধে ও *Social theory* (২০০৭) গ্রন্থে, মার্ক ল্যাফি ও জুটা ওয়েল্ডস (২০০৪) তাঁদের 'Representing the International: Sovereignty after Modernity?' এবং স্লাভয় জিজেক (২০০৪) 'The Ideology of Empire and its Traps' প্রবন্ধে সাম্প্রতিককালে সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।

আর কোনো দেশই আমেরিকার মতো জোরপূর্বক অন্য দেশের ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করেনি। এ দৃষ্টান্ত আমেরিকাকে একটি সাম্রাজ্য হিসেবে প্রমাণ না করে পারে না।

চতুর্থত, নাৎসী, রোমান, ব্রিটিশ বা অন্যান্য বৃহৎ সাম্রাজ্য যেসব ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা ইন্ধন সরবরাহ করে সাম্রাজ্য বিস্তার করত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একই ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করে সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মূলত নিজ দেশের বিবিধ অর্থনৈতিক চাপ উপশম করা ও অন্য দেশের জাতীয় নেতৃত্বে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য যুদ্ধ পরিচালনা করে থাকে।

পঞ্চমত, আমেরিকা যে কৌশল অবলম্বন করে সাম্রাজ্য বিস্তার করে তা কার্ল মার্কস ও তাঁর অনুসারীদের বর্ণিত পুঁজিবাদী দেশগুলোর পথ থেকে ভিন্ন নয়। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর বুদ্ধিজীবীমহল মার্কসবাদী চিন্তার অবসান ঘটেছে বলে মত প্রকাশ করলেও প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় একবিংশ শতাব্দীতে মার্কসবাদী তত্ত্ব আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

ষষ্ঠত, ২০০১-২০০৮ সালের মধ্যে বুশ প্রশাসনের শাসনকালে দুটো দেশে সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনা করে আমেরিকা বিশ্বনেতাদের বিশ্বপীড়নকারী বা বলপ্রয়োগকারীতে রূপান্তরিত করেছে। এটি পুরোপুরি রোমান প্রজাতন্ত্র থেকে রোমান সাম্রাজ্যে রূপান্তরের ইতিহাসের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সপ্তমত, অন্যসব সাম্রাজ্যের মতোই মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিসহ অন্যান্য কার্যকলাপ বিস্তৃত হয়েছে নৈতিকতার ছদ্মাবরণে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তারা আত্মস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। এর কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ ঃ

ক) নাৎসীবাহিনী পোল্যান্ডে প্রবেশ করলে আমেরিকা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। সেসময়ে কিছুসংখ্যক ইহুদী আমেরিকায় প্রবেশ করে। আমেরিকা শুধুমাত্র কিছু রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান, বিত্তশালী ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে দক্ষ ব্যক্তিকে গ্রহণ করে বাকিদের অস্বীকৃতি দেয়। নীতিবোধসম্পন্ন কোনো জাতি হলে সে সব ইহুদীকেই গ্রহণ করতো। আবার, নাৎসীরা তাদের প্রতি হুমকি ছিল বলেই তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে নয়।

খ) স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের নামে বহু দেশে জনগণের সমর্থন ছাড়া

সামরিক হস্তক্ষেপ চালিয়েছে।

গ) স্নায়ুযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র সাম্যবাদবিরোধী যেকোনো নিপীড়নমূলক সরকারকে সাহায্য দিতো। যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার যতদিন সাম্যবাদের বিরোধিতা করেছে, মার্কিন সরকার ও কর্পোরেশনগুলো অন্ধভাবে তাদের সমর্থন দিয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নৈতিকতার আবরণে তাদের সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপগুলোকে বৈধতা দিতে চাইলেও তারা প্রকৃতপক্ষে অন্য দেশের স্বাধীনতা, ন্যায় ও গণতন্ত্রের ধার ধারে না। সাম্প্রতিককালে ইরাকে আগ্রাসন সম্পর্কে হার্ভে যুক্তি দেন যে, ইরাক আক্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা ও তেলসম্পদ দখলে আনার জন্য একে একটি খরিদ্দার রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং মধ্যপ্রাচ্যে তার গমনপথ নিশ্চিত করা। এভাবে সেনা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় পাশ্চাত্যের কর্পোরেশনগুলো গোপনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জ্বালানি তেলের জন্য ভূ-খণ্ড ও কর্মস্থল সুনিশ্চিত করে থাকে। হার্ভে মনে করেন, স্বল্পোন্নত দেশের ওপর মার্কিন হস্তক্ষেপ ক্রমাগত সেসব দেশে অসন্তোষ ও জনরোষ বাড়াচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, অন্যান্য যুগের সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় সাম্প্রতিককালের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আরও বেশি পরিণত ও অধিকতর শোষণমূলক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ঔপনিবেশিক শাসন ছিল, কিন্তু শোষণের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আন্তর্জাতিকতার আবরণে শোষণকে করে তুলেছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বৈধ এবং সে অনুযায়ী তৈরি করেছে তাদের পররাষ্ট্রনীতি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় প্রণীত মনরো ডকট্রিন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে রচিত “ট্রুম্যান ডকট্রিন”, ১৯৯২ সালে লিখিত পেন্টাগনের গোপন দলিল ‘ডিফেন্স প্ল্যানিং গাইডেন্স’ প্রভৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপরিকল্পিত, সুদূরপ্রসারী ও সংগঠিত সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিচয় বহন করে। এসব নীতিতে একক মার্কিনী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদকে কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা, প্রয়োজনমাফিক সামরিক হস্তক্ষেপ, পুঁজি রপ্তানী ও বাণিজ্যিক শর্ত নতুনভাবে তৈরি করার সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা লক্ষ্য করা যায়।

লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্ব

মার্কসীয় সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বের ইতিহাসে লেনিনের *সাম্রাজ্যবাদ: পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়* গ্রন্থটি একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এ গ্রন্থে তিনি সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবনের ইতিহাসের চূড়ান্ত পর্ব বলে অভিহিত করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে লিখিত এ গ্রন্থে তিনি সেসময়কার বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে একটি মূর্ত তত্ত্বের অবতারণা করেন। এতে তিনি এ যুগের মৌলিক অর্থনৈতিক প্রশ্নটি অনুসন্ধান করেন যার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের সারধর্ম নিহিত। এ বিষয়টি বুঝতে না পারলে আধুনিক যুগের যুদ্ধ ও রাজনীতি বোঝা অসম্ভব। লেনিন প্রমাণ করেছিলেন যে, যুদ্ধ কোনো আপতিক বিষয় নয়। এটি পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের একটি অনিবার্য পরিণতি। লেনিনের তত্ত্ব আমাদের পুঁজিবাদের নতুন পর্বের বিকাশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এটি পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলোকে সনাক্ত করে যা সাম্রাজ্যবাদের বিকাশকে অপরিহার্য করে তোলে।

লেনিনের তত্ত্বটি প্রাথমিকভাবে তিন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়। প্রথমত, বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি লেনিনকে যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা প্রদান করতে সহায়তা করে। লেনিন মনে করেন, সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর প্রতিযোগিতাই পুঁজিবাদী ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে যুদ্ধের জন্ম দেয়। তাই সাম্রাজ্যবাদ বা একচেটিয়া পুঁজিবাদী পর্বে সংঘটিত যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করে লেনিন পুঁজিবাদের এক পরাশ্রয়ী ও মৃতপ্রায় বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেলেন। ব্যাপক পুঁজি রপ্তানীর মধ্য দিয়ে ব্রিটেন, জার্মানী ও ফ্রান্সের মতো রাষ্ট্রগুলো ঋণদাতা রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। লেনিন লক্ষ্য করেন, এসব দেশে ব্যাপকভাবে অকর্মণ্য একটি শ্রেণী তৈরি হচ্ছে যারা এ রপ্তানীকৃত পুঁজি থেকে বিপুল পরিমাণে আয় করে। ফলে এই লভ্যাংশজীবীরা পুরোপুরি উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং নিজ দেশকে পরগাছাবৃত্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, তাদের দেশও টিকে থাকে অপরাপর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোকে শোষণ করে। এসব সাম্রাজ্যবাদী দেশের অতিমাত্রায় অস্ত্রসজ্জিতকরণ ও সামরিকীকরণের পেছনেও রয়েছে সেই পরাশ্রয়ী চরিত্র। এসব দেশ সামরিক শক্তিবলে দূরবর্তী বিদেশী জাতিগুলোকে শোষণ করে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এ সামরিক বিস্তার ব্যাপকভাবে স্বার্থের বিভেদ সৃষ্টি করে যার উদ্ভব ঘটে একচেটিয়া পুঁজিবাদের একটি বিশেষ পর্বে। সুতরাং, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা এবং শোষিত জাতি ও শ্রেণীগুলোর প্রতিরোধ আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদকে পতনের দিকে নিয়ে যায়। এর মাঝেই সাম্রাজ্যবাদেও ক্ষয়িষ্ণু চরিত্রটি পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

লেনিনের তত্ত্বের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল একটি আদর্শগত ভিত্তি প্রস্তুত করা। তিনি সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাতে চান। এ লক্ষ্যে উপনীত হতে গিয়ে তিনি সে সময়কার বৈশ্বিক পর্যায়ে সংঘটিত প্রতিপক্ষ সাম্রাজ্যবাদীদের যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপের একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরেন। এশিয়া ও আফ্রিকাতে সংঘটিত উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনকে তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করেন। লেনিনের তত্ত্বের তৃতীয় উদ্দেশ্যটি জ্ঞানতাত্ত্বিক। সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিক কাঠামোটি দাঁড় করাতে গিয়ে তিনি ব্রিটিশ উদারনৈতিক চিন্তাবিদ জি. এ. হবসন ও অস্ট্রিয় মার্কসবাদী রুডলফ হিলফার্ডিংকে অনুসরণ করেন। হবসন সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমন্বয়হীনতার ফল মনে করেন। এ ব্যবস্থায় একটি ধনাঢ্য সংখ্যালঘু শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করছিল। এ প্রক্রিয়ায় পুঁজিপতি সমাজ অতিউৎপাদন ও নিম্নভোগের এক উভয় সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতির শিকার হয়। এ সংকট নিরসনে তারা উদ্বৃত্ত পুঁজি থেকে অধিক মুনাফা লাভের আশায় বিদেশে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে। উদারনৈতিকতাবাদী হিসেবে হবসন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমন্বয়হীনতার সমাধান টানতে চান উদ্বৃত্ত সম্পদের পুনর্বণ্টনের মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে তিনি অভ্যন্তরীণ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেন। অপরদিকে, মার্কসবাদী হিসেবে হিলফার্ডিং সাম্রাজ্যবাদকে ব্যাখ্যা করেন বৃহৎ ট্রাস্ট ও কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত ফিন্যান্স পুঁজির মাধ্যমে। তিনি একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে এক ধরনের যৌক্তিক সম্বন্ধ লক্ষ্য করেন। পুঁজির রপ্তানি, বহির্বিশ্বের বাজার দখল এবং সমরনীতির বিস্তৃতি ঘটানোর মধ্যেই হিলফার্ডিং পুঁজিবাদের বিস্তার ও সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের সূত্র খুঁজে পান। লেনিন এ দুজন তাত্ত্বিকের কাছে ঋণ স্বীকার করে নিয়ে হবসনের সংস্কারবাদী ও শান্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও হিলফার্ডিং-এর সুবিধাবাদী মনোভাবের সমালোচনা করেন।[১১] লেনিন তাঁর তত্ত্বে পুরোপুরি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেন এবং কাউটস্কির অতি-সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বের বিপরীতে একটি বিপ্লব তত্ত্ব দাঁড় করান। এখন আমরা লেনিনের তত্ত্বে নির্দেশিত সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করে দেখবো।

উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন থেকে একচেটিয়ার আবির্ভাব

লেনিন মার্কসের *পুঁজি* গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণীকে যথার্থ বলে মনে করেন। মার্কস প্রমাণ করেছিলেন, পুঁজিবাদ তার অবাধ প্রতিযোগিতার স্তর অতিক্রম করে উৎপাদনের কেন্দ্রীকরণের দিকে ধাবিত হবে। আর কেন্দ্রীভবন একটা পর্যায়ে একচেটিয়া কারবারে রূপ নেবে। ১৮৬০ সাল থেকে মূলত সেই পুঁজিতান্ত্রিক

একচেটিয়া কারবারের সূত্রপাত, লেনিন এই একচেটিয়া কারবারের বিকাশের ইতিহাসকে প্রধান তিনটি পর্বে বিভক্ত করেন। এ তিনটি পর্ব হচ্ছে:

১. ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সাল, এ পর্বটি অবাধ প্রতিযোগিতার বিকাশের চূড়ান্ত বা সর্বোচ্চ পর্যায়। এ সময়ে একচেটিয়ার প্রাথমিক লক্ষণগুলো পরিস্ফুট হতে শুরু করে।

২. ১৮৭৩ সালের পরবর্তী সময় এটি কার্টেল*ব্যবস্থা বিকাশের একটা দীর্ঘ পর্ব। তখনো কার্টেলগুলো স্থিতিশীল হয়ে ওঠেনি।

৩. উনিশ শতকের শেষদিকের তেজী অবস্থা এবং ১৯০০ থেকে ১৯০৩ সালের সংকট। এ সময়ে কার্টেল ব্যবস্থা অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ পর্বটিই ছিল পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হওয়ার চূড়ান্ত ধাপ।[১২]

লেনিন দেখানোর চেষ্টা করেন যে, কার্টেল ও ট্রাস্টের মাধ্যমে কিভাবে কোনো একটি বিশেষ শিল্পের উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ছে।

ব্যাংক ও ব্যাংকের নতুন ভূমিকা

লেনিন মনে করেন, মার্ক্স তাঁর *পুঁজি* গ্রন্থে সমষ্টিগত হিসাবরক্ষণের এবং সামাজিক আকারে উৎপাদনের উপকরণ বন্টনের বাহ্যিক রূপের যে ধারণা প্রদান করেন তা আজকের ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে।[১৩] লেনিন উল্লেখ করেন, পুঁজিবাদের প্রথম পর্বে ব্যবসায়ীরা দৈহিক শ্রম বাদে ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের দশ ভাগের নয় ভাগই নিজেরা সম্পাদন করতেন। আর একচেটিয়া পর্বে, একই কাজের দশ ভাগের নয় ভাগই সম্পাদন করেন কর্মচারীরা। এ পরিবর্তনের নেপথ্যে কাজ করছে ব্যাংক ব্যবস্থা। কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়ার ফলে সমগ্র পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শীর্ষদেশে গুটিকয়েক ব্যাংকের অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব ব্যাংকের কার্যক্রম ক্রমশ একচেটিয়া চুক্তি সম্পাদন ও ব্যাংক ট্রাস্ট গঠনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আমেরিকার মাত্র দুটো ব্যাংক এগারো লক্ষ কোটি মার্কের মূলধন নিয়ন্ত্রণ করত।[১৪]

শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো আবার বীমা, পরিবহণ, রেস্তোঁরা, নাট্যশালা, শিল্পকলা, ইন্ডাস্ট্রি প্রভৃতি শিল্পের শাখাগুলোতেও তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করে। লেনিনের সময়কার প্রধান ছ'টি ব্যাংকের

---

* পুঁজিপতিরা যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে বাজার ভাগাভাগি করে নেয় ও মূল্য নির্ধারণ করে থাকে সে প্রতিষ্ঠানকে কার্টেল বলা হয়।

প্রত্যেকটি শত শত বাণিজ্যিক কোম্পানির (২৮১ থেকে ৪১৯) শেয়ার ও বন্ড ছাড়ার কাজে অংশ নিয়েছে।[১৫] এভাবেই ব্যাংক ও শিল্প পুঁজির ক্রমবর্ধমান সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় ফিন্যান্স পুঁজি। বিংশ শতাব্দীকে লেনিন তাই আখ্যায়িত করেছিলেন ফিন্যান্স পুঁজির যুগ হিসেবে।

ফিন্যান্স পুঁজি ও ফিন্যান্সিয়াল অলিগর্কি

লেনিন উল্লেখ করেন, সাধারণভাবে পুঁজিতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো, এতে শিল্প পুঁজি থেকে মুদ্রা পুঁজি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ, এতে পুঁজির ব্যবস্থাপনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিবর্গ থেকে ক্ষুদ্র পুঁজির আয়ের ওপর নির্ভরশীল লভ্যাংশজীবীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। লেনিন বলেন, সাম্রাজ্যবাদ বা ফিন্যান্স পুঁজির আধিপত্য হলো পুঁজিতন্ত্রের সেই সর্বোচ্চ পর্যায় যখন এই বিচ্ছেদ বিরাট আকার ধারণ করে।[১৬] এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে: অন্যসব পুঁজির ওপর ফিন্যান্স পুঁজির আধিপত্য মানে লভ্যাংশজীবী বা ফিন্যান্সিয়াল অলিগর্কির আধিপত্য। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে অন্যসব রাষ্ট্রের ওপর শক্তিশালী কয়েকটি রাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে। লেনিনের সময়কালে ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র–এ চারটি সমৃদ্ধতম পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলো শতকরা ৮০ ভাগ ফিন্যান্স পুঁজির মালিক ছিল। সঙ্গত কারণেই অবশিষ্ট বিশ্বের প্রায় পুরোটাই ছিল এ চারটি দেশের আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার খাতক ও করদ অঞ্চল।[১৭]

পুঁজির রপ্তানি

পুঁজিতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো পুঁজির রপ্তানি। এ পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: ভিন্ন ভিন্ন শিল্পসংস্থার, ভিন্ন ভিন্ন শিল্পশাখার এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিকাশ লাভের অসম প্রকৃতি। এ কারণে পুঁজিবাদের প্রথম পর্বে, অবাধ বাণিজ্যের কল্যাণে ইংল্যান্ড ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সব দেশের শিল্পজাত দ্রব্যাদির যোগানদারে পরিণত হয়। অপরদিকে, বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে নতুন এক ধরনের একচেটিয়া কারবার লক্ষ্য করা যায় যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো–

প্রথমত, পুঁজিতান্ত্রিক ধারায় বিকাশপ্রাপ্ত সব কয়টি দেশে একচেটিয়া পুঁজিতান্ত্রিক শিল্প সংযোজন।

দ্বিতীয়ত, পুঁজির সঞ্চয় যেসব অতি ধনশালী দেশে অতিশয় আয়তন ধারণ করেছে সেসব দেশের একচেটিয়া অবস্থান।[১৮]

সুতরাং, অতি ধনশালী দেশগুলোতে একচেটিয়া ফিন্যান্স পুঁজি যে প্রভূত মুনাফা সৃষ্টি করে তা আর নিজ দেশে পুনরায় পুঁজি হিসেবে নিয়োগ করা হয় না। কারণ পুঁজির পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুনাফার পরিমাণ কমে আসে। তাই অতিরিক্ত পুঁজি নিজ দেশ অপেক্ষা অনুন্নত বিশ্বে বিনিয়োগ করলে বেশী মুনাফা আদায় করা যায়। কারণ এসব পশ্চাদপদ দেশগুলোতে পুঁজি বিনিয়োগ যেসব কারণে লাভজনক তা হচ্ছে:

প্রথমত, অনুন্নত দেশে পুঁজির অভাব।

দ্বিতীয়ত, এসব দেশে জমির দাম কম।

তৃতীয়ত, মজুরি স্বল্প।

চতুর্থত, কাঁচামাল সস্তা ও সহজলভ্য।

এসব কারণেই পশ্চাৎপদ দেশগুলোকে বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক আদান-প্রদানের মধ্যে টেনে আনা হয়। এজন্য সেখানে শিল্প বিকাশের প্রাথমিক অবস্থাগুলো প্রস্তুত করা হয়। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

পুঁজি রপ্তানি মূলত দু'ভাবে হয়ে থাকে। যথা ঃ

১) ঋণের মাধ্যমে

২) প্রত্যক্ষভাবে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে।

লেনিনের সময়কালে স্পেন, বলকান রাষ্ট্রগুলো, রাশিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, চীন প্রভৃতি দেশগুলো বিত্তবান দেশগুলো থেকে ব্যাপকভাবে ঋণ গ্রহণ করত। এসব সুবিধার মধ্যে রয়েছে বাণিজ্যিক চুক্তিতে অনুকূল অনুচ্ছেদ, প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনের সুযোগ, নির্মাণ চুক্তি, মোটা অঙ্কের আর্থিক সুবিধা, অস্ত্র সরবরাহের চুক্তি প্রভৃতি। পুঁজি রপ্তানির অপর কৌশল হচ্ছে: অনুন্নত দেশগুলোকে বিনিয়োগ ক্ষেত্রে পরিণত করা। যেমন, পুঁজির প্রধান বিনিয়োগক্ষেত্র ছিল এশিয়া ও আমেরিকাতে গড়ে ওঠা ব্রিটেনের উপনিবেশগুলো। [১৯]

পুঁজিতান্ত্রিক সমাহার ও এ বিশ্বের অর্থনৈতিক বণ্টন

কার্টেল, সিন্ডিকেন্ট*[১], ট্রাস্ট*[২] প্রভৃতি একচেটিয়া সমাহার শুধুমাত্র স্বদেশের বাজার দখল করেই ক্ষান্ত হয় না। নিজ দেশের শিল্পব্যবস্থার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ববাজার দখলে আনার চেষ্টা চালায়। পুঁজির রপ্তানি যত বাড়তে থাকে বড় বড় একচেটিয়া সমাহারগুলো ততই বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করে। এভাবে তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত "প্রভাবাধীন অঞ্চল" বহির্বিশ্বে যত বেড়ে চলে তত বাড়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি সংগঠনের প্রয়োজন।[২০] একচেটিয়া সমাহারগুলো বাজারের ভাগাভাগি, পণ্যের দাম, ব্যবসা নীতি, উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে এমন চুক্তি সম্পাদন করে যাতে বিশ্ববাজারে নতুন কোনো দেশের পুঁজিপতি প্রবেশ করতে না পারে। তবে সর্বসাম্প্রতিক পর্যায়ে, আমরা বিশ্বের অর্থনৈতিক বণ্টন বা ভাগাভাগির ভিত্তিতে শক্তিধর পুঁজিতান্ত্রিক সমাহারগুলোর মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখি তা রাষ্ট্রগুলোকে অর্থনৈতিক অঞ্চল দখলের সংগ্রামে লিপ্ত করে।

বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে বিশ্বের বণ্টন

সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি কেবলমাত্র বিশ্ববাজার ভাগাভাগি করেই সন্তুষ্ট থাকে না। স্থায়ী শোষণের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভূ-খণ্ড দখলেরও প্রয়োজন পড়ে। লেনিন দেখান যে, ১৯০০ সালের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ভূ-খণ্ড দখলের কাজটি সম্পন্ন করে। একারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের ভূ-রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বিশ্ব ভাগাভাগির সংগ্রাম। লেনিন ফিন্যান্স পুঁজির সঙ্গে বিশ্ব ঔপনিবেশিক কর্মনীতির এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ খুঁজে পান। লেনিন এ সম্পর্কে বলেছিলেন যে, ঔপনিবেশিক নীতি ও সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ বিকাশের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু একচেটিয়ার আবির্ভাবে এবং ফিন্যান্স পুঁজির আধিপত্যের কারণে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর ঔপনিবেশিক নীতি ও সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনে, সেসময়কার আর্থ-সামাজিক কাঠামো সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক নীতির ধরন ও প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। তাই ফিন্যান্স পুঁজির ঔপনিবেশিক নীতি ছিল অন্যান্য পুঁজিবাদী যুগের ঔপনিবেশিক নীতি থেকে অপরিহার্যভাবে ভিন্ন প্রকৃতির।[২১] একচেটিয়া পুঁজিতান্ত্রিক সমাহারগুলো কাঁচামালের সব কয়টি উৎসকে কুক্ষিগত করে তার নিজ নিজ দেশের জাতীয় সরকারগুলোর ঔপনিবেশিক অধিকারগুলোকে শক্তিশালী

---

* ১শিল্পপতিরা ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে কমিটি গঠন করেন তাকে সিন্ডিকেট বলা হয়।

* ২শিল্পপতিরা যখন যুক্ত মালিকানা সৃষ্টি করে তখন তাকে ট্রাস্ট বলে।

করে। এ বিশ্বের কাঁচামালের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমৃদ্ধ এলাকাগুলো দখলে আনাও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর অন্যতম লক্ষ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

লেনিন প্রদত্ত সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ও একটি সংজ্ঞা

লেনিন লক্ষ্য করেন, একচেটিয়াবৃত্তিই হলো সাম্রাজ্যবাদের গভীরতম অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। মূলধন ও উৎপাদনের কেন্দ্রীভবনকে আশ্রয় করে এবং কোটি কোটি টাকা নিয়ন্ত্রণ করে এমন ডজনখানেক ব্যাংকের মূলধনের সঙ্গে মিলিতভাবে পুঁজিবাদের অবাধ প্রতিযোগিতার স্তরকে একচেটিয়া ব্যবস্থায় পর্যবসিত করে। কিন্তু অবাধ প্রতিযোগিতা থেকে উৎপন্ন এ একচেটিয়া ব্যবস্থা অন্ধ প্রতিযোগিতাকে উচ্ছেদও করতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি দিককেই সাম্রাজ্যবাদের প্রধান পাঁচটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে লেনিন সনাক্ত করেন। তিনি মনে করেন, সাম্রাজ্যবাদের একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিতে হলে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ থাকতে হবে। ‘পুঁজিতন্ত্রের একটি বিশেষ স্তর হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ’ শিরোনামে অধ্যায়টিতে তিনি পাঁচটি বৈশিষ্ট্য পুনরায় সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন নিম্নরূপে–

১. উৎপাদন ও মূলধনের কেন্দ্রীভবন এমন উঁচু স্তরে উপনীত হয়েছে যে তা থেকে একচেটিয়া ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে এবং এসব একচেটিয়া ব্যবস্থাই অর্থনৈতিক জীবনের অধিনিয়ন্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

২. ব্যাংক মূলধন ও শিল্প মূলধনের সহমিলনের ফলে মহজনী বা ফিন্যান্স মূলধনের আবির্ভাব ঘটেছে। এ ফিন্যান্স মূলধনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ফিন্যান্সিয়াল অলিগর্কি।

৩. পণ্য রপ্তানি থেকে স্বতন্ত্র মূলধন রপ্তানি অতিমাত্রায় গুরুত্ব লাভ করেছে।

৪. আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজিবাদী সমাহারের আবির্ভাব ঘটেছে যা সমগ্র পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে উদ্যত হয়েছে।

৫. বৃহত্তম পুঁজিতান্ত্রিক শক্তিবর্গের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের ভূ-খণ্ডগত বণ্টনকার্য পরিসমাপ্ত হয়েছে।

উপর্যুক্ত পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের অন্তঃসার নিহিত। লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায় বলে অবহিত করেন যে সময়ে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং, এ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য সম্বলিত লেনিনপ্রদত্ত সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞাটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা বলা চলে। এতে তিনি হবসন, হিলফার্ডিং, বুখারিন ও লুক্সেমবার্গের অপূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাকে পূর্ণাঙ্গরূপে তুলে ধরেন এবং

সেইসঙ্গে কাউৎস্কির নেতিবাচক বক্তব্যের অন্তর্নিহিত ত্রুটি তুলে ধরেন। এখন আমরা লেনিন প্রদত্ত সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা সাম্প্রতিককালে কতখানি প্রাসঙ্গিক তা যাচাই করে দেখবো।

সাম্প্রতিককালে লেনিনের তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা

সাম্প্রতিককালে সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যের ধারণাটিকে বিশ্বায়নের বিচারমূলক অধ্যয়নের সঙ্গে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে বিশ্বায়নের নিরপেক্ষ খোলসের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যগুলো ক্রিয়াশীল থাকছে। তাই বর্তমান সময়েও লেনিন বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদের সকল বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা ও স্ববিরোধগুলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সাম্প্রতিক আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন, বিশ্ব অর্থনীতিতে একচেটিয়ার ব্যাপক প্রভাব, ব্যাংকের বিশেষ ভূমিকা, অর্থনীতিতে ফিন্যান্স পুঁজির বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তার, পুঁজি রপ্তানীর ব্যাপক প্রাধান্য, পুঁজিবাদী মৈত্রীজোট কর্তৃক এ বিশ্বের বণ্টন এবং বৃহৎ শক্তিবর্গ দ্বারা এ বিশ্বের পুনর্বণ্টনের প্রবণতা ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই লেনিন প্রদত্ত সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের সাম্প্রতিক কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়।

উৎপাদন ও পুঁজির ব্যাপক কেন্দ্রীভবন ও পুঞ্জীভবন

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর একত্রিকরণের কারণে পুঁজির পুঞ্জীভবন এখন উৎকর্ষের এক চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এটি প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন ও পুঁজির ব্যাপক কেন্দ্রীকরণেরই ফলশ্রুতি। এ ব্যাপক কেন্দ্রীকরণ উত্তরোত্তর পুঁজিবাদকে অধিকতর একচেটিয়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে স্বল্পসংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান সমাজের বেশীর ভাগ উৎপাদন করছে এবং শ্রমিক শ্রেণীর বেশীর ভাগ অংশকে নিয়োগ করছে। সেইসঙ্গে সারাবিশ্বে শ্রমিকদের দারিদ্র ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯৫৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক সম্পদ উৎপাদন করত এবং সারা দেশের মোট মুনাফার শতকরা ৬৮ ভাগ তারা অর্জন করত। এ ৫০০টি প্রতিষ্ঠানের মাত্র ৫০টি যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র সম্পদের এক-চতুর্থাংশ উৎপাদন করতো। সেসময়ে যুক্তরাষ্ট্রে মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল এক লক্ষের ওপরে। ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১ লক্ষ আশি হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র ৫০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান মোট উৎপাদনের শতকরা ৫৭ ভাগ উৎপাদন করত এবং লাভ করত মোট লাভের শতকরা ৭২ ভাগ, এতে কাজ করতো মোট শ্রমিকের শতকরা ৫৪ ভাগ । আবার এ ৫০০টি

কোম্পানির মধ্যে বৃহৎ ৪০টি উৎপাদন করত বাকি ৪৬০টির সমান। একইভাবে বৃটেনে ও পশ্চিম জার্মানিতেও একচেটিয়া কারবার ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। ১৯৬২ সালের হিসাবে মাত্র ২০০টি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান সমগ্র পুঁজিবাদী বিশ্বের মোট উৎপাদনের শতকরা ৩২.৬ ভাগ উৎপাদন করে আর তার মূল্য হলো ২৩৫,০০০ মিলিয়ন ডলার। তন্মধ্যে ১০০টি মার্কিনী একচেটিয়া কারবারের উৎপাদন হলো ১৪৬,০০০ মিলিয়ন ডলার।[২২] ১৯৯২ সালের হিসাব অনুযায়ী, ২০০টি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান বিশ্বের মোট উৎপাদনের ২৯.৮ শতাংশ উৎপাদন করে বিশ্ব অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এসব একচেটিয়া কারবারের ৬০টি আমেরিকান এবং ৫৪টি জাপানি। বিগত তিন দশকে বিশ্বের মোট উৎপাদন ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশ্বের মাত্র ৫ শতাংশ মানুষ বাস করে এমন দেশে ৩৫৮টি মিলিয়নিয়ার পরিবার অধিক সম্পদ অর্জন করেছে। ১৯৯৫ সাল থেকে পুঁজির ব্যাপক কেন্দ্রীকরণের ফলে একীভূত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদ ১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। অল্প কয়েক বছর আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি, জার্মানির ডেইমলার বেঞ্জ আমেরিকার ক্রিস্টাল কোম্পানির মালিকানা গ্রহণ করে। অপরদিকে, ব্রিটিশ মালিকানাধীন বিপি শেলের অধিগ্রহণ করে ব্রিটিশ-ডাচ অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে।[২৩]

বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাত্র ছয়ভাগ হয়ে থাকে নিজেদের মধ্যে। বাকি সবটুকুই হয় ইউরোপ, জাপান ও উত্তর আমেরিকার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে। এ ধরনের বাণিজ্য সবসময়ই অসম হয়ে থাকে। তৃতীয় বিশ্বকে তাদের কফি, তুলা, মাংস, টিন, তামা ও তেল বিদেশী কর্পোরেশনগুলোর কাছে কম দামে বিক্রি করতে হয়। অপরদিকে, ধনী দেশগুলো থেকে তৈরি পণ্য, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ কেনার জন্য দিতে হয় অত্যন্ত চড়াদাম। এ সম্পর্কে ভেনিজুয়েলার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কার্লোস আন্দ্রেজ পেরেজ বলেন, এর ফলে অবিরাম ও বর্ধিত হারে পুঁজির নির্গমন ঘটছে এবং আমাদের দেশগুলো দরিদ্র হয়ে পড়ছে।[২৪] এমনকি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো পণ্য আমদানির পরিবর্তে শিল্পজ দ্রব্য নিজেরা তৈরি করলে শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের প্রযুক্তি ও ঋণ প্রদান বন্ধ করাসহ বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দেয়। আবার বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো বিপুল বিনিয়োগ বিপণনের উন্নত কৌশল, একচেটিয়া পেটেন্ট এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের স্থানীয় বাণিজ্য উদ্যোগগুলোকে বাজারে ঢুকতে বাধা প্রদান করে। তাই গরিব দেশের অর্ধেকেরও বেশি শিল্প কারখানার মালিকানা অথবা নিয়ন্ত্রণ বিদেশী কোম্পানিগুলোর হাতে। আবার যেসব ক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর শরিকানা কম, সেখানে থাকে তাদের ভেটো ক্ষমতা। কোনো শিল্প-উদ্যোগের সম্পূর্ণ

মালিকানা কোনো একটি দেশের হওয়া সত্ত্বেও প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর প্রায় একচেটিয়া অধিকারের কারণে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সুবিধা ভোগ করে থাকে। যেমন, বড় কোম্পানিগুলো অশোধিত তেল উৎপাদনের মাত্র ৩৮ শতাংশের মালিক হলেও পরিশোধন ও সরবরাহের প্রায় সম্পূর্ণটাই তাদের হাতে।[২৫] এ সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ লেনিন বর্ণিত মুষ্টিমেয় কয়জনের দ্বারা অধিকাংশ মানুষের দুঃসহভাবে শোষিত হওয়ার বাস্তবতাই প্রমাণ করে।

সাম্প্রতিককালে তথ্য ও প্রযুক্তি শিল্পের ব্যাপক কেন্দ্রীভবন লেনিনীয় তত্ত্বের প্রামাণ্য বহন করে। তথ্য সংগ্রহের শাখাগুলো গুটিকয়েক বৃহৎ কোম্পানির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ২০০৫ সালের ইউরোস্ট্যাটের জরিপ অনুসারে, বৃহৎ কোম্পানিগুলো ডাক ও টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে অন্যসব কোম্পানিকে মাত্র .৯ শতাংশ উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহ করলেও মোট কর্মচারীর শতকরা ৮৭.৮ শতাংশের মজুরি দেয়, মোট ব্যবসায়িক লেন-দেনের ৮৭.২ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং মোট মুনাফার শতকরা ৯১.৭ শতাংশ অর্জন করে। একইভাবে, যোগাযোগের উপকরণ তৈরিতে বৃহৎ কোম্পানিগুলো অন্যান্য সব কোম্পানিকে মাত্র ১.৬ শতাংশ উপাদান সরবরাহ করলেও সকল কর্মচারীর শতকরা ৬৫.৫ শতাংশের মজুরি দেয়, মোট উৎপাদনের শতকরা ৮৪.১ শতাংশ এরা করে এবং মোট মুনাফার ৭৬.৮ শতাংশ অর্জন করে। এভাবেই ইউরোপের গুটিকয়েক কোম্পানি ইউরোভুক্ত সব কয়টি দেশের তথ্য-প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। একই ধরনের কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থশিল্পেও লক্ষ্যণীয়। সমগ্র মার্কিন মিডিয়া জগতকে মাত্র ৩৩০টি বৃহৎ কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণ করে যাদের ১০০০-এর মত কর্মচারী রয়েছে। এসব কর্পোরেশন অন্যসব কর্পোরেশনকে ২০০২ সালে মাত্র .০১ শতাংশ আর্থিক সহায়তা প্রদান করলেও তাদের সকল আয়খাতের শতকরা ৭৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। টেলিযোগাযোগ খাতে মাত্র ৭২টি বৃহৎ কর্পোরেশন অন্যসব কোম্পানিকে মাত্র .৯ শতাংশ আর্থিক সহায়তা দিলেও তাদের আয়ের সকল খাতের ওপর ৮৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। [২৬]

তথ্যশিল্পের মতো খনি থেকে কয়লা ও পিট উত্তোলনের ক্ষেত্রেও বৃহৎ কোম্পানিগুলো দ্বারা কেন্দ্রীভবনের প্রবণতা বিদ্যমান। ইউরো স্ট্যাটের ২০০৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, এ কাজে বৃহৎ কোম্পানিগুলো অন্যান্য কোম্পানিগুলোকে মাত্র ৪.৯ শতাংশ আর্থিক সহায়তা প্রদান করলেও তারাই এ খাতে ৯২.৯ শতাংশ মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে। তেমনিভাবে তামাক জাতীয় পণ্য উৎপাদনেও বৃহৎ

কোম্পানিগুলো মাত্র ২০ শতাংশ উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত থেকেই এ শিল্পের ৯৩.৭ শতাংশ মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। একইভাবে কোকাকোলা উৎপাদনেও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ও পারমাণবিক জীবাশ্ম তৈরির কাজ বৃহৎ কোম্পানিগুলো মাত্র ৯.৯ শতাংশ করলেও এ খাতের ৯৩.১% নিয়ন্ত্রণ করে।[২৭] আর জীবাশ্ম জ্বালানি বিশেষত পেট্রোলিয়াম বিপুলভাবে ব্যবহার করাই বর্তমান বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামোর অন্তর্গত। এ বিশ্বব্যবস্থা তাই সহজপ্রাপ্য তেল ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তাকে বলা চলে 'সর্বাধিক তেল আহরণের কর্মনীতি'। এ সম্পর্কে র‍্যাচেল কারসন মন্তব্য করেছিলেন, এ হচ্ছে "মুনাফা, আর উৎপাদন দেবতাদের" প্রশান্ত করা। [২৮]

১৯৮০ সাল থেকে বিশ্বের তেলশিল্প কেন্দ্রীভবন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর কেন্দ্রীভবনের কাজটি সম্পাদিত হয়েছে বিপি-এ্যামোকো, শেভরন-টেক্সাকো, এক্সন-মবিল, কনকো ফিলিপস, শেল–এসব সর্ববৃহৎ কোম্পানিগুলো দ্বারা। এসব কোম্পানি এ খাতে ১০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মুনাফা অর্জন করে। অন্যান্য বৃহৎ কোম্পানিগুলো ৩০ থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার মুনাফা অর্জন করে। স্বতন্ত্র কোম্পানি ও শেয়ার মার্কেটের দালালরা এক্ষেত্রে ৩০ বিলিয়ন ডলার মুনাফা অর্জন করে । সর্ববৃহৎ কোম্পানিগুলো এখনও তাদের চিরাচরিত অনুসন্ধান ক্রিয়া ব্যাপকভাবে অব্যাহত রেখেছে। স্বতন্ত্র কোম্পানিগুলো এখন অনুসন্ধানের সঙ্গে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে। তারা তাদের মুনাফার অধিকাংশই পেয়ে থাকে পরিশোধন ও রাসায়নিক শিল্প কারখানাগুলো থেকে এবং এসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানই আবার বিকল্প শক্তির উৎস তথা পারমাণবিক শক্তি প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণে ব্যাপৃত হয়। এই ব্যাপক কেন্দ্রীভবনের ফলে বহু দেশ তাদের পেট্রোলিয়াম কোম্পানিগুলোকে ব্যক্তি মালিকানাধীন আন্তর্জাতিক কোম্পানিতে পরিণত করছে। একারণে আধুনিক যুগের শুরুতেই তেলসমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে অশোধিত পেট্রোলিয়াম জোরপূর্বক আদায়কারী কোম্পানিগুলোর সংঘাত আসন্ন হয়ে ওঠে। দক্ষিণ-পূর্ব নাইজেরিয়ার সংঘর্ষ ও ইরাক যুদ্ধ সাম্প্রতিককালে এ বাস্তবতারই স্বাক্ষর বহন করে।[২৯]

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা শক্তিগুলো বহুজাতিক তেল কোম্পানিগুলোর হাতে যাবতীয় তেল মজুদ ও বিনিয়োগের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার জন্যই তাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতির নীতি নির্ধারণ করে। একারণে তারা প্রায়শই বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল কোম্পানিগুলোকে ব্যক্তি মালিকানাধীন করার সুপারিশ করে। এ সম্পর্কে জেমস হাওয়ার্ড কুন্সটলার *দি লং ইমার্জেন্সি* গ্রন্থে মন্তব্য করেন, "এক

মরিয়া পরাশক্তি এ গ্রহে এখনো টিকে থাকা বৃহত্তম তেলক্ষেত্রগুলো যেকোনো খেসারত দিয়ে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই বলে মনে করতে পারে।"[৩০] অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যগত উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে "তেল উৎপাদকদের একচেটিয়া ক্ষমতা"[৩১] নিশ্চিত করা। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরাও এ মতের সমর্থনে যুক্তি দিয়ে থাকেন, বহুজাতিক তেল কোম্পানিগুলোর এহেন জোরপূর্বক তেল দখলের খেসারত দিতে হচ্ছে পরিবেশকে।

এভাবে একচেটিয়া পুঁজি সারা বিশ্বে বিচরণ করছে এবং প্রয়োজনে নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করছে। উচ্চমাত্রার মুনাফা সাধারণত উচ্চমাত্রার শোষণের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। উৎপাদনের কেন্দ্রীভবনের মধ্য দিয়েই মূলত এ কাজটি সম্পন্ন হয় এবং এটিই পুঁজিবাদকে যুক্তিসিদ্ধ করে। কোম্পানিগুলোর এ ক্ষুদ্র গোত্রতান্ত্রিক শোষণ এত বেশি শক্তিধর হয়ে উঠেছে যে, কোনো সরকারই একে নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ নয়। কিন্তু গোষ্ঠীতান্ত্রিক আধিপত্য আরেকটি পুঁজিবাদী গোষ্ঠীকে ভাবিয়ে তোলে এবং প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করে। একচেটিয়া ব্যবস্থার এ দ্বন্দ্বই কার্যত তাকে পতনের দিকে ঠেলে দিতে বাধ্য করে। এ বাস্তবতা লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণীরই সমার্থক।

ব্যাংকের বিশেষ ভূমিকা

ব্যাপক পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবন ও কেন্দ্রীকরণের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হচ্ছে ব্যাংকের বিপুল বিকাশ। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর একত্রিকরণের ফলে তারা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহেরও অধিগ্রহণ করে। এর কল্যাণেই বিশ্বের প্রতি প্রান্তে ফটকামূলক পুঁজির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। লেনিন বলেন, বিনিয়োগকৃত অর্থ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে স্ফীত হয়ে ওঠে। কর্পোরেশনগুলো পুঁজিবাদী অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এ বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্যাংককে প্রদান করে বলেই তারা এ কাজটি করতে পারে।[৩২] লেনিন তাঁর সময়কালে দেখিয়ে গেছেন, কিছুসংখ্যক ব্যাংক কিভাবে মোট আমানতের বিপুল অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তাদের কি বিপুল অংকের পুঁজি রয়েছে। সেইসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন, ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যক্রম কি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৃহৎ ব্যাংকগুলো কি বিপুল পরিমাণ মুনাফা সঞ্চয় করছে। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, কেন্দ্রীভবনের ফলে সমগ্র পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শীর্ষে গুটিকয়েক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর ফলে তারা একচেটিয়া চুক্তি সম্পাদন ও ব্যাংক ট্রাস্ট গঠনের দিকে অধিক তৎপরতা দেখাচ্ছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে লেনিন নির্দেশিত এ বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরও প্রকট আকার ধারণ করে। এসময়ে *আইএমএফ ও আইবিআরডি* (বর্তমানে বিশ্বব্যাংক) নামক দু'টি সাধারণ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যারা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পুঁজিবাদী দেশগুলো *আইএমএফ*কে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার নিয়ম-কানুনের রক্ষকে পরিণত করার প্রয়াস পায়। তখন থেকেই বিনিময় হারে কোনোরূপ পরিবর্তন আনয়নের জন্য আই*এমএফ*-এর অনুমোদন প্রয়োজন হতো। অপর প্রতিষ্ঠান *আইবিআরডি* বা বিশ্বব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ তখন ছিল ১০ বিলিয়ন ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ দুটো প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে এদের সম্পদের যোগান দিতে শুরু করে এবং অন্যান্য দেশকেও সম্পদ যোগানের জন্য চাপ দিতে থাকে। আইবিআরডির ঋণ প্রদানের ক্ষমতাও কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত ৫৭০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যেই সীমিত থাকতো। তাছাড়া *আইবিআরডি* প্রদত্ত ঋণপত্রের জন্য কেবলমাত্র রক্ষণশীল ওয়াল স্ট্রীট মুদ্রা বাজারকে একমাত্র বাজার হিসেবে গণ্য করা হতো। ফলে বিশ্বব্যাংক রক্ষণশীল ঋণদান নীতি গ্রহণ করে ১৯৫৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও প্রধান কিছু ধনী দেশ *আইএমএফ*-এর অর্থ ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়।

১৯৬০-এর দশকে বহুজাতিক ব্যাংকের সংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬১ সালে মুদ্রা সঙ্কট নিরসনে *আইএমএফ*কে অতিরিক্ত তহবিল নিয়ন্ত্রণের ভার প্রদান করা হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভোটের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তসমূহ নিয়ন্ত্রণ করত। কানাডাসহ বেশকিছু ইউরোপীয় দেশ আইএমএফ-এর নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে দশটি ধনী দেশের নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দেয়। এরপর দীর্ঘ পাঁচ বছর আলোচনার পর যৌথ চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলকে কৃত্রিমভাবে পুনর্গঠন করা হয়। এতে ইউরোপীয় দেশগুলো ভেটো সুবিধা লাভ করে। ব্যাংক ব্যবস্থার এ আন্তর্জাতিকীকরণ বহুজাতিক ব্যাংকগুলোর শাখা বিস্তারে আরও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৫ সালে মাত্র ১৩টি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক শাখা ছিল। ১৯৭৪ সালের শেষদিকে বৈদেশিক শাখাসহ ১২৫টি নতুন ব্যাংক খোলা হয় । ১৯৬৫ সালে বিদেশে কার্যরত এ সকল শাখার ৯.১ বিলিয়ন ডলারের তহবিল ছিল, সেখানে ১৯৭৪ সালে তা ১২৫ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে যায়। ১৯৬৫ সালে নিউইয়র্ক শহরে বিদেশী ব্যাংকের মাত্র ৪৯টি শাখা থাকলেও ১৯৭৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯২টিতে। এ সকল শাখার তহবিলও ঐসময়ে ৪.৮ বিলিয়ন ডলার থেকে ২৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। ১৯৭৪ সালের শেষ নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের

বিদেশী ব্যাংকের মোট তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৬ বিলিয়ন ডলারে। ব্যাংকব্যবস্থার আন্তর্জাতিকীকরণের আরেকটি দিক হচ্ছে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং সহগামিতা (Consortia) ব্যবস্থার প্রবর্তন। ১৯৬৪ সাল থেকে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেটের সৃষ্টি করে এবং ১৯৭১ সালের মধ্যে বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশ বৃহৎ ব্যাংক এ সিন্ডিকেটসমূহের অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে। বহুজাতিক ব্যাংকসমূহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিরাট ধরনের মূলধন স্থানান্তরের মাধ্যমে কেবল বিনিয়োগের সৃষ্টি করে না, বরং বিনিময় হারে পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে ফটকাবাজারী (Speculating) করতেও সমর্থ হয়।[৩৩] ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত বেসরকারী ব্যাংক দ্বারা তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর উদ্বৃত্ত আয় বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কারণ তেলউৎপাদক দেশগুলো এসব ব্যাংকে তাদের অর্থ জমা রাখত এবং তা থেকে তেল আমদানিকারক দেশগুলোকে ঋণ দেয়া হয়। এছাড়াও তেল উৎপাদনের দেশগুলো থেকে সরকারী বিলের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ঋণ হিসেবে এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে তেল তহবিল সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া *আইএমএফ* এবং বিশ্বব্যাংকের মতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোও তেল রাজস্ব হস্তান্তরে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এসব প্রতিষ্ঠান তেলরপ্তানিকারক দেশগুলো থেকে ঋণ সংগ্রহ করে তেল আমদানিকারক দেশগুলোতে ঋণ সরবরাহ করে। সুতরাং, বেসরকারী ব্যাংকিং ব্যবস্থা অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকের মৌলিক দায়িত্ব পালন করে।

১৯৭০-এর দশকব্যাপী বেসরকারী ব্যাংকগুলো তেল রাজস্বের রিসাইক্লিং প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা পালন করে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকগুলো ইউরোপীয় মুদ্রায় বিপুল পরিমাণ আমানত সৃষ্টি করে এবং আন্তর্জাতিক ঋণদানের সদর দফতরে পরিণত হয়।[৩৪] ১৯৭৮ সালে বিনিময় হার তত্ত্বাবধান, জাতীয় নীতিসমূহ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নীতিমালার প্রয়োগ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উৎসাহিত করার দায়িত্ব *আইএমএফ*-এর উপর অর্পিত হয়। এছাড়াও একটি কাউন্সিল গঠন করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা পরিস্থিতির নিরীক্ষণ, বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা, পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার সমন্বয় সাধন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারের তারল্য নিশ্চিতকরণ এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সম্পদের হস্তান্তরের দায়িত্বও তারা গ্রহণ করে।[৩৫] যেসব দেশ *আইএমএফ*-এর কাছ থেকে বর্ধিত হারে ঋণ গ্রহণ করে, সেসব দেশের নীতি প্রভাবিত করার ক্ষমতাও *আইএমএফ*কে দেয়া হয়। তবে এসব ক্ষমতা কেবল দুর্বল রাষ্ট্রের ওপরই প্রয়োগ করা হতো। গ্রেট ব্রিটেন ১৯৭৬ সালে আইএমএফ থেকে ঋণ গ্রহণ করলেও আইএমএফ তার ওপর কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি।[৩৬]

১৯৭৮ সালে লক্ষ্য করা যায়, উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্বব্যাংক থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে, প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে বেশি পরিশোধ করে।[৩৭] প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনুন্নত ও উন্নত দেশগুলোর মধ্যে অসম সম্পর্কের কারণে গরিব দেশগুলো আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ব্যাংকগুলো ও *আইএমএফ* থেকে ঋণ নেয়াকে সহজ পথ হিসেবে বিবেচনা করে। তৃতীয় বিশ্বের এই ঋণের পরিমাণ ১৯৯০ সালে ছিল দুই ট্রিলিয়ন বা দুই লক্ষ কোটি ডলার। এই বিপুল ঋণ শোধ করার ক্ষমতা তৃতীয় বিশ্বের নেই। যে দেশের ঋণের পরিমাণ যত বেশি, ঘাটতি মেটাতে আরও ঋণ নেবার চাপও তাদের ওপর ততোধিক। আর অধিকাংশ সময়েই এ বাড়তি ঋণ দিতে হয় চড়া সুদে, কড়া শর্তে। একারণে ঋণগ্রস্ত দেশের আয়ের একটা বড় অংশ চলে যায় ঋণ পরিশোধে, দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে তার সামান্যই অবশিষ্ট থাকে। কোনো দেশের ঋণের পরিমাণ এতই বেশি যে তাদের শোধ দেবার ক্ষমতার চেয়ে দ্রচত হারে এর সুদ বাড়তে থাকে। এই ঋণ এক সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে খাতক দেশের জাতীয় সম্পদ আরও অধিক হারে নিঃশেষ করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আশির দশকের শেষভাগে প্যারাগুয়ের রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশই চলে যায় বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধে। অধিকাংশ খাতক দেশকেই তাদের ঋণ পরিশোধে তাদের রপ্তানি আয়ের এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয় করতে হয়। দেখা গেছে যে, ১৯৮৩ সালের দিকে বিদেশী ব্যাংকগুলো তৃতীয় বিশ্বে প্রদত্ত ঋণ থেকে যে পরিমাণ সুদ পেয়েছে তা সেখানে তাদের প্রাপ্ত মুনাফার চেয়ে তিন গুণ বেশি। এ সমস্যা আরও প্রকট করার জন্য গরিব দেশগুলোর মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটানো হয়। এ সংকট নিরসনে ফিদেল ক্যাস্ত্রো দরিদ্র দেশগুলোকে এই অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু ঋণ পরিশোধে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী দেশের বৈদেশিক একাউন্ট আটকে রাখা, বৈদেশিক সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং রপ্তানি বাজার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়ে যায়। তাই ঋণখেলাপি হয়ে পড়ার আশঙ্কায় দরিদ্র দেশগুলোকে আরও ঋণ নিতে হয়। কিন্তু নতুন ঋণ পাবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য কোনো দেশকে অবশ্যই আইএমএফ প্রদত্ত কাঠামো পুনর্বিন্যাসের শর্তে রাজি হতে হয়।[৩৮]

বিশ্বব্যাংক সম্পর্কে মাইকেল প্যারেন্টির বক্তব্য হলোঃ শ্রেণী পক্ষপাতে দুষ্ট বৈদেশিক সাহায্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে বিশ্বব্যাংক। এ প্রতিষ্ঠানটি ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদদের এক আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম যেখানে অনেকগুলো ব্যবস্থা পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এ ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদরা এমন সব প্রকল্পে শত শত কোটি ডলার যোগান দেয়, যে প্রকল্পগুলো অত্যাচারী দক্ষিণপন্থী শাসকগোষ্ঠীর

অবস্থান শক্তিশালী করে এবং বড় ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকারীদের ভর্তুকি যোগায়। এসব প্রকল্প আবার গরীবদের স্বার্থের বিপক্ষে কাজ করে। এমনকি পরিবেশের জন্যও ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে। কিন্তু এই শত শত কোটি ডলারের বেশির ভাগই আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের করের অর্থ থেকে।

আশির দশকে বিশ্বব্যাংক উত্তর-পশ্চিম ব্রাজিলে বর্ষণ বন ধ্বংস করে এক মহাসড়ক নির্মাণ করে এবং কয়েক লক্ষ একর বনভূমি নিধন করে। ধনী ব্রাজিলিয়ান পশু খামারমালিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থে সস্তা চারণভূমি তৈরির জন্যই এভাবে বনভূমি ধ্বংস করা হয়। এরপর ব্রাজিলীয় সরকার দরিদ্র মানুষকে শহর থেকে হটিয়ে মহাসড়কের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে পুরো এলাকা উজাড় হয়ে সম্পূর্ণ বনভূমি বৃক্ষহীন হয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাংকের এহেন কার্যকলাপ সম্পর্কে জিম হাইটাওয়ারের* মন্তব্য হলো: “বিশ্বব্যাংক মাত্র ৫০ বছরে যা করেছে, পৃথিবীর সব ব্যাংক ডাকাতরা মিলে এ পর্যন্ত তার এক শতাংশের এক দশমাংশও করতে পারেনি। [৩৯] এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, লেনিনের সময়কালে সাম্রাজ্যবাদের সূচনালগ্নে ব্যাংক সবেমাত্র শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। আজকের দিনে সে শোষণ আরও পরিণত রূপলাভ করে প্রতিক্রিয়াশীলতার সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছে।

ফিন্যান্স পুঁজি ও ফিন্যান্সিয়াল অলিগর্কি

সাম্রাজ্যবাদী দেশে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী (ফিন্যান্সিয়াল অলিগর্কি) সমস্ত ব্যাংক ও শিল্পপুঁজির (যার সংমিশ্রণে ফিন্যান্স পুঁজির জন্ম) ওপর একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯১২ সালে
লেনিন লক্ষ্য করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের এক তৃতীয়াংশ সম্পদ মরগ্যান ও রকফেলারের হাতে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের জনসমষ্টির শতকরা ৯ ভাগের হাতে দেশের শতকরা ৫৯ ভাগ সম্পদ ছিল। বৃটেনেও মাত্র ৮টি ধনী পরিবারের হাতেই ছিল সম্পদের মূল নিয়ন্ত্রণক্ষমতা।[৪০] ২০০৮ সালে ফোরবস-এর জরিপ অনুযায়ী, এ বছর ফিন্যান্স কোম্পানি ও ফিন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনগুলো (ব্যাংকিং, ফিন্যান্সিয়াল ও ইনস্যুরেন্স) মোট পরিসম্পদের ৭৫.৯৬% এর মালিক। ২০০৯ সালে ফিন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক ব্যবসায়িক ক্ষতির পরেও মোট পরিসম্পদের শতকরা ৭৪.৯ শতাংশের মালিক রয়ে গেছে।[৪১]

* জিম হাইটাওয়ার একজন মার্কিন সিন্ডিকেটেড কলামিস্ট, প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী এবং লেখক। তিনি ১৯৮৩ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত টেক্সাসের কৃষি বিভাগের একজন নির্বাচিত কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যাংক ও ফিন্যান্স পুঁজির এ ব্যাপক প্রভাব প্রমাণ করে যে, এ বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা ৬০ শতাংশ পুঁজি উৎপাদনশীল বিনিয়োগের সঙ্গে জড়িত নয়, বরং ফিন্যান্সিয়াল ফটকাবাজি বিনিয়োগের সঙ্গে জড়িত। লেনিন তাঁর তত্ত্বে উল্লেখ করেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী যুগে অলস একটি শ্রেণী বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠে। একারণে আন্তর্জাতিক মুদ্রা, বিনিময় ও শেয়ার বাজার এ বিশ্বের পণ্য দ্রব্যের বাণিজ্যের চেয়ে ১৯ গুণ বেশি। তাই স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিল্পগত মুনাফা কমে যাওয়ায় উৎপাদনে নিয়োজিত বিনিয়োগের পরিমাণও কমে গেছে। এ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি। এ সমস্ত পরিস্থিতি পুঁজিপতিদের পরাশ্রয়ী চরিত্রেরই স্বাক্ষর বহন করে যা সম্পূর্ণ উৎপাদনশীল চরিত্রের বিপরীত, কিন্তু এ গোষ্ঠীটিই এখন সামাজিকভাবে বেড়ে চলেছে এবং তাদের কতিপয় বৈশিষ্ট্যই আজকের যুগের সাম্রাজ্যবাদী জাতির ভিত্তি নির্মাণ করছে। সাম্রাজ্যবাদী নীতিমালার মাধ্যমে শিল্প পুঁজির তুলনায় ফটকামূলক ফিন্যান্স পুঁজি রক্ষা করা হয়। যদিও বিশ্ববাজার সংকুচিত হয়ে পড়ায় এটি উপলব্ধি করা সহজ নয়। ফটকামূলক বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা শিল্প মুনাফার সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলে শ্রমিক শোষণ আরও বেড়ে যায়। *ও. ই.সি. ডি*[*১]'র মাধ্যমে যে বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি (MAT) স্থাপিত হয় তাতে ফিন্যান্স পুঁজির ভিত্তিতে শিল্পবাজার পুনর্গঠনের উদ্যোগ ছিল। এটি প্রকৃতপক্ষে ফটকামূলক বাজারে মূল্যবান বিনিয়োগকে রক্ষা করার কৌশল হিসেবেই কাজ করেছে।

মুনাফা বৃদ্ধির এ ধরনের কৌশল সাম্রাজ্যবাদী যুগে ফিন্যান্স পুঁজিকে পুঁজিবাদী দ্বন্দ্বের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত করে। এটি বিশ্ব অর্থনীতিকে এক অপ্রত্যাশিত সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ফিন্যান্স পুঁজি সাম্প্রতিককালে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক খাতকেই নিয়ন্ত্রণ করছে না, সামাজিক খাত ও কূটনীতিতেও প্রভাব বিস্তার করছে। 'টিকুইলা প্রভাব'[*২] নামে পরিচিত সাম্প্রতিক আর্থিক বিপর্যয়, এশিয়ান সংকট, মস্কো স্টক এক্সচেঞ্জ সংকট–এসবই বিশ্ব অর্থনীতিতে শিল্প পুঁজির ওপর ফিন্যান্স পুঁজির আধিপত্যের কারণেই সংঘটিত হচ্ছে। এ বৈশিষ্ট্যটিই লেনিন কর্তৃক বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে

[*১] অর্গানাইজেশন ফর ইকনোমিক কো-অপারেশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট

[*২] ১৯৯৪ সালের মেক্সিকোর অর্থনৈতিক সংকট দক্ষিণ আমেরিকার অর্থনীতিতে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল তা অনানুষ্ঠানিকভাবে 'টিকুইলা প্রভাব' নামে পরিচিত।

ফিন্যান্স পুঁজি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণেই বিশ্বব্যাপী সংকট দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে, ফিন্যান্সিয়াল দানবরূপে পরিচিত জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্রের মতো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবনাও রয়ে যাচ্ছে বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে। কারণ আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মত আর্থিক ব্যবস্থাপনাগুলোই আন্তর্জাতিক ফিন্যান্স পুঁজির প্রধান উপকরণ হিসেবে কাজ করে।[৪২]

পুঁজির রপ্তানি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অদ্যাবধি দেখা গেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের নিজেদের দেশে লগ্নীকৃত পুঁজি থেকে আদায়কৃত মুনাফা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তার চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বেশী হারে বৃদ্ধি পেয়েছে অনুন্নত বিশ্বে লগ্নীকৃত পুঁজি থেকে আদায়কৃত মুনাফা।[৪৩] বিগত কয়েক দশকে মার্কিন কোম্পানিগুলো অন্যান্য দেশে তাদের খরচ তিন গুণ বৃদ্ধি করেছে। এর মধ্যে তৃতীয় বিশ্বে বৃদ্ধি ঘটেছে সর্বাধিক দ্রূত হারে। মার্কিন পুঁজিবাদ বর্তমানে যা রপ্তানি করে, তার চেয়ে আট গুণ বেশি পণ্য বিদেশে উৎপাদন করে। অনেক কোম্পানিই তাদের সব উৎপাদন কর্মকাণ্ড বিদেশে সরিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া ক্যামেরা, সাইকেল, টেপ রেকর্ডার, রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিআর, কম্পিউটার ইত্যাদির সবগুলো বা অধিকাংশই বিদেশে তৈরি। মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কর্মচারীদের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন বিদেশে কাজ করে। মার্কিন কোম্পানিগুলো প্রতি বছর হাজার হাজার কাজ বিদেশে সরিয়ে নিচ্ছে। কোনো কারখানাকে বিদেশে সরিয়ে ফেলা হবে– এ ভয় দেখিয়ে অধিকাংশ সময় মার্কিন শ্রমিকদের মজুরি ও ভাতাদি কর্তন মেনে নিতে ও অধিক সময় ধরে কাজ করতে বাধ্য করা হয়।

তাছাড়া বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিদেশে যে মুনাফা করে, সেই মুনাফা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত তাদের এজন্য যুক্তরাষ্ট্রে কোনো কর দিতে হয় না। আবার স্বাগতিক দেশে দেয়া করকে দেশেও করযোগ্য আয় থেকে বিনিয়োজিত অংশ হিসেবে না ধরে প্রদত্ত কর হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়াও বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের বিভিন্ন সহযোগী বা শাখা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কাগজপত্রে অর্থ লেন-দেন করে এমনভাবে হিসেব দেখায় যে, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বছরে কমপক্ষে দু'হাজার

কোটি ডলার কর দিতে হয় না[৪৪]। সাম্প্রতিক 'ফিসক্যাল ক্লিফ' নামে পরিচিত মার্কিন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ আয়ের নাগরিকদের কর বাড়ানোর প্রস্তাব পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে রিপাবলিকান পার্টির কচরপন্থী নেতাদের বিরোধিতায় প্রথম দফা আলোচনায় বাতিল হয়ে যায়। অথচ, এ বিল পাস হলে ৯৯.৮ শতাংশ মার্কিন জনগণের কর হ্রাসের বিষয়টি নিশ্চিত হতো এবং যাদের আয় দশ লাখ ডলারের বেশি তাদের ক্ষেত্রেই কর কার্যকর হতো।[৪৫] সুতরাং, মার্কিন সাম্রাজ্য যে সেদেশের গুটিকয়েক ধনিক শ্রেণীর কল্যাণেই নিয়োজিত এটি তারই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

এ সম্পর্কে মাইকেল প্যারেন্টি বলেন, সাম্রাজ্যের সুবিধাদি কখনোই আমেরিকার ভোক্তাদের লাভবান করে না। সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের শ্রমিকদের ভয়ানকভাবে শোষণ করে উৎপাদিত পণ্যাদি যত সম্ভব চড়াদামে আমেরিকার বাজারে বিক্রি করা হয়। যেমন, ইন্দোনেশিয়াতে নাইকির যে জুতো বানাতে সাত ডলার খরচ হয়, সেই জুতোই আমেরিকাতে বিক্রি করা হয় ১৩০ ডলার বা তারও বেশি দামে। এজন্য নাইকি কোম্পানি বা তার ঠিকাদাররা ইন্দোনেশিয়ার নারী শ্রমিকদের ঘন্টায় মাত্র ১৮ সেন্ট মজুরি দেয়। এ্যাডমিরাল ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট তাইওয়ানে কারখানা নিয়ে যাওয়ার কারণ অত্যন্ত খোলামেলাভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, এতে দেশের ভেতরে দামের কোনো তারতম্য ঘটবে না। কিন্তু কোম্পানির মুনাফা বাড়বে। এছাড়া বিদেশে কারখানা নেয়ার কোনো যৌক্তিকতা থাকে না।

এ ধরনের বৈদেশিক বিনিয়োগ তৃতীয় বিশ্বের জন্যও কোনো বিশেষ সুবিধা সৃষ্টি করে না। ১৯৬০ সালে বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে ব্রাজিলে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির ফলেও দারিদ্র বেড়ে যায় ও খাদ্যাভাব দেখা দেয়। কেননা, এতে ব্রাজিলের জনসাধারণের প্রয়োজন উপেক্ষা করে দেশের ভূমি ও শ্রমশক্তিকে ক্রমবর্ধমানভাবে রপ্তানির জন্য অর্থকরী কৃষিপণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত করা হয়েছিল।[৪৬] বহুজাতিক কর্পোরেশনের এ ধরনের বিনিয়োগের নেতিবাচক দিকগুলো অনেক সমালোচকই তুলে ধরেছেন। তারা যুক্তি দেন যে, এসব আন্তর্জাতিক একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান দক্ষতা কমাতে পারে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে শ্বাসরুদ্ধ করে রাখে। প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতিতে এসব কর্পোরেশন উৎপাদন সীমিত রাখে, কৃত্রিমভাবে উচ্চমূল্য বজায় রাখে এবং একচেটিয়া খাজনা আয় করতে সক্ষম হয়। এভাবে কর্পোরেশনগুলি অর্থনৈতিক দক্ষতা কমিয়ে ফেলে। এছাড়া নতুন পুঁজি যোগান দেয়ার পরিবর্তে স্থানীয় পুঁজি গ্রাস করে,

অনুপযোগী প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এবং স্বদেশী পরিচালকের পরিবর্তে বিদেশী পরিচালক নিয়োগের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করে।[৪৭]

বহুজাতিক কর্পোরেশন যেদেশে বিনিয়োগ করে সেদেশের অভ্যন্তরীণ গবেষণা ও উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে । ফলে স্বাগতিক দেশটি বহির্বিশ্ব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তির অধীন বা শিকার হতে পারে। এ সম্পর্কিত আরেকটি ভীতি হচ্ছে আমদানিকৃত প্রযুক্তির জন্য স্বাগতিক দেশগুলোকে বেশি খরচ বহন করতে হতে পারে। কারণ একটি বহুজাতিক কর্পোরেশন কর্তৃক প্রযুক্তির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের কারণে মালিক দেশটিকে প্রযুক্তির একচেটিয়া খরচ আদায়ে বাধ্য করে। ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বৈদেশিক ব্যবস্থাপক নিয়োগের ফলে দেশীয় ব্যবস্থাপকরা তাদের দক্ষতা ব্যবহার ও উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে। [৪৮]

১৯৬০ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় মালিকানায় প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ মজুদের পরিমাণ ৩২.৮ বিলিয়ন থেকে ১৩৭.২ বিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য উন্নত দেশের বিনিয়োগ যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় কম হলেও তা-ও নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সময়কালে পশ্চিম জার্মানির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ মজুদ ৮ বিলিয়ন থেকে ৩২ বিলিয়নে, যুক্তরাজ্যের ১২ বিলিয়ন থেকে ৩২ বিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ সালে কানাডার শিল্প কারখানার শতকরা ৫২ ভাগ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত মোট বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের তিন-চতুর্থাংশ বাজারনির্ভর উন্নত দেশগুলোর মধ্যে সীমিত থাকে। ১৯৭৬ সাল নাগাদ মোট ৯১৮ বিলিয়ন ডলারের বিশ্ব রপ্তানির তুলনায় আন্তর্জাতিক উৎপাদনের মূল্য প্রায় ৮৩০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসে বৈদেশিক মালিকানার পরিমাণ ছিল শতকরা ৫৭ ভাগ এবং এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানা ছিল ৪৫ ভাগ, খনিজ এবং ধাতু শিল্পের শতকরা ৫৬ ভাগ বৈদেশিক মালিকানাধীন ছিল যার মধ্যে ৪৫ ভাগই যুক্তরাষ্ট্রের হতে।[৪৯]

আমরা দেখতে পাচ্ছি, লেনিন প্রায় একশো বছর আগে যে পুঁজির রপ্তানি ও বিশ্ব অর্থনীতিতে ফিন্যান্স পুঁজির আধিপত্যের কথা বলেছিলেন- তা সময়ের প্রেক্ষিতে ক্রমবর্ধমান হারে শুধু বেড়েই চলেছে। ১৯৯৫ সালের (২৪ জুন) *Economist* পত্রিকার এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ১৯৮৩ সাল থেকে পরবর্তী ১৩ বছরে সরাসরি বিদেশে বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment,

সংক্ষেপে FDI) বাণিজ্যের পাঁচ গুণ দ্রচততর এবং বিশ্ব উৎপাদনের চেয়ে দশ গুণ দ্রচত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০-এ পাঁচ বছরের এফডিআই বৃদ্ধি পেয়েছে বার্ষিক ৩৫ শতাংশ হারে। এই একই সময়ে বিশ্ব রপ্তানী বাণিজ্যের বৃদ্ধি ছিল বার্ষিক ১৩ শতাংশ এবং বিশ্ব জি.ডি.পি (Gross Domestic Product বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) বৃদ্ধির হার ছিল ১২ শতাংশ। এই এফডিআই-এর ৭০ শতাংশ এসেছে মাত্র পাঁচটি দেশ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স) থেকে। অপর এক হিসাব থেকে জানা যায় যে, তৃতীয় বিশ্বে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) ১৯৯০ সালে ছিল ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯৫ সালে এ অঙ্ক বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৮৪ বিলিয়ন ডলার। আর ২০০০ সালে পুঁজির রপ্তানি বেড়ে দাঁড়ায় ১,১৪৯ বিলিয়ন ডলারে।[৫০]

পুঁজির রপ্তানি হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজির সর্বোচ্চ মুনাফা আদায়ের কৌশলমাত্র। আর বর্তমানে জীবাশ্ম জ্বালানি, মোটরগাড়ী ও তথ্যায়ন হচ্ছে নব্য-সাম্রাজ্যবাদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক গতিধারা নির্মাণকারী খাত। তাই এ খাতগুলোতে ব্যাপক পুঁজি রপ্তানি ঘটছে। বিশ্ব অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ২০০৩-২০০৮ এর তথ্যানুযায়ী, কম্পিউটার ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম, তড়িৎ সংক্রান্ত ও ইলেকট্রনচালিত উপকরণ, মিডিয়া, মূদ্রণ ও প্রকাশনা এবং টেলিযোগাযোগসহ সকল মিডিয়া ও তথ্যশিল্পে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ ছিল ২০০১ সালে ৫৫.৭%, ২০০২ সালে ৫৭%, ২০০৩ সালে ৫৫.৮%, ২০০৪ সালে ৫৬.৮%, ২০০৫ সালে ৫৯.৯% এবং ২০০৬ সালে ৬১.৬%। ২০০১ সালে ২৬টি তথ্যনির্ভর বৃহৎ কর্পোরেশনের বৈদেশিক বিনিয়োগ ছিল ৬০.২%, ২০০২ সালে ২২টি বৃহৎ কর্পোরেশনের বিনিয়োগ দাঁড়ায় ৫৫%, ২০০৩ সালে ২১টি কর্পোরেশন বিনিয়োগ করে ৫৫.৯%, ২০০৫ সালে ২০টি তথ্যনির্ভর কর্পোরেশনের বিনিয়োগ ৫৯.৫% এবং ২০০৬ সালে ১৮টি বৃহৎ কর্পোরেশনের বৈশ্বিক বিনিয়োগ দাঁড়ায় ৬১.৭%। এ থেকে বোঝা যায়, তথ্যনির্ভর কর্পোরেশনগুলোর অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের চেয়ে বৈশ্বিক বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক বেশী।[৫১]

সরাসরি বিনিয়োগ ছাড়া পুঁজির রপ্তানি ঋণের আকারে হতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে তৃতীয় বিশ্বে বৈদেশিক ঋণ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার নামে বা মাধ্যমেও আসে তা আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বর্ধিত হারে বৈদেশিক ঋণ আসতে শুরু করে। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, স্বল্প আয়ের দেশগুলোর বৈদেশিক ঋণের

পরিমাণ ছিল ১৯৮০ সালে ১৩৪ বিলিয়ন ডলার আর ১৯৯২ সালে সেই অঙ্ক দাঁড়ায় ৪৭৪ বিলিয়ন ডলারে। ১৯৮০ সালে দেয় সুদের পরিমাণ ছিল ৬.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৯৯২ সালে তা দাঁড়ায় ১৮.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। আশির দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের বৈদেশিক ঋণ বিশ্বে ঋণসংকট সৃষ্টি করেছিল। ঋণ নিয়ে সত্যিকারার্থে উন্নয়ন হলে আর এমন অবস্থা সৃষ্টি হতো না। ১৯৮২ সালে মেক্সিকো জানায়, তারা ঋণ পরিশোধে অক্ষম । এরপর একে একে লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশ এবং ১৯৮৩ - ৮৪ সালে ফিলিপাইন ও সাহারা মরুর নিকটবর্তী অধিকাংশ আফ্রিকান দেশ একটি আপত্তি জানায়। এ থেকেই ঋণ সংকটের শুরু। এতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো কিছুটা সমস্যায় পড়ে। কারণ ঋণগ্রস্ত দেশগুলো ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের বহুজাতিক ব্যাংকগুলোর দেউলিয়া হবার উপক্রম হয়। এ সমস্যা সমাধানে *আইএমএফ* ঐসব ঋণগ্রস্ত দেশকে নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ করে এবং নতুন শর্তে ঋণ প্রদান করে। এজন্য *আইএমএফ*-কে অর্থের যোগান দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নতুন শর্ত এমনভাবে প্রণীত হলো যার মধ্য দিয়ে ঋণগ্রস্ত দেশের পুরো অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ *আইএমএফ*-এর হাতে চলে আসলো। এভাবেই ফিন্যান্স পুঁজি ঋণের জালে আটকে রেখে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাম্রাজ্যবাদী দেশের অধীনস্থ করে রাখে।[৫২]

বিশ্বের অর্থনৈতিক বণ্টন

লেনিন পুঁজি রপ্তানির মধ্য দিয়ে মূলত বহির্বিশ্বে বৃহৎ কর্পোরেশনগুলোর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। বর্তমান বৈশিষ্ট্যটি এসব কর্মকাণ্ডের স্থানিক পরিধি ব্যক্ত করে। এ থেকেই বোঝা যায়, এ দুটি বৈশিষ্ট্য ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। সাম্প্রতিককালে প্রায়ই দেখা যায়, এক কোম্পানি আরেক কোম্পানির অংশ কিনে নিচ্ছে বা দুই কোম্পানি একত্রিত হচ্ছে। যেমন, জাপানের মিৎসুভিসির ২৪ শতাংশের মালিক যুক্তরাষ্ট্রের ক্রাইসলার। যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল মটরের সাথে জাপানি কোম্পানি টয়োটার যৌথ বাণিজ্যিক উদ্যোগ আছে। ২০০০ সালে বিপুল পুঁজি রপ্তানির কারণে রাষ্ট্রীয় সীমা অতিক্রম করে অন্য কোম্পানির সাথে একীভূত হওয়া বা কোম্পানির অংশবিশেষ ক্রয় করা সহজ হয়েছে।[৫৩]

সাম্প্রতিককালে গণমাধ্যম শিল্পে সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীকরণ ও একত্রীকরণের ফলে এ শিল্পে এখন ব্যাপক একচেটিয়া সমাহার সৃষ্টি হয়েছে। তাই বৈশ্বিক গণমাধ্যম বাজার বিশ্বের সর্ববৃহৎ নয় বা

দশটি বহুজাতিক কোম্পানির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এসব ফার্মের বিশ্বব্যাপী বিতরণ ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া বাণিজ্যিক প্রকাশনা ফার্মের অর্ধাংশ উত্তর আমেরিকার দখলে এবং বাকি অর্ধাংশ পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের অধিকারে। সম্মিলিতভাবে এই ৫০/৬০টি ফার্ম বিশ্বের বইয়ের প্রকাশনা, ম্যাগাজিন প্রকাশনা, মিউজিক রেকর্ডিং, টিভি স্টেশন ও ক্যাবল চ্যানেলের মালিকানাসত্ত্ব, স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের মালিকানসত্ত্ব, চলচ্চিত্র তৈরি, থিয়েটারের মালিকানা সত্ত্ব এবং সংবাদপত্র প্রকাশনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। বৈশ্বিক গণমাধ্যম বাজারে একীভূত হওয়ার অর্থনৈতিক সুবিধা প্রচুর। বড় ফার্মগুলোর সাথে যুক্ত না হয়ে ছোট ফার্মগুলো বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। যেমন, গণমাধ্যমে নিজেদের অভিন্নতাকে তুলে ধরার জন্য সনি ব্ল্যাকস্টোন গ্রুপের বিনিয়োগ ভাড়া করেছে। মিউজিক্যাল প্রতিষ্ঠান ই.এম.আই-এর মতো ফার্মগুলো অন্য পাঁচ বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর যেকোনো একটির সাথে একীভূত হয়েছে। জার্মানিতে দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কিরচ ও ব্যাটেলস্ম্যান ১৯৯৭ সালে তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন করে যুগ্মভাবে প্রিমিরী'র মালিকানা পরিচালনা করে। জাপানের নিউজ কর্পোরেশন তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান ব্রডকাস্টিং-এর সাথে মিলিত হয়ে একযোগে কাজ করছে।

আবার সর্ববৃহৎ নয়টি গণমাধ্যম মোড়লের মধ্যে ছয়টার সাথেই বহুজাতিক বৃহৎ দশটি হাউসের যৌথ উদ্যোগ রয়েছে। প্রায়শই বহুজাতিক গণমাধ্যম কর্পোরেশনগুলোর একে অপরের সাথে ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগগুলো স্বাচ্ছন্দে গ্রহণ করে। কেরি প্যাকারের পাবলিশিং এ্যান্ড ব্রডকাস্টিং লিমিটেড অস্ট্রেলিয়ার গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করায় রুপার্ট মারডকের নিউজ কর্পোরেশন তার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে শুরু করে। অপর নয়টি গণমাধ্যম মোড়লের সাথে নিউজ কর্পোরশনের যৌথ ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ রয়েছে।[৫৪] ১৯৮৯ সালে টাইম এবং ওয়ার্নার কমিউনিকেশনস্-এর একত্রীকরণের ফলে টাইম ওয়ার্নার গড়ে ওঠে যা ১৯৯৬ সালে টার্নার ব্রডকাস্টিং অধিগ্রহণ করে। ১৯৯৮ সালেই এটা প্রায় ২৬ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করে এবং এর বিক্রি খুব দ্রুতই ব্যাপক আকারে বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯৯০-এর শুরুর দিকে ১৫ শতাংশ লভ্যাংশ থেকে ১৯৯৭ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫ শতাংশে। টাইম ওয়ার্নারের মালিকানাধীন সিএনএন ইন্টারন্যাশনাল হলো প্রভাবশালী বৈশ্বিক টেলিভিশন সংবাদ চ্যানেল, এটি কিছু ভাষায় প্রায় দু'শোটি রাষ্ট্রে সম্প্রচারিত হয়। এছাড়া তাদের এইচবিও চ্যানেলটি সাফল্যজনকভাবে পশ্চিম ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা, পূর্ব ইউরোপ এবং সমগ্র এশিয়াজুড়ে বিস্তৃত। এছাড়া ওয়ার্নার ফিল্ম স্টুডিও অস্ট্রেলিয়ান, জার্মান, ফ্রেঞ্চ এবং স্প্যানিশ কোম্পানিগুলোর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজী ছাড়া

অন্য ভাষাতেও যৌথ উদ্যোগের চলচ্চিত্র নির্মাণ করছে। বেশকিছু জনপ্রিয় ব্র্যান্ডিং নাম ব্যবহার করে টাইম ওয়ার্নার প্রোগ্রামিং, চ্যানেল এবং গণমাধ্যম উৎপাদিত পণ্যের কেনা-বেচা এবং লাইসেন্সিং-এর ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষমতা লাভ করে দেড়শটি ওয়ার্নার ব্র্যান্ডসহ বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্সিং চুক্তি, পণ্য বেচা-কেনার মাধ্যমে প্রতি বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় করছে। একই সাথে বিশ্বব্যাপী এর পণ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে।

ডিজনি বিশ্বব্যাপী এমন একটি বৃহৎ গণমাধ্যম ফার্ম যার সারা বিশ্বে ৫৯০টি শাখা রয়েছে। এসব শাখার মাধ্যমে ডিজনি যেমন পণ্য বিক্রয় করেছে, তেমনি বিপুলসংখ্যক উৎপাদনকারী ও বিক্রেতাকে লাইসেন্সিং সুবিধা দিচ্ছে।[৫৫] ফ্রান্স, জাপান ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে ডিজনির সুসংগঠিত বিতরণ ব্যবস্থা রয়েছে। স্কান্ডিনেভিয়ান ব্রডকাস্টিং সিস্টেমস এর বৃহত্তম শেয়ার হোল্ডার ডিজনি নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও ফিনল্যান্ড, বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডে বাণিজ্যিক টেরিস্টরিয়াল টিভি চ্যানেলগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এগুলোর বেশকিছুর মালিকানা রয়েছে। ডিজনির ইএসপিএন ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বব্যাপী ১৬৫টিরও বেশি দেশে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি ব্যবহার আর খেলাধুলা সম্প্রচারে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ইএসপিএনের বাণিজ্যিক নাম ব্যবহার করে মুনাফা অর্জনের জন্য ইএসপিএন গ্রিল রেস্টুরেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রুপার্ট মারডক অস্ট্রেলিয়াতে সংবাদপত্রের দৈনিক সার্কুলেশনের ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করতেন। পরে বৃটেনে তিনিই সর্ববৃহৎ সংবাদপত্র প্রকাশক হিসেবে আবির্ভূত হন। তার ব্রিটিশ স্কাই ব্রডকাস্টিং, ইউএস ফক্স নেটওয়ার্ক বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তার করছে। ১৯৯৮ সালে মারডক দাবি করেন, তার টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ শতাংশের কাছে পৌঁছেছে। ল্যাটিন আমেরিকা, জাপান ও ভারতে সম্প্রচারিত স্যাটেলাইট ব্যবস্থার মাধ্যমে এটা সম্ভব হয়েছে যা তার অন্যান্য কর্মকাণ্ডকেও পূর্ণতা দিয়েছে। ব্রিটিশ স্কাই ব্রডকাস্টিং শুধু ব্রিটেনের স্যাটেলাইট টেলিভিশনের উপর আধিপত্য করছে না, বিশ্বজুড়ে সম্প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ম ও প্রোগ্রাম উৎপাদনের সুবিধাদিও পরিচালনা করেন। তার অন্য দুটি প্রধান টেলিভিশন ব্র্যান্ড 'ফক্স চ্যানেল' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন নেটওয়ার্ক হলেও প্রধান চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন উৎপাদন স্টুডিও'র সাথে সম্পর্কিত। ১৯৯৩ সালে এশিয়ায় নিউজ কর্পোরেশন স্টার টেলিভিশন সার্ভিস বিক্রয় করে এশিয়ান টেলিভিশন বাজার সৃষ্টি করে। ভারতে আটটি

ভিন্ন ভিন্ন নেটওয়ার্কের কোনো কোনোটিতে পঞ্চাশ শতাংশ বা শতভাগ শেয়ার রয়েছে নিউজ কর্পোরেশনের। এ সমন্বয় সামগ্রিকভাবে ভারতের অভ্যন্তরে ক্যাবল ও স্যাটেলাইট দর্শনসত্ত্বের ৪৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। চীনে নিউজ কর্পোরেশনের ছয়টি নেটওয়ার্ক রয়েছে এবং যৌথ পরিচালনায় ফোনিক্স ৩৬.২ মিলিয়ন চাইনিজ টেলিভিশন বাসিন্দাদের নিজেদের আওতাভুক্ত করেছে। তাইওয়ানে নিউজ কর্পোরেশনের সাতটি চ্যানেল রয়েছে যেগুলো বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ১৯৯৭ সালে ভারতীয় সরকার বৈদেশিক গণমাধ্যম মালিকানাসত্ত্বের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করলে মারডক ভারতের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের স্থানীয় নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ দেন। চীনেও একই ঘটনা ঘটে। এভাবে নিউজ কর্পোরেশনের মতো ফার্মগুলো একত্রীকরণ এবং একীভূতকরণের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং প্রয়োজনে ঋণের বৃহৎ পরিসরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণ করছে। এতে তাদের মন্দা ব্যবসা কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়ে পড়ে।[৫৬]

আপাতদৃষ্টিতে এসব একচেটিয়া সমাহারগুলোর একত্রীকরণের বিষয়টি সহযোগিতামূলক মনে হলেও পরবর্তীতে শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন বা ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায় না। আবার একটি একচেটিয়া সমাহারের বাণিজ্যিক কৌশল অন্যটিকে নতুন কৌশলের প্রতি প্রলুব্ধ করে। এরা সাধারণত একে অন্যের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মিডিয়া সাম্রাজ্যের প্রধান তিনটি একচেটিয়া সামাহার টাইম ওয়ার্নার, ডিজনি ও নিউজ কর্পোরেশনের মধ্যে এরূপ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। টাইম ওয়ার্নারের ‘স্পোর্টস্ ইলাস্ট্রেটেড’ এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে ডিজনি ইএসপিএন স্পোর্টস ম্যাগাজিনের প্রকাশ শুরু করে। সিবিএস, এনবিসি ও এবিসি’র সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েই মারডক তার ইউএস ফক্স টিভি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন।[৫৭] এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা গড়তে আবার নতুন একচেটিয়া সমাহারের আবির্ভাব ঘটতে পারে। এ বাস্তবতাই লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণীকে সুস্পষ্ট করে তোলে। সাম্রাজ্যবাদীদের এ প্রতিযোগিতা তাদেরকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিতে পারে। বিশ্বময় তাদের এ বাজার দখলের প্রবণতা পরবর্তীতে তাদের ভূ-খণ্ড দখলের দিকে অগ্রসর করে। একেই লেনিন সাম্রাজ্যবাদের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ বিশ্বের রাজনৈতিক বণ্টন

লেনিন তাঁর সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, একচেটিয়া সমাহারগুলোর এ পৃথিবীকে পুরোপুরি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়ার প্রবণতাকে। ফিন্যান্স পুঁজি যেকোনো উপায়েই হোক এ বিশ্বের সর্ববৃহৎ পরিমাণ ভূ-খণ্ড দখল করতে চায় । এর ফলে এ বিশ্বের আধিপত্যবিস্তারকারী দেশগুলো শোষণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে চায়। তাই তারা বিশ্ববাজারে একচেটিয়া অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য ট্রাস্ট, কার্টেল, কর্পোরেশন, ফিন্যান্স পুঁজির মাধ্যমে কিংবা ঋণপ্রদান বা ঋণগ্রহীতা দেশের কাছ থেকে ঋণ আদায়ের ভিত্তিতে এ কাজটি সম্পন্ন করে। লেনিন লক্ষ্য করেছেন, পুঁজিবাদী দেশগুলো এ বিশ্বের সকল অঞ্চলের ওপর এখন প্রভাব বিস্তার করেছে। আজকের যুগে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর প্রত্যক্ষভাবে উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজন পড়ে না, রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোকেই তারা অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে ঔপনিবেশিকতার জালে আবদ্ধ করে রাখতে পারে। বিশ্ব ফিন্যান্স পুঁজির শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে এ নির্ভরশীলতার চক্র সৃষ্টি হয়। লেনিন তাঁর সময়কালে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক কতখানি ভূ-খণ্ড দখলে আছে–এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর নেতৃত্বে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সাম্প্রতিক বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সবচেয়ে আধিপত্যশীল সামরিক শক্তি। ইউরোপীয় দেশগুলো, রাশিয়া ও চীনের দ্বারা খুব একটা বাধাপ্রাপ্ত না হওয়ার কারণে এটি যেকোনো সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তার সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে। অন্যান্য সরকারের তুলনায় মার্কিন সরকারের সামরিক শক্তির তুলনা করে দেখা যেতে পারে। ২০০৬ সালে ইইউ২৫ভুক্ত দেশগুলো সামরিক খাতে ৭৯,৩৯২.৭ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে যা সরকারী ব্যয়ের ১০.৮ শতাংশ, শিক্ষাখাতে ৯৫,০০৫.১ মিলিয়ন ডলার (যা সরকারী ব্যয়ের ১২.৯ শতাংশ) এবং স্বাস্থ্যখাতে ১৩৮,১৪৪.৫ মিলিয়ন ডলার (যা মোট সরকারী ব্যয়ের ১৮.৮ শতাংশ) খরচ করে। অপরদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০৮ সালে সামরিক খাতে ৪৬৭,০৬৩ মিলিয়ন ডলার (যা মোট সরকারী ব্যয়ের ১৭.১%), শিক্ষা খাতে ৮৭,৭৩৪ মিলিয়ন ডলার (যা মোট সরকারী ব্যয়ের মাত্র ৩.২%) এবং স্বাস্থ্য খাতে ৩০৬,৫৮৫ মিলিয়ন ডলার (যা মোট সরকারী ব্যয়ের ১১.২%) খরচ করে। সুতরাং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এর প্রভুত্ববিস্তারকারী চরিত্রের কারণে। এর মানে এই নয় যে, এটি কখনোই ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র বা রাশিয়া, চীনের দ্বারা সামরিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে না। বরং তাদের কথিত বিপজ্জনক

গোষ্ঠী আল-কায়েদা কিংবা ইরান, উত্তর কোরিয়া বা ভেনিজুয়েলার দ্বারা সামরিক হুমকির মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা নেই।

ক্যালিনিকাস (২০০৩,২০০৫,২০০৭), হার্ভে (২০০৫, ২০০৬), প্যানিচ ও গিনডিন (২০০৪, ২০০৫) ও উড (২০০৩) তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন, আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পেছনে কারণ ছিল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য তেল সম্পদ কুক্ষিগত করা। সেইসঙ্গে পুঁজি ও পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তি বিস্তৃত করা, ইউরোপ ও চীনে তার অবস্থান শক্ত করা এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ওপর কৌশলগত প্রভুত্ব স্থাপন করা তথা পাশ্চাত্যের আধিপত্যের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টিকারী ইসলামী জাতি ও গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা। এর মধ্য দিয়ে সে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজুড়ে নব্য-উদারবাদী পুঁজিবাদের বিস্তৃতির সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে।[৫৮] তবে আফগানিস্তান ও ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ এবং ইরান, পাকিস্তান, সিরিয়া, লেবানন, ভেনিজুয়েলা বা বলিভিয়ার বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধের হুমকি, অর্থনৈতিক প্রভাব ও ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য রক্ষার লড়াই বৈ অন্যকিছু নয়। এসবই হচ্ছে নব্য-সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি। যদিও বিনিয়োগ, বাণিজ্য, কেন্দ্রীভবন, বহুজাতিকীকরণ, নব্য-উদারীকরণ, কাঠামোগত সমন্বয় এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার মত অর্থনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করেই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা করা যায়। এ কাজে এখন আর সামরিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন পড়ে না। তাহলে কেন এই সামরিক হস্তক্ষেপ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, পৃথিবীর সব অঞ্চলই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে চায় না। এর ফলে কিছু প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায়। এ সংকট কাটিয়ে অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পুঁজি রক্ষার জন্য এ যুদ্ধযাত্রা প্রমাণ করে যে, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তারা যুদ্ধের মতো ন-অর্থনৈতিক বিষয়কে 'উপায়' হিসেবে ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদকে টিকিয়ে রাখতে চায়।[৫৯]

লেনিন তাঁর সময়কালেই অর্থনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে সংঘাতের অনিবার্যতার দিকটি উল্লেখ করেছিলেন। আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধ যে অর্থনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় যুদ্ধ পরবর্তী বৈদেশিক বিনিয়োগের বর্ধিত হার দেখে। ২০০২ সাল থেকে আফগানিস্তানে এবং ২০০৩ সাল থেকে ইরাকে বৈদেশিক বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। ইরাকের প্রধান

অর্থনৈতিক সম্পদ হচ্ছে তেল। UNCTAD*১ এর তথ্যানুযায়ী, ২০০২ সালে সকল রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ৯৯.৩ শতাংশ ছিল জ্বালানি। ২০০৬ সালে মন্দার পরেও এটি ৯৩.৯ শতাংশের মত উচ্চ হারই রয়ে গেল। ২০০৬ সালে ২০০২ এর তুলনায় রপ্তানি মূল্যের ২.৩ গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০০৩ সালে ইরাক দখলের পরে ২০০৪ সালে বৈদেশিক বিনিয়োগ ৩০০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছে এবং ২০০৫ সালে তা বেড়ে ৫০০ মিলিয়ন ডলারকেও ছাড়িয়ে যায়। ২০০৩ সালে ইরাকে তেল রপ্তানি হয় ১০ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি। ২০০৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৫ সালে তা বেড়ে ২২ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে এবং ২০০৬ সালে তা ২৮ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। ইরাকে এ জ্বালানি রপ্তানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তেলের আমদানি মূল্য ২.৮ গুণনীয়ক হারে বৃদ্ধি পায় এবং ব্রিটেনে তা ৩.৮ গুণনীয়ক হারে বৃদ্ধি পায়। [৬০] তবে বিনিয়োগে সুযোগ সৃষ্টি হওয়া কিংবা সম্পদ দখলই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এর সঙ্গে আরও একটি বিষয় জড়িয়ে আছে আর তা হলো অস্ত্র বাণিজ্য। ২০০৮ সালের SIPRI*২-র প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০০৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪১টি অস্ত্র উৎপাদনকারী কোম্পানি এ বিশ্বে ৬৩ শতাংশ অস্ত্র বিক্রি করে। ১৯৯৮ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে বিশ্বের সমরাস্ত্র ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ তথ্য প্রমাণ করে দেয় যে, নব্য-সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আধিপত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[৬১] লেনিন সাম্রাজ্যবাদের যে যুদ্ধংদেহী চরিত্রের কথা বলেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আজকের দিনে তা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে প্রকট আকারে বিদ্যমান।

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ইরাক ও আফগান যুদ্ধ আজকের দিনে লেনিন প্রদত্ত সাম্রাজ্যবাদের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটির সবচেয়ে বড় বাস্তব প্রমাণ। ভূ-খণ্ড দখল ও বৈশ্বিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক আগ্রাসন নব্য-সাম্রাজ্যবাদের একটি পরিচিত বৈশিষ্ট্য। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এ আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। লেনিন বলে গিয়েছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ যতই শোষণ বৃদ্ধি করে, এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনও তত বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে ক্রিশ্চিয়ান ফাচ্স*৩ যুক্তি দেন, ৯/১১ এর আক্রমণ এবং বৈশ্বিক

*১ United Nations Conference on Trade and Development

*২ Stockholm International Peace Research Institution

*৩ ক্রিশ্চিয়ান ফাচস অস্ট্রিয়ার স্যালজবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি ও সমাজ বিষয়ক উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রে কর্মরত আছেন। গবেষণাকর্মে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি 'ভেনিয়া ডোসেন্ডি' খেতাব অর্জন করেন। তিনি ১২০টিরও বেশি গবেষণামূলক প্রবন্ধের রচয়িতা। তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে *Internet and Soceity : Social Theory in the Information Age (Routledge, 2008)* ও *Foundation of Critical Media and Information Studies* (Routledge, 2010)।

সন্ত্রাসবাদের বিস্তার ও বিশ্বের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়া। এটি দুষ্ট চক্রের মতো বৈশ্বিক যুদ্ধের জন্ম দিচ্ছে। এসব যুদ্ধ একদিকে পাশ্চাত্যের প্রভাব বিস্তার ও আধিপত্য নিশ্চিত করতে চাইছে। অপরদিকে, বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ পাশ্চাত্য জীবনধারা ও নিয়ন্ত্রণকে ছিন্ন করতে চাইছে।[৬২] একথা সত্যি, বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের পেছনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদদ থাকলেও কিংবা এ কাজে সিআইএ ইন্ধন যোগালেও ক্ষুব্ধ মানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়েই তারা এসব ঘটনা ঘটাতে সমর্থ হচ্ছে। এসব সন্ত্রাসী হামলার অজুহাতে তারা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছে আর ক্রমশ জনমনে জন্ম নিচ্ছে অসন্তোষ, তাই একদিকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও শোষণ। অপরদিকে, দেখা যাচ্ছে যুদ্ধ ও শোষণবিরোধী গণআন্দোলন। এসবই লেনিন প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব প্রতিফলনমাত্র।

লেনিনের তত্ত্ব মূল্যায়ন

লেনিন তাঁর তত্ত্বে সাম্রাজ্যবাদের যে লক্ষণগুলো তুলে ধরেছিলেন তা সাম্প্রতিককালে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তারপরেও লেনিনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কিছু আপত্তি পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। যেমন, টম কেম্প[৬৩] বলেন, "লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্ব পুঁজিবাদের কাঠামোগত পরিবর্তনকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে, পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে তার উপনিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক উপেক্ষিত হয়েছে। কেম্পের সমালোচনাটি হার্ব এ্যাডো[*] ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হন। তিনি বলেন, লেনিন কাঠামোগত পরিবর্তনকে বেশী গুরুত্ব দিতে চাচ্ছেন আর তিনি বলতে চেয়েছেন এ পরিবর্তন ইউরোপে সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ লেনিনীয় তত্ত্ব অ-ইউরোপীয় ও নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্র ও তাদের উপনিবেশের মধ্যকার সম্পর্ককে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেনি।[৬৪] এ্যাডো মূলত বলতে চেয়েছেন, লেনিনের সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্ব একটি ইউরোপকেন্দ্রিক তত্ত্বে পরিণত হয়েছে এবং বিশ্বের অপর প্রান্তের মানুষকে এখানে উপেক্ষা করা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, লেনিনের উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি এর একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা উপস্থাপন

---

* ড. হার্ব এ্যাডো মূলত সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক রূপান্তর ও বৈশ্বিক প্রগতির সমস্যা বিষয়ে তাঁর বিচারমূলক তত্ত্বের জন্য বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক তত্ত্ব ও পদ্ধতিতত্ত্বের এবং উন্নয়নের বৈশ্বিক রাজনৈতিক তত্ত্বের উপর বক্তৃতা করতেন। এছাড়া ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্সের রিডারের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট অগাস্টিন ক্যাম্পাস নিয়মিতভাবে 'হার্ব এ্যাডো মেমোরিয়াল লেকচার সিরিজে'র আয়োজন করে আসছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে: *ট্রান্সফরমিং দ্য ওয়ার্ল্ড ইকনোমি? নাইন ক্রিটিক্যাল এসেজ অন দ্য নিউ ইন্টারন্যাশনাল ইকনোমিক অর্ডার* (১৯৮৪), *ডেভেলপমেন্ট এজ সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন: রিফ্লেক্সশন্স অন দ্য গ্লোবাল প্রবলেমেটিক* (১৯৮৫) এবং *ইমপিরিয়ালিজম: দ্য পারমানেন্ট স্টেইজ অফ ক্যাপিটালিজম* (১৯৮৬)

করা। এ কাজটি করতে গিয়ে তিনি সবশেষে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদের স্থান নিরূপণ করেন এবং সাম্রাজ্যবাদের অনিবার্য পরিণতি কি হতে পারে সে সম্পর্কে একটি দিক-নির্দেশনা দিয়ে যান। তিনি মূলত শোষণের চরিত্র তুলে ধরেন, শোষক-শোষিতের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তবে তিনি সাম্রাজ্যবাদী যুগকে প্রতিরোধ আন্দোলনের যুগ বলে অভিহিত করেন। কারণ এসময়ে শোষণ সর্বোচ্চ রূপলাভ করে।

এ্যাডোর সমালোচনাটি মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত একটি বহুল প্রচলিত আপত্তি। এ মতানুসারে মার্কসবাদীরা বলে থাকেন, পুঁজি পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়া ইউরোপে হওয়ার কারণে ইউরোপেই পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে। সুতরাং, মার্কসবাদীরা যে ইতিহাসের বর্ণনা দেন তা ইউরোপকেন্দ্রিক। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, ইউরোপে ব্যাপক পুঁজি পুঞ্জীভবন ঘটে মূলত বহির্বিশ্বে বিস্তর লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা এ বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। লেনিনসহ কোনো মার্কসবাদীই বলেননি, পৃথিবীর অপরাপর সভ্যতা ইউরোপের মত সমৃদ্ধ ছিল না। বরং বলতে চেয়েছেন, অপরাপর সভ্যতা ইউরোপের মত লুণ্ঠনকেন্দ্রিক ছিল না। যেমন, টেরেসা হেয়টার* তাঁর *বিশ্ব দারিদ্র* [৬৫] গ্রন্থটিতে উল্লেখ করেছেন, আমেরিকা থেকে লুণ্ঠনকৃত সোনা ও রূপা ইউরোপীয়রা এশিয়া থেকে সম্পদ আহরণের কাজে লাগাতো। কারণ শিল্পগতভাবে অনেক উন্নত স্বনির্ভর চীন ও ভারতকে দেয়ার মতো ইউরোপীয়দের তেমন কিছুই ছিল না । কাজেই প্রথমাবস্থায় প্রাচ্যের সাথে ইউরোপের বাণিজ্য ছিল শান্তিপূর্ণ। এই বাণিজ্য পরিচালিত হতো আমেরিকায় পরিচালিত ধ্বংসলীলা ও গণহত্যার মূল্যে।[৬৬] মাইকেল প্যারেন্টিও তাঁর *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে* গ্রন্থে বলেছেন, "তৃতীয় বিশ্ব হিসেবে আজ যা পরিচিত, সেখানকার বহু জায়গার মানুষরা স্থাপত্য, উদ্যানবিদ্যা, কারুশিল্প, শিকার ও মাছ ধরা, ধাত্রীবিদ্যা, চিকিৎসা এবং এ ধরনের আরও বহু বিষয়ে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের সামাজিক আচার-আচরণ সে সময়ের ইউরোপের চেয়ে অনেক বেশি মানবিক সহৃদয়তাপূর্ণ, মনুষ্যোচিত, অনেক কম কর্তৃত্বপরায়ণ ও নির্যাতনমূলক ছিল।[৬৭]

লেনিনসহ অন্যান্য ক্ল্যাসিকাল মার্কসবাদীরা এসব ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহকে গুরুত্ব না দিয়ে বরং বিশ্বজোড়া ইউরোপীয় শোষণ ও নিয়ন্ত্রণের দিকটি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। পরবর্তী মার্কসবাদী

---

* টেরেসা হেয়টার যুক্তরাজ্যের একজন বর্ণবাদবিরোধী ও মুক্ত অভিবাসনের সমর্থক একজন কর্মী ও লেখক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে: *এইড এ্যাজ ইমপিরিয়ালিজম* (১৯৭১), *ক্রিয়েশন অফ ওয়ার্ল্ড পোভারটি* (১৯৮১), *ওপেন বর্ডারস* (২০০০)।

গবেষকদের গবেষণায় অবশ্য ঐতিহাসিক দিকটিও স্থান পেয়েছে। লেনিন তাঁর সময়কালের পরাশক্তিগুলো বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে তা দেখিয়েছেন। সাম্প্রতিককালেও আমরা দেখতে পাই, দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অধীনে থাকায় উপনিবেশগুলোতে একটি সুবিধাভোগী পুঁজিবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যাদের মূল ভূমিকা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করা, এবং এর বিনিময়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা। উপনিবেশ থেকে স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভবে এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি । কারণ এ বুর্জোয়া শ্রেণীই আবার শাসনক্ষমতা দখল করেছে। অনুন্নত দেশে অনুন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার মূল কারণই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ । এ শোষণ রফতানিমুখী খাতে পুঁজি বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এর ফলে অনুন্নত দেশগুলোতেও এক 'বিকৃত' বা 'লুম্পেন' পুঁজিবাদী উন্নয়ন সংঘটিত হয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও তার প্রভাব বিস্তৃত হয়।[৬৮]

এ্যাডোর আরেকটি আপত্তি হলো ঊনবিংশ শতাব্দীর একচেটিয়ার সঙ্গে পূর্ববর্তী পর্বের একচেটিয়া সমাহারের পার্থক্য কোথায়?[৬৯] এ আপত্তিটি নিতান্তই অযৌক্তিক। কারণ আমরা ইতোপূর্বেই পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে দেখেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই প্রথম একচেটিয়া সমাহারের আবির্ভাব ঘটে। এর পূর্ববর্তী পর্ব ছিল শিল্প ও বাণিজ্য পুঁজির যুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই প্রথম ব্যাংক ও শিল্প পুঁজির সহমিলনের ফলে যে ফিন্যান্স পুঁজির জন্ম তা-ই সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির প্রধান নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে এ্যাডোর বক্তব্য হলোঃ ফিন্যান্স পুঁজির একচেটিয়াতন্ত্র ছাড়া এ বিশ্বের বণ্টন সম্পন্ন হবে না তার কোনো প্রমাণ নেই।[৭০] ফিন্যান্স পুঁজির আধিপত্য ছাড়াও হয়তো পরাশক্তিগুলো এ বিশ্ব ভাগাভাগি করে নিতে পারতো। কিন্তু এ কাজটি এখনকার মতো এত সহজসাধ্য হতো না। ফিন্যান্স পুঁজির আবির্ভাবের কারণে ফটকামূলক প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংকগুলো সহজেই ঋণদান ও পুঁজির পাচারের কাজে অংশ নিচ্ছে। ফলে সহজেই তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশকে নির্ভরশীলতার চক্রে আটকে ফেলতে পারছে। তাছাড়া ফিন্যান্স পুঁজি একটি পরাশ্রয়ী শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে যা পুরোপুরি উৎপাদনমুখী চরিত্রের বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে, ফিন্যান্স পুঁজি ছাড়া বিশ্বের ভাগাভাগি সম্ভব হতো না, একথা তিনি কখনো বলেননি। লেনিন দেখিয়েছেন, একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়ে ফিন্যান্স পুঁজির আবির্ভাব ঘটে। এ ফিন্যান্স পুঁজি ও তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা ফিন্যান্সিয়াল অলিগর্কি পুঁজিবাদকে একটি চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে উপনীত করে যা অন্যান্য যুগের তুলনায় অধিক শোষণমূলক।

রাজেন হার্ষে*[৭১] লেনিনের তত্ত্বের কিছু অন্তর্নিহিত ত্রুটি নির্দেশ করার চেষ্টা করেন। লেনিন দেখিয়েছেন, ফিন্যান্স পুঁজির স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ওপর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়। ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তারা নব্য ঔপনিবেশিক শোষণ প্রতিষ্ঠা করে ফিন্যান্স পুঁজির মাধ্যমে। এখানে হার্ষের আপত্তি হলো : পুঁজিবাদের অগ্রসরমান পর্যায়ে যদি ঔপনিবেশিক শোষণ অপরিহার্য হতো, তাহলে উপনিবেশ ছাড়াই সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডের পুঁজিবাদ বিকশিত হতে পারতো না। আমরা যদি এ দুটো দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক তৎপরতা মূল্যায়ন করে দেখি তাহলেই এ সমালোচনার বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করা যাবে। সম্প্রতি সুইডেনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ঝুঁকিপূর্ণ পুঁজি কোম্পানি সুইডফান্ড ইন্টারন্যাশনাল সুইডেনের কোম্পানিগুলোকে আফ্রিকা, এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের (ইইউ'র সদস্যভুক্ত নয়) দেশগুলোতে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে। এ লক্ষ্যে তারা কোম্পানিগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। আবার সুইডফান্ড সুইডিশ কোম্পানিগুলোকে আফ্রিকা, এশিয়া বা লাতিন আমেরিকার সেসব দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত করছে যেসব দেশে সদ্য সংঘাতের অবসান ঘটেছে এবং যারা উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ নয়।[৭২] এ থেকে বোঝা যায়, তারা যেমন একদিকে সস্তাশ্রম পেতে চায়, আরেকদিকে, সংঘাতমুক্ত দেশগুলোতে নির্বিঘ্নে বিনিয়োগে আগ্রহী। এটিও একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, উন্নত দেশগুলো সেসব দেশেই সংঘাত সৃষ্টি করে, যেসব দেশে ফিন্যান্স পুঁজির অবাধ চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। অর্থাৎ যেসব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা ফিন্যান্স পুঁজির নির্বিঘ্ন হস্তক্ষেপে বাধা প্রদান করে। আর সদ্য সংঘাতমুক্ত দেশ বলতে সেসব দেশকেই বোঝায়, সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপে যেখানে তাদের পছন্দমতো সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব সরকার সাধারণত ফিন্যান্স পুঁজির অবাধ চলাচলে বাধা দেয় না। সুইডফান্ড তাদের ঘোষণায় আরও জানায় যে, তামাক, এলকোহল ও অস্ত্রের মতো লাভজনক খাতে তারা বিনিয়োগ আশা করছে।[৭৩] এ বিষয়টি প্রমাণ করছে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে শোষণের ক্ষেত্র ও 'বাজার অঞ্চল' মনে করে। যে পণ্যের বাজার সৃষ্টি হবে সে পণ্যটি সেদেশের কল্যাণে আসলো না অকল্যাণে আসলো এ নিয়ে ফিন্যান্সিয়াল অলিগর্কি মাথা ঘামায় না। সর্বোচ্চ মুনাফাই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ কারণেই মাইকেল প্যারেন্টি বলেছেন, তৃতীয় বিশ্ব হচ্ছে পুঁজিবাদের স্বর্গ।[৭৪]

---

* রাজেন হার্ষে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছেন। *Twentieth Century Imperialism Shifting Contours and Changing Conceptions* গ্রন্থটি তাঁকে আন্তর্জাতিক পরিচিতি এনে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

সুইজারল্যান্ড এ বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অন্যতম বৃহত্তম বাজার এবং ব্যক্তিগত সম্পদ পরিচালনার প্রধান বৈশ্বিক শক্তি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান শক্তিকেন্দ্র হচ্ছে সুইজারল্যান্ড। ১৯৩৪ সালে সুইজারল্যান্ডের ফেডারেল ব্যাংক যে গোপনীয়তা আইন পাশ করে একবিংশ শতাব্দীতেও তাকে ঘিরে নানা প্রশ্নের জন্ম হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, সাম্রাজ্যবাদী যুগে বা পুঁজিবাদের একচেটিয়া পর্বে আর্থিক ব্যবস্থাপনার বাজারটি সর্ববৃহৎ হয়ে ওঠে। ফলে ফটকামূলক প্রবণতাও বৃদ্ধি পায় যা পুরোপুরি পুঁজিবাদের উৎপাদনমুখী চরিত্রের বিপরীত। সত্যিকারার্থে ব্যাংকের বিশেষ ভূমিকার কারণেই ফিন্যান্স পুঁজি ও একচেটিয়া সমাহারের আবির্ভাব ঘটে। সুইস ব্যাংক সাম্প্রতিককালে সারা বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করছে। তাই দেখা গেছে, মহামন্দার সময়েও সুইস ব্যাংককে আর্থিক সংকটে পড়তে হয়নি।

হার্ষে আরো বলতে চেয়েছেন, প্রধান পরাশক্তি হওয়ার পরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পার্শ্ববর্তী ধনী দেশ কানাডা ও মেক্সিকোকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করেনি। এক্ষেত্রে প্রধান যুক্তি হলো বর্তমানে ধনী দেশ হওয়াতে কানাডার শ্রম ও কাঁচামাল সস্তা নয়। অধিক মুনাফার জন্য বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো সস্তা শ্রমের দেশে যায়, ধনী দেশে নয়। কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থানে পৌঁছানোর পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাজার ছিল কানাডা। এবার অপর দেশ মেক্সিকোর প্রসঙ্গে আসা যাক। সাম্রাজ্যবাদীদের পুঁজি রপ্তানির অন্যতম কৌশল হচ্ছে ঋণপ্রদান। আমরা দেখেছি যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বৈদেশিক ঋণ বিশ্বে কিভাবে ঋণসংকট সৃষ্টি করেছিল। সেসময়ে মেক্সিকোই প্রথম তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে ঋণ পরিশোধে তার অক্ষমতার কথা জানায়। এতে যুক্তরাষ্ট্রসহ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো সাময়িকভাবে বিপদে পড়লেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে আইএমএফ মেক্সিকোর মতো দেশগুলোকে নতুন ঋণের চক্রে আবদ্ধ করে এবং দেশটির উপর পুরোপুরি অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

হার্ষের আরেকটি সমালোচনা হলো, লেনিন পর্তুগীজ উপনিবেশবাদের কোনো সন্তোষজনক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারেননি। অবশ্য হার্ষে নিজে তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে এর একটি ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পান। পর্তুগালের অবস্থানকে হার্ষে 'উপ-সাম্রাজ্যবাদ' বলে অভিহিত করতে চান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ তৃতীয় বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আঞ্চলিকভাবে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোকে ব্যবহার করতো। সেসময়ে ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইরান (শাহর আমলে), ভারত, নাইজেরিয়া ও ইন্দোনেশিয়া তাদের স্ব স্ব অঞ্চলে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করতো।[৭৫] এ আঞ্চলিক শক্তিকেন্দ্রগুলোকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ তাদের ক্ষমতা বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করে। এখানে মনে রাখা দরকার, পর্তুগালের উপনিবেশবাদের কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান লেনিনের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি মূলত সেসময়কার পরাশক্তি ব্রিটেনের বিপুল ক্ষমতাবৈভব বোঝানোর জন্য উক্ত দৃষ্টান্তটি দিয়েছিলেন। লেনিন বলতে চেয়েছেন, পরাশক্তিগুলো এমনই ক্ষমতাধর যে, শুধুমাত্র দুর্বল রাষ্ট্র নয়, শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোও তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

হার্ষের আরেকটি বিরোধিতা হলো ঃ লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদকে জোরপূর্বক যুক্ত করতে চেয়েছেন। আমরা জানি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যেকোনো নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও ক্ষমতার লড়াইকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে দায়ী করেন। ইউরোপের ক্ষুদ্র জাতীয় রাষ্ট্রগুলোর একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রভুত্ব বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে। বিশেষত, প্রধান দুই পরাশক্তি জার্মানি ও ব্রিটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে ভূ-খণ্ড দখলের প্রতিযোগিতায় অন্যান্য শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোও নিজেদের জড়িয়ে ফেলে। এক পর্যায়ে, জোটবদ্ধ হয়ে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ অর্থনৈতিক প্রভাব বলয় সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সামরিক প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয়। এসবই ছিল তখনকার ঐতিহাসিক বাস্তবতা । প্রকৃতপক্ষে বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছিলেন।

হার্ষে উল্লেখ করেন, শুমপিটারের তত্ত্ব লেনিনের তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। শুমপিটার সাম্রাজ্যবাদের মূল চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মিশরীয়, পারসীয়, আসিরীয়, ফরাসী ও বিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। চূড়ান্তভাবে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ থেকে আগত নয়, পুঁজিবাদী যুগে পূর্ববর্তী যুগের বৈশিষ্ট্যের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে।[৭৬] শুমপিটার যেভাবে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন তা নিতান্তই খণ্ডিত, সার্বিক চরিত্রের অধিকারী নয়। যুগ বা উৎপাদন কাঠামোর ভিত্তিতে ইতিহাসের ব্যাখ্যা না দিয়ে তিনি বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি সভ্যতার চরিত্র

নিরূপণ করে তার ভিত্তিতে সাধারণ সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করেছেন। মার্ক্সের ইতিহাস বিশ্লেষণের পদ্ধতিটি বরং এর চেয়ে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত। কারণ মার্ক্স সব যুগের সাধারণ সূত্রটি আবিষ্কার করার প্রয়াস পেয়েছেন। লেনিন মার্ক্সীয় ধারাটিই অনুসরণ করেছেন। আমরা ইতোমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে গিয়ে দেখেছি যে, দাসযুগ ও সামন্ত যুগেও সাম্রাজ্যবাদ ছিল। কিন্তু উৎপাদন কাঠামো পুঁজিবাদ থেকে ভিন্নধর্মী হওয়ার কারণে তখনকার সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতিটিও ভিন্ন ছিল। আর পুঁজিবাদী যুগে যে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটে তা পুঁজিবাদী উৎপাদনকাঠামো থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, সামন্ত বা দাস যুগ থেকে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

পুঁজিবাদ তার এ নতুন রূপটি সামন্তযুগ বা দাসযুগের উৎপাদনব্যবস্থা থেকে ধার নেয়নি কিংবা মিশরীয় বা আসিরীয় সভ্যতার কাছ থেকে শেখেনি, বরং নিজের উৎপাদনব্যবস্থার সংকট কাটাতে শোষণের রূপ পাল্টেছে। পুঁজিবাদের প্রতি অনাবশ্যক দুর্বলতার কারণে এ দিকটি শুমপিটারের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। পুঁজিবাদের সূচনালগ্ন থেকে শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্ব কার্যকর ছিল, এ একবিংশ শতাব্দীতে এসে তা আরও ব্যাপকতর হয়েছে। পুঁজির পুঞ্জীভবনের কারণে একদিকে যেমন উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রীভবন হচ্ছে, অপরদিকে কোটি কোটি শ্রমিক শোষণের শিকার হচ্ছে। সেইসঙ্গে মানবতার একটি বৃহৎ অংশ বেকারত্ব ও অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। ইউনেস্কোর রিপোর্ট অনুসারে, এখনও এ বিশ্বের ১.৩ বিলিয়ন মানুষ চরম দারিদ্রের শিকার, একদিনে তাদের এক ডলার অর্থও জুটছে না। এ বিশ্বের ৭৯ শতাংশ সম্পদ রয়েছে মাত্র ১৫ শতাংশের হাতে, বাকি মাত্র ২১ শতাংশ রয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ ৮৫ শতাংশ মানুষের জন্য। বিশ্ব শ্রমিক সংস্থার রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বিশ্বের শ্রমশক্তির ১.২ বিলিয়ন মানুষ বেকারত্বে ভুগছে এবং তাদের ৮০০ মিলিয়ন মানুষই সুযোগ্য কর্মী বা কোনো পেশায় অভিজ্ঞ মানুষ।[৭৭] এ পরিস্থিতি পুঁজির পুঞ্জীভবনের এক চূড়ান্ত অভিব্যক্তি । এটি শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বকে আরও তীক্ষ্ণ করে তুলেছে। সর্বোচ্চ মুনাফার আশায় পুঁজি তার শ্রমিকদের শোষণ তীব্রতর করে তুলছে। এর ফলে বেড়ে চলছে বেকারত্ব ও দারিদ্র। আর এ শোষণ কেন্দ্রের দেশগুলোর তুলনায় প্রান্তের দেশগুলোতে অনেক বেশি। ব্যবসায়িক বিনিময় সম্পর্ক অসম হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো সবসময় অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে থাকে। তাছাড়া প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট উভয় সম্পদই অসম হারে বণ্টন হয় বলে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয়। এর ফলে অন্যায্য ও অসম বিনিময়, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে একচেটিয়া সংস্থাগুলোর ক্ষমতা বিস্তার, পুঁজির অতিরিক্ত শোষণ ও ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি এবং একচেটিয়া

প্রতিষ্ঠানগুলোর বলপূর্বক আগ্রাসন হচ্ছে আজকের দিনের বৈশ্বিক বাস্তবতা। তাই এ অসমতা থেকে ধনী দেশগুলো আরও ধনী হচ্ছে আর দরিদ্র দেশগুলো অধিকমাত্রায় বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। কেন্দ্র ও প্রান্তের এ ক্রমবর্ধমান বৈষম্য থেকে তৃতীয় বিশ্বে জন্ম নিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন। লেনিনের তত্ত্বের স্বার্থকতা এখানেই। তিনি বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী যুগে শোষণ যত বাড়তে থাকবে, সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকবে প্রতিরোধ-আন্দোলন।

উদারপন্থী তাত্ত্বিকদের যুক্তি খণ্ডন

উদারতাবাদ দাবি করে যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বুদ্ধিবৃত্তি কোনো সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয়, সুতরাং শিক্ষা, সম্পদ ও শিল্পের প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে কুসংস্কার, কুপ্রথা ও সংকোচননীতি ধ্বংস হবে। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে উদারপন্থীদের ধারণা অনেকটা জোসেফ শুমপিটারের ধারণার অনুরূপ। তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি অস্বীকার করেন। শুমপিটার সাম্রাজ্যবাদকে রাষ্ট্রের অংশবিশেষে সংঘটিত সীমাহীন বলপূর্বক বিস্তৃতির একটি উদ্দেশ্যবিহীন প্রবণতা মনে করেন।[৭৮] তাঁর মতে, টিকে থাকার মতো অনেক বৈশিষ্ট্যই সাম্রাজ্যবাদের রয়েছে, কারণ মূর্ত সামাজিক পরিস্থিতির প্রতিটি ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। তবে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার দিক থেকে একে পূর্ববর্তী সামাজিক কাঠামোর পুনরাবির্ভাব এবং ব্যক্তিবিশেষের আবেগাত্মক প্রতিক্রিয়ার মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা বলা চলে। শুমপিটারের এই অভিব্যক্তিই সাম্রাজ্যবাদের উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তি। উইন্সলো, আরেন্ডট, কোবনার, ল্যান্ডেস, স্ট্রাচি, ফিল্ডহাউস, কোহেন প্রমুখ উদারপন্থীরা শুমপিটারের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁদের মতে, সাম্রাজ্যবাদকে এক ধরনের রহস্যজনক রাজনৈতিক ঘটনা বলা যায় যা আগ্রাসন ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করে। উইন্সলো[৭৯] একে এমন একটি রাজনৈতিক ঘটনা বলে অভিহিত করেন যেখানে অযৌক্তিকভাবে পুরনো নীতিকে পুনঃনির্বাচন করা হয়। আরেন্ডট[৮০] সাম্রাজ্যবাদকে নিছক সর্বাত্মকবাদ হিসেবে বিবেচনা করেন। কোবনার[৮১] সাম্রাজ্যবাদকে মানব ইতিহাসের মতই প্রাচীন মনে করেন। ল্যান্ডেস[৮২] মনে করেন, সাম্রাজ্যবাদ অস্তিত্বশীল, কারণ ক্ষমতা প্রকৃতির মতো সহজাত বলেই ঘৃণা বা অবজ্ঞার স্থান এখনও রয়ে গেছে। ১৯৭৪ সালে কোহেন[৮৩] দেখান, ক্ষমতার রাজনীতির অতি পুরাতন অথচ উত্তম খেলার মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদ নিহিত আছে। তাঁর মতে, আধিপত্যের যুক্তি প্রত্যক্ষভাবে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় সার্বভৌমত্বের অস্তিত্ব থেকে উৎসারিত হয়। অপরদিকে, স্ট্রাচির দৃষ্টিতে, দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের পরে ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে থাকা জাতিগুলোর স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়েই সাম্রাজ্যবাদের পরিসমাপ্তি ঘটে।[৮৪]

প্রথমেই শুমপিটারের সংজ্ঞাটি মূল্যায়ন করে দেখা যাক। হার্ব এ্যাডো তাঁর *Imperialism: the Permanent Stage of Capitalism* গ্রন্থে এ সংজ্ঞাটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে যাচাই করে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, সীমাহীন শব্দটি সংযুক্ত করার ফলে এ সংজ্ঞায় সাম্রাজ্যবাদের ধারণা প্রকাশে অপর তিনটি শব্দ 'প্রধান' বলে প্রতীয়মান হয়। এ শব্দ তিনটি হচ্ছে উদ্দেশ্যবিহীন, রাষ্ট্র ও বলপূর্বক। এ্যাডো বলেন, এ সংজ্ঞাটির প্রথম সমস্যা হচ্ছে আমরা 'সীমাহীন' শব্দটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবো। অর্থাৎ 'সীমাহীন বিস্তৃতি' কীভাবে সীমাহীন ? 'উদ্দেশ্যবিহীন' শব্দটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তিতে হয়তো 'সীমাহীন' শব্দটিকে বোঝা যেতে পারে। কিন্তু যেকোনো রাষ্ট্রের বিস্তৃতির একটা সীমা থাকা চাই। এক্ষেত্রে তিনি হয়তো 'সীমাহীন' বলতে 'উঁচু সামাজিক মর্যাদার দাবি' বা 'আত্মাভিমান'কে বুঝিয়েছেন। অপরদিকে, রাষ্ট্র শব্দটির ব্যবহারে আরেক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, রাষ্ট্রকে সবসময় জগৎ ও জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায় না। আধুনিক দৃষ্টিতে, রাষ্ট্র প্রত্যয়টিকে যাচাই করলে এ ধারণাটি সংশয়পূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন মনে হয়, শুধুমাত্র আধুনিক রাষ্ট্রই তার উদ্দেশ্যবিহীন বিস্তৃতিতে পরিব্যাপ্ত। আর যদি 'রাষ্ট্র' শব্দটিকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ভিত্তিতে যাচাই করি, তাহলে সাম্রাজ্যবাদ কালাতীত হয়ে পড়ে। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, সাম্রাজ্যবাদ 'পুঁজিবাদী' বলে প্রমাণিত হয়। কারণ রাষ্ট্রকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করলে এটি পুঁজিবাদী বিকাশের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, সাম্রাজ্যবাদকে অন্যান্য বিষয় থেকে পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে এ ধারণাটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে 'অস্পষ্ট' হয়ে ওঠে। একইভাবে শুমপিটার ব্যবহৃত 'বলপূর্বক' শব্দটিও সমস্যাপূর্ণ হয়ে পড়ে। এ শব্দটি 'যুদ্ধ'কে নির্দেশ করে। রাষ্ট্রবিস্তারের প্রবর্তন ও রক্ষা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকছে না। সুতরাং শুমপিটারের সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত ধারণাটি দাঁড়াচ্ছে এরকম: একটি রাষ্ট্রের বিস্তার প্রয়োজন। এ বিস্তার সীমিত পরিসরে হতে পারে এবং এর পেছনে অবশ্যই কোনো উদ্দেশ্য থাকবে। কিন্তু যুদ্ধ ছাড়া এসব উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয় এবং সাম্রাজ্যবাদকে বোঝাও সম্ভব নয়।[৮৫] এরকম একটি মতকে কখনোই সমর্থন করা যায় না।

এ্যাডো আরো উল্লেখ করেন যে, শুমপিটারের ব্যাখ্যায় বেশকিছু অন্তর্নিহিত দুর্বোধ্যতা ছিল। শুমপিটার ইতিহাসের যে উদ্দেশ্যবিহীন বিস্তারের কথা বলেছেন তাতে সাম্রাজ্যবাদকে ব্যাখ্যা করতে ইতিহাসের স্থায়ী উন্মাদনাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। শুমপিটারের আরেকটি বড় দুর্বোধ্যতা হলো, তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, পুঁজিবাদী যুগে কেন সাম্রাজ্যবাদ দেখা দিল? কারণ তাঁর মতে, সাম্রাজ্যবাদ অযৌক্তিক বলে এটি পুঁজিবাদী যুক্তিশীলতার বিপরীত। আবার এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই বলেছেন 'সবসময়ই মৃতরা জীবিতদের শাসন করে।'[৮৬] তিনি সাম্রাজ্যবাদের যে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা পরবর্তীতে উদারপন্থীদের তত্ত্বের ভিত্তি নির্মাণ করেছে। আমরা ইতোমধ্যেই উদারপন্থীদের মতামত আলোচনা করেছি। শুমপিটারের দুর্বোধ্য ও সংশয়াত্মক দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন্দ্র করে তাঁদের যে বিশ্লেষণ আমরা লক্ষ্য করেছি তাতে অধিকমাত্রায় বিমূর্তকরণের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তাঁদের অভিমত সম্পর্কে ম্যাগডফের[*] বিশ্লেষণটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি মনে করেন, উদারপন্থীরা আগ্রাসন ও বিস্তারের প্রকারভেদ ও এর উদ্দেশ্যের ঐতিহাসিক পার্থক্য সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রদান করতে পারেননি। এ সম্পর্কে এ্যাডোর মন্তব্য হলো: তাঁরা ঐতিহাসিক অনুমানের অসচেতন আংশিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। আধুনিক যুদ্ধকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদারপন্থীরা শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইকে গুরুত্ব দিতে অনীহা প্রকাশ করেন। তাই খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দ্রচত কোনো পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত পৌঁছে তাঁরা যুদ্ধ সম্পর্কে এক ধরনের অযৌক্তিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।[৮৭] যুদ্ধকে তারা পুরাতন রীতি বলে অভিহিত করে সময়ের সাথে এর অবলুপ্তির কথাও বলেন। তাই তারা রাষ্ট্রের যুদ্ধপ্রীতির উপাদানের সঙ্গে যুক্ত করে সাম্রাজ্যবাদের ব্যাখ্যা দেন এবং আধুনিক রাষ্ট্রে এটি অনুপস্থিত বলে দাবি করেন। এ কারণে সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে উদারপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই স্থূল বলে প্রতিপন্ন হয়। এ্যাডোর মতে, অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে পরিচালিত রাষ্ট্র বিস্তারের প্রাচীন, আজকের যুগের ও অন্য যেকোনো সময়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান তা তাঁরা তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন।[৮৮] উদারপন্থীদের এ ধরনের বিভ্রান্তি আলোচনা করতে গেলে আমরা বেঞ্জামিন কোহেনের দৃষ্টান্ত দিতে পারি।

---

* হ্যারি ম্যাগডফ (১৯১৩-২০০৬) একজন স্বনামধন্য মার্কিন সমাজতান্ত্রিক ভাষ্যকার ছিলেন। প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের সময়ে তিনি নানা প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মার্কসবাদী পত্রিকা *মান্থলী রিভিয়্যু*-এর সহ-সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

কোহেন 'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটিকে মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীর 'উপনিবেশবাদের' সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন। তিনি দূরবর্তী রাষ্ট্রগুলোতে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের বিস্তারের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদকে সীমিত করেন। তাঁর মতে, এ কাজটি প্রথমদিকে পর্তুগীজ ও স্পেনীয়দের দ্বারা, এরপরে ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের মাধ্যমে ও সবশেষে আমেরিকান ও জাপানিদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু এক শতাব্দী পর পুঁজিবাদের সমালোচকরা একে জোরপূর্বক স্বাভাবিক রাজনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তে অর্থনৈতিক শক্তি ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করেন। এতে সরল উপনিবেশবাদ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও বাজারের আধিপত্য, যোগানের উৎস ও বিনিয়োগ সুবিধার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে জটিল রূপলাভ করে।[৮৯] এখানে লক্ষ্যণীয় যে, তিনি উপনিবেশবাদ ও নব্য-উপনিবেশবাদের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেননি এবং পরোক্ষভাবে নব্য-উপনিবেশবাদকে অস্বীকার করেন। অর্থাৎ উপনিবেশবাদী যুগের পরে সাম্রাজ্যবাদের যে নতুন চরিত্র হবসন, লুক্সেমবার্গ, হিলফার্ডিং ও লেনিনের তত্ত্বে স্থান পেয়েছে তা কোহেনের বিশ্লেষণে স্বীকৃতি পায়নি। তিনি সাম্রাজ্যবাদকে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন, এর সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থের কোনো যোগসূত্র তিনি খুঁজে পাননি। অর্থাৎ, তাঁর তত্ত্বে একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা উপেক্ষিত হয়েছে।

উদারপন্থীদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনায় 'কেন' প্রশ্নটির উত্তরানুসন্ধান এড়িয়ে যেতে চান। তাঁরা কেবলমাত্র বলতে চান, কবে কোন দেশ কোন দেশের ওপর রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করেছিল। কিন্তু কেন এই রাজনৈতিক আধিপত্য? এ বিষয়ের আলোচনা তাদের তত্ত্বে স্থান পায় না। কারণ 'কেন' এর উত্তর দিলে অর্থনৈতিক স্বার্থের বিষয়টি অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়বে। এ বিষয়টি তাঁরা সুকৌশলে তাঁদের তত্ত্ব থেকে বাদ দিতে চান। তাই বৈশ্বিক পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যাপক লুণ্ঠন ক্রিয়ার ঐতিহাসিক সত্যটি তাদের তত্ত্বে অনুপস্থিত থাকে। আবার অনেকে যুদ্ধের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদকে সম্পৃক্ত করে এর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো উপেক্ষা করেন। তবে তাঁদের এ ধরনের একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গিও ঐতিহাসিকভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যেমন, স্ট্রাচি বলেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটেছে। কিন্তু ষাটের দশকে আমরা ভিয়েতনাম যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখেছি। পরবর্তীকালে নেগ্রি ও হার্ট [৯০] (২০০০) বলেন, ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটেছে। এরপরে আমরা আফগানিস্তান, ইরাক ও লিবিয়া যুদ্ধের বিভীষিকা দেখেছি। সুতরাং,

উদারপন্থীদের যুক্তি খণ্ডনের জন্য কোনো তাত্ত্বিক যুক্তিরও প্রয়োজন পড়ে না, স্বয়ং ইতিহাসই তাঁদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

উদারপন্থীরা যুক্তি দেন, জাতিগুলো সহজাতভাবেই অসম। তাই আন্তর্জাতিক অসমতা জীবনের একটি অপরিহার্য দিক। এ কারণে কিছু জাতির ওপর অপরাপর জাতিগুলোর অধীনতা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে আধিপত্য ও নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদ এ বিশেষ সম্পর্কেরই নির্দেশক। অসম জাতিগুলোর সহজাতভাবেই ফলপ্রসূ দমন প্রয়োজন। উদারপন্থীদের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনায় এ্যাডো বলেন, সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাদের এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণাত্মকভাবে অস্পষ্ট এবং এর সপক্ষে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি-প্রমাণ নেই। সুতরাং তা ঐতিহাসিকভাবেও অস্পষ্ট।[৯১] অপরদিকে, সাম্রাজ্যবাদকে নৈতিকভাবে নিরপেক্ষ ও বিশ্লেষণাত্মকভাবে সুস্পষ্ট করার যে দাবি কোহেন করেছিলেন, এটি সম্পূর্ণ তার বিপরীত। আগেই বলা হয়েছে, উদারপন্থীরা সবসময় ‘কেন’ এর উত্তর এড়িয়ে যান। এ কারণে তারা অসমতাকে স্বাভাবিক বলেছেন, অসমতার কারণ নির্ণয়ে ব্রতী হননি। কিন্তু জাতিগুলোর অসমতার কারণও এই সাম্রাজ্যবাদ, এ বিষয়টি তারা গোপন করার চেষ্টা করেন। সাম্রাজ্যবাদই তার শোষণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অসমতা সৃষ্টি করে জাতিসমূহের মধ্যে ‘উন্নত’ ও ‘অনুন্নত’ বিভাজন তৈরি করেছে। আর আজকের অনুন্নত দেশগুলোর পশ্চাৎপদতা ও অনুন্নয়নের ঐতিহাসিক উৎস হচ্ছে ঔপনিবেশিক শোষণ ও সম্পদ পাচার। এর মধ্য দিয়েই বর্তমান শিল্পোন্নত দেশগুলোতে পুঁজির পুঞ্জীভবন সম্ভব হয়েছে। অপরদিকে, একই কারণে উপনিবেশগুলোতে পুঁজি পুঞ্জীভবনের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়েছে।[৯২] উদারপন্থীরা এই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে পক্ষপাতদুষ্টভাবে তাদের তত্ত্ব প্রবর্তন করেন।

কোহেন তাঁর তত্ত্বে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ প্রকৃতপক্ষে বিশেষ কিছু সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা করে। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক অসমতার অস্তিত্বকে অগ্রাধিকার দিয়েই সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংগঠনের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের আনুষ্ঠানিক বিস্তারের মাধ্যমে হতে পারে। আবার পরোক্ষভাবে অনানুষ্ঠানিক কূটনৈতিক বা সামরিক চাপ প্রদান অথবা অর্থনৈতিক আধিপত্যের মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এসব নিয়ন্ত্রণের পেছনে অনেক কারণই থাকতে

পারে। রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা বা প্রভাব বিস্তার করা বা কৌশলগত ঔপনিবেশিক নীতির বাস্তবায়নে সাম্রাজ্যবাদীরা নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সাম্রাজ্যবাদ সব রকমের দমননীতি বা কৌশল আরোপ করতে পারে। কোহেন একেই 'ফলপ্রসূ নিয়ন্ত্রণ বা আধিপত্য' বলেছেন। এ ফলপ্রসূ নিয়ন্ত্রণ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেকোনোভাবেই হোক তা এক জাতির ওপর অন্য জাতির আধিপত্যকে নির্দেশ করে। কোহেনের যুক্তিটি তাহলে এরকম দাঁড়াচ্ছে : "বিভিন্ন ধরনের বিকল্প কৌশল ও শক্তি প্রয়োগ গুরুত্বহীন একথা কখনোই বিবেচ্য হতে পারে না... এখানে সুস্পষ্ট সমস্যা হচ্ছে এই: কোন কৌশলটি অধিক ফলপ্রসূ তা নির্ধারণ করা, কোন কৌশলগুলো অধিক সম্ভাবনাময় এবং বাস্তবিকপক্ষে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি রকম হতে পরে।[৯৩]

এ যুক্তি থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়, কোহেন কতটা নগ্নভাবে ক্ষমতার রাজনীতিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি নৈতিকতার ধার ধারেননি, বরং ম্যাকিয়াভেলীর[*১ ও ৯৪] মতোই শাসকের কূটচালকে বৈধতা দিয়েছেন। তিনি তাঁর দাবিমতো যদি নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিতেন তাহলে নিয়ন্ত্রণ বা আধিপত্যকে যুক্তিসিদ্ধ না করে তার অবসান কামনা করতেন। মানুষ যখন বিবেকজনিত সঙ্কোচকে উপেক্ষা করে নিজ স্বার্থকে একমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসেবে ধরে নেয়, তখন প্রতিপক্ষের কি পরিণতি হতে পারে তা তারা বিবেচনায় আনে না। কোহেন একইভাবে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থকে একমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করায় অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদেরকে যেকোনো বলপূর্বক কৌশল অবলম্বনের সুপারিশ করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে, এ ধরনের কার্যক্রমের কোনো নৈতিক ভিত্তি থাকে না। একমাত্র নিটশের[*২ ও ৯৫] দর্শনেই এ ধরনের 'নগ্ন ক্ষমতা'র সমর্থন রয়েছে। তিনি মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন। এক শ্রেণীর মানুষ উদ্ধত বা কর্তৃত্বপরায়ণ, অপর শ্রেণীর মানুষ এর বিপরীত প্রকৃতির।

---

*১ ম্যাকিয়াভেলী (১৪৬৯-১৫২৭) ছিলেন নবজাগরণের যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ। অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি ও ইতিহাসকে অবলম্বন করে তিনি রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করে গেছেন। জাতীয়তাবাদী ম্যাকিয়াভেলী নীতিশাস্ত্রকে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে চাননি। তিনি মনে করতেন, স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনে শাসককে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে হবে। শঠতার আশ্রয় নেয়াকে তিনি বিচক্ষণতার পরিচায়ক বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ দুষ্টের দমনের জন্য শাসককে নিষ্ঠুরতা ও ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। এর মধ্যে তিনি অন্যায় বা অবিচারের কিছু দেখেননি।

*২ জার্মান দার্শনিক ফ্রেডারিক নিটশে (১৮৪৪-১৯০০) হেগেলোত্তর কালের অন্যতম প্রভাবশালী চিন্তাবিদ। প্রচলিত মতের বিরোধী নিটশের চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য দিক হলো সত্য ও ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কিত মতবাদ, নৈতিকতা সম্পর্কিত মতবাদ ও অতিমানবের ধারণা। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো হচ্ছে *Beyond Good and Evil, The Anarchist* প্রভৃতি।

উদ্ধত বা কর্তৃত্বপরায়ণ মানুষকে তিনি মানসিক ও সামাজিকভাবে সফল মনে করেন। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপরতার জন্য তারা অপরাপর মানুষ থেকে আলাদা। অপরদিকে, অ-উদ্ধত মানুষ তাদের শাসকের কাছে আত্মসমর্পণ করে। যথাযথ পন্থায় ক্ষমতা অর্জনের কোনো 'উপায়' তাদের জানা নেই।[৯৬] অর্থাৎ নিটশে কিছু নির্দিষ্টসংখ্যক মানুষ (উদ্ধত) ছাড়া আর সকলকেই 'উপায়' হিসেবে দেখেছিলেন। একইভাবে, কোহেন সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলো ছাড়া অন্যসব জাতিকে 'উপায়' হিসেবেই গণ্য করেছেন। এজন্যই তাদের ওপর যেকোনো অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক বা সামরিক চাপপ্রদানকে যৌক্তিক মনে করেছিলেন। পূর্ববর্তী যুগে যেভাবে দাস-প্রথাকে অপরিহার্য মনে করা হতো, কোহেনও সেভাবেই 'অসমতা'কে সহজাত মনে করেছেন। তাই নিটশের দর্শনে যেমন এক ধরনের 'প্রভু-দাস নৈতিকতা' পরিলক্ষিত হয়েছে, কোহেনও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীলতা ও আধিপত্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে জাতিগুলোর মধ্যে উচ্চস্তর ও নিম্নস্তরের বিভাজন টেনে আনেন। এ ধরনের নিটশীয় বৈষম্যবাদ সম্পর্কে রাসেলের[*১] মন্তব্য হচ্ছে: "নিটশীয় তত্ত্ব স্বপ্নের মতো, কিন্তু অনুশীলনের দিক থেকে এটা অনেকটা দুঃস্বপ্নের মতো"।[৯৭]

বিশ্বায়ন পর্বে এসে, উদারপন্থী তাত্ত্বিকরা 'সাম্রাজ্যবাদ'কে বৈধতা দিতে 'নব্য-উদারতাবাদ'[*২] তত্ত্বের অবতারণা করেন। ১৯৩০ এর দশকে ওয়াল্টার লিপম্যান ২৫ জন উদারপন্থীকে নিয়ে *কলোকুঈম* নামে সংগঠিতভাবে একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলেন, এদের মধ্যে লুইস রজিয়ার, ওয়াল্টার লিপম্যান, ফ্রেডারিক হায়েক, লুডভিগ ভন মাইসেস, উইলহেম রোপকে এবং আলেকজান্ডার রাস্টো প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক সভায় তারা আনুষ্ঠানিকভাবে চিরায়ত উদারতাবাদের সমাপ্তি ঘটিয়ে নব্য-উদারতাবাদের গোড়াপত্তন করেন। পরবর্তীতে মিল্টন ফ্রিডম্যানের নেতৃত্বে শিকাগো অর্থনীতি স্কুল নতুনভাবে নব্য-উদারতাবাদকে ব্যাখ্যা করে। এ স্কুলের তাত্ত্বিকরা সরকারী হস্তক্ষেপহীন নিয়ন্ত্রণমুক্ত বাজারব্যবস্থার সুপারিশ করেন। অর্থাৎ নব্য-উদারতাবাদ অর্থনীতির

---

*১ বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) ছিলেন আধুনিক ব্রিটিশ দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। রাসেল তাঁর প্রথম জীবনে বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক চিন্তায় ব্যাপৃত থাকলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলির ওপর গুরুত্ব দেন। নোবেল বিজয়ী রাসেল একাধারে বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, নীতিবিদ্যা ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণা ছাড়াও যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

*২ নব্য-উদারতাবাদ বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক উদারীকরণ, মুক্ত বাণিজ্য এবং উন্মুক্ত বাজার, ব্যক্তিমালিকানাধীন নিয়ন্ত্রণহীনতা এবং আধুনিক সমাজে ব্যক্তিগত খাতের ভূমিকা বৃদ্ধি। আজকের দিনে এ শব্দটি ব্যক্তিগত খাতে নিয়ন্ত্রণহীন ও বর্ধিত ভূমিকার সাধারণ নীতিমালার বিরোধিতা করতে গিয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রীয় খাত থেকে ব্যক্তিগত খাতে স্থানান্তরের পরামর্শ দেয়। তাঁরা যুক্তি দেয়, এ উদ্যোগের ফলে অধিক দক্ষ সরকার গঠিত হবে এবং জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে।[৯৮] ফিন্যান্স পুঁজির নীতি হিসেবে নব্য-উদারতাবাদ ওয়াশিংটনভিত্তিক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের অধীনে কিছু ব্যবহারিক নীতিমালা প্রদান করে। জন উইলিয়ামসনের* [৯৯] 'ওয়াশিংটন ঐকমত্যে' এই দর্শনেরই প্রতিফলন ঘটেছে। এ ধরনের অর্থনৈতিক নীতিমালা তৃতীয় বিশ্বের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনে না। বরং উন্নত দেশগুলো তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করে নেয়। ওয়াশিংটন কনসেনসাসের প্রথম নীতিতে ঘাটতি পূরণের জন্য জনসাধারণের ওপর কর চাপানোর সুপারিশ করা হয়েছে। এতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান আরো নেমে যায় এবং দারিদ্র বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এ বাণিজ্য ঘাটতির কারণ হচ্ছে অসম বাজারব্যবস্থা। দ্বিতীয় নীতিতে প্রবৃদ্ধি সহায়ক খাতে ব্যয়ের যে পরামর্শ দেয়া হয়েছে তা মূলত দেশের ধনাঢ্য শ্রেণীর হাতে পৌঁছায়। দরিদ্র কৃষকের ভর্তুকি প্রদানের পরিবর্তে পুঁজিবাদ সবসময় বাজার দখলের জন্য ধনী ব্যবসায়ীদের পেছনে খরচে আগ্রহী। তৃতীয় শর্তে কর বাড়ানোর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তাতেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপকারসাধিত হয় না, বরং নিজেদের ব্যয়নির্বাহও তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। দরিদ্র দেশগুলোকে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও ধনী দেশগুলো যে ঋণপ্রদান করে তাদের তা অত্যন্ত চড়া সুদে পরিশোধ করতে হয়, এতে সেদেশের জনগণের ভোগান্তি আরও বেড়ে যায়। চতুর্থ শর্তে এই সুদকেই বৈধতা দেয়া হয়েছে। নব্য-উদারতাবাদ একদিকে প্রবৃদ্ধির কথা বলে, অপরদিকে মুদ্রাকে ভাসমান রাখার পরামর্শ দেয়। কিন্তু মুদ্রার এ ভাসমানতা একটি দেশের অর্থনীতিতে সুফল বয়ে আনে না তার প্রমাণ হচ্ছে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো। মেল্ট-ডাউনের শিকার হওয়ায় তাদের দ্রচত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশগুলো চরম সংকটে পড়েছিল। বাণিজ্য উদারীকরণের নামে বস্তুত উন্নত দেশগুলো শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা লাভ করে। পক্ষান্তরে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ওপর ইচ্ছেমতো বাণিজ্য শর্ত আরোপ করে। পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের কারণে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে না পেরে বাধ্য হয়ে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে অসম বাণিজ্যে লিপ্ত হতে হয়। বাণিজ্যিক পুঁজির হিসাব উদারীকরণের ফলে

---

* উইলিয়ামসন দশ দফার একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। এ তালিকায় তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতির জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশনা রয়েছে। যেসব বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয় তা হচ্ছে: সরকারী রাজস্বনীতি, জনগণের খরচ নির্বাহ, কর সংস্কার, সুদের হার, মুদ্রা ব্যবস্থা, বাণিজ্য উদারীকরণ, বাণিজ্যিক পুঁজির হিসাব উদারীকরণ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তি মালিকানাকরণ, বাজারব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার আইনসঙ্গত স্বীকৃতি। বলাই বাহুল্য যে, এ সমস্ত নীতিমালা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ধনিক কল্যাণে নিবেদিত, গণমানুষের উন্নয়নের কোনো পরামর্শ এখানে নেই।

বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো একদিকে যেমন সহজে বহির্বিশ্বে বাণিজ্যিক সুবিধা পেয়ে থাকে, অন্যদিকে নিজের দেশেও কর ফাঁকির সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে। আর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় বিশ্বে এক ধরনের লুম্পেন বুর্জোয়া গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়। নিজেরা তেমন কোনো শিল্পোৎপাদনে জড়িত না হলেও তারা বিদেশী পণ্য বাজারজাতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর ফলে দেশও শিল্পক্ষেত্রে এগিয়ে যায় না, উপরন্তু বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত হয়। নিয়ন্ত্রণমুক্ত বাজার প্রকৃতপক্ষে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোকে জাতিসংঘের সমতুল্য মর্যাদা দিয়েছে। 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের' যে যুক্তি দেখিয়ে পুঁজিবাদের গোড়াপত্তন ঘটেছিল নব্য-উদারতাবাদেও সেই নীতি অক্ষুণ্ন রয়েছে। এ অধিকার মূলত ব্যক্তিবিশেষের অর্থাৎ শক্তিশালীদের অধিকার।

এবার এসব নীতিমালা বাস্তবায়নের বাস্তব দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। লাতিন আমেরিকার ছয়টি দেশ আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, চিলি, মেক্সিকো, পেরু ও উরুগুয়েতে নব্য-উদারতাবাদের নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল। আলেজান্দ্রো পোর্টেস ও ব্রায়ান রবার্টস এ ছয়টি দেশে নব্য-উদারতাবাদ প্রবর্তনের পরে নগরজীবনে কি পরিবর্তন আসে এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা গেছে, নব্য-উদারতাবাদ নীতি প্রবর্তনের ফলে অসমতা ও দারিদ্র বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছয়টি দেশেই অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়ার পরেও 'উচ্চ শ্রেণীটি' নব্য-উদারতাবাদ ব্যবস্থার সুফল ভোগ করেছে। পোর্টেস ও রবার্টস লক্ষ্য করেন, স্বল্পসংখ্যক বিত্তবান শ্রেণীটির গড় আয় সমগ্র লাতিন আমেরিকার দারিদ্র সীমায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর গড় আয়ের ১৪ গুণ বেশি। তাঁরা মনে করেন, আয়ের এ বৈষম্যের প্রত্যক্ষ ফলাফল হচ্ছে ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতা।[১০০] সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, নব্য-উদারতাবাদ বৈষয়িক অগ্রগতি এনে দিলেও বৈষম্য বেড়ে গেছে বণ্টনব্যবস্থার ত্রূটির কারণে। বণ্টনব্যবস্থায় সমতা না আসলে বৈষম্য ক্রমশ বেড়েই চলবে। অতএব নব্য-উদারতাবাদ আমাদের একটা বৈষম্যমূলক সমাজ উপহার দিচ্ছে বলে একে কোনোক্রমেই নৈতিকভাবে সমর্থন করা যায় না। তাই শিল্প, প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে পুঁজিবাদ অভূতপূর্ব আবিষ্কার করলেও সবই শেষ পর্যন্ত পুঁজির অধীন পণ্যে পরিণত হয়েছে। মানুষ এখানে পুঁজির অধীন, একমাত্র পুঁজিই স্বাধীন। অবাধ বাণিজ্যের স্বাধীনতাই পুঁজিবাদ তথা নব্য-উদারতাবাদের একমাত্র স্বাধীনতা। অবাধ বাণিজ্য আর অবাধ প্রতিযোগিতা মানুষকে করেছে আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক। তাই নব্য-উদারতাবাদ তৈরি করেছে অপরাধপ্রবণ সমাজ আর ত্রূটিপূর্ণ মানব-প্রকৃতি।

নব্য-উদারতাবাদ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু প্রবণতা সৃষ্টি করতে চায় যাতে একচেটিয়া কারবারগুলো সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে পারে। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ বিশ্বের বৃহৎসংখ্যক মানবগোষ্ঠীর ধ্বংসসাধন (দারিদ্র, বেকারত্ব, অপরাধপ্রবণতার বৃদ্ধি), কাঁচামালের লুণ্ঠন, শ্রমশক্তির শোষণ বৃদ্ধি, ফিন্যান্স পুঁজির জন্য বৈদেশিক বাজার বিস্তারলাভ, বৈদেশিক ঋণবৃদ্ধি, প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ও ফটকামূলক প্রবণতার ব্যাপক বিস্তার প্রভৃতি। সুতরাং, নব্য-উদারতাবাদ হচ্ছে ফিন্যান্স পুঁজির অর্থনৈতিক নীতি। একচেটিয়া পুঁজিবাদের অধীনে বর্তমানে তা প্রকাশিত হচ্ছে। বিশ্বের সব দেশে নব্য-উদারতাবাদী নীতি সমানভাবে প্রয়োগ করা না হলেও এটি একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক নীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। নব্য-উদারতাবাদ প্রতিনিয়ত নতুন আঙ্গিকে নীতি প্রণয়ন করছে এবং কার্যোপযোগী শর্তগুলোকে সহজ করছে, সেইসঙ্গে বাধা দিচ্ছে সমষ্টিগত উদ্যোগ গ্রহণে, ধর্মঘটের অধিকারকে এবং ঐক্য ও সংহতিকে।[১০১] দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, নব্য-উদারতাবাদের পীঠস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৬টি অঙ্গরাজ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অনুমতি নেই। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তিমালিকানাধীন করাও নব্য-উদারতাবাদের কল্যাণে বেড়েই চলেছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যক্তিমালিকানাধীন করা মানে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের এমন একটি উপবিভাগে পরিণত করা যা বৈশ্বিক পর্যায়ে ফিন্যান্স পুঁজির বিনিয়োগ সম্ভাবনার বিস্তার ঘটাবে। এতে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাত ফিন্যান্স পুঁজির অধীনে চলে আসে। যেমন, শেল ও ইউনোক্যালের মতো আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির চাপে পড়ে বাংলাদেশ ১৯৯৪ সালে ৬টি উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তি এবং ১৯৯৬ সালে একই ধরনের আরও চারটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এর ফলে ইজারাপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির জন্য বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদের অবারিত লুণ্ঠনের পথ খুলে যায়। এছাড়া নব্য-উদারতাবাদ যে মুক্ত বাজার ও ব্যক্তি মালিকানাকরণের প্রস্তাব দেয়, তা বাস্তবায়নের নতুন কর্মসূচী হিসেবে এনজিওর কার্যক্রমকে বেছে নিয়েছে। তারা সাধারণত প্রচার করে থাকে যে, এনজিওগুলো সমাজকল্যাণে জাতীয় সরকার অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচীর প্রবর্তনে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো জনসেবা কার্যক্রম চালু করে। তাদের এ কর্মকাণ্ডের ফলে সরকারের স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় প্রচণ্ডভাবে হ্রাস পায় এবং বৈদেশিক সাহায্যের উৎসগুলোও রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্য খাতে সরকারী খরচ কমে আসার ফলে জনস্বাস্থ্য খাতটি এনজিওর হাতে চলে যায়। এতে আঞ্চলিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খণ্ডিত হয়ে পড়ে, স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে দেশীয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে যায়

এবং এনজিও কর্মী ও সাধারণ ব্যক্তিমানুষদের মধ্যে বিভাজন থেকে আঞ্চলিক ও সামাজিক অসমতা সৃষ্টি হয়।[১০২]

এতসব নেতিবাচক ফলাফলের পরেও নব্য-উদারতাবাদীরা নিজ মতের সমর্থনে বেশকিছু যুক্তি উপস্থাপন করেন। যেমন, ফ্রিডম্যান তাঁর *Capitalism and Freedom* গ্রন্থে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সপক্ষে যুক্তি প্রদান করেন। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ সবসময়ই রাজনৈতিক বলপ্রয়োগের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকে। তাঁর দৃষ্টিতে, অনিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতির লেন-দেন ব্যবস্থার মধ্যেই স্বাধীনতা ও বৃহত্তর সংহতি নিহিত। কারণ বাজার অর্থনীতি ক্ষমতাধর রাজনৈতিক নেতাদের জন্য মৌলিক হুমকি এবং এটি দমনমূলক ক্ষমতাকে দূরীভূত করে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ অপসারণ করে অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে পৃথক করা হয় এবং এতে একে অন্যের সঙ্গে ভারসাম্য স্থাপন করতে পারে। ফ্রিডম্যান মনে করেন, প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদ সংখ্যালঘুদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি উৎপাদনশীলতার সঙ্গে অসম্পৃক্ত কোনো যুক্তির ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বৈষম্য থেকে তাদের সুরক্ষা করে।[১০৩] বাস্তবিকপক্ষে, ফ্রিডম্যান কথিত বাজার অর্থনীতির স্বাধীনতা হয়ে ওঠে একটি দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার জন্য হুমকিস্বরূপ। এ স্বাধীনতা কেবল কর্পোরেট বিশ্বের স্বাধীনতা। নব্য-উদারতাবাদী ছকে একটি দেশের আইন সাধারণত প্রণীত হয় বৃহৎ কর্পোরেশনের স্বার্থে। বৃহৎ কর্পোরেশনগুলো অধিকতর ধনী হওয়ায় আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে অধিকতর রাষ্ট্রীয় সুবিধা ভোগ করে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের স্বাভাবিক বিকাশে বাধা প্রদান করে। আন্তর্জাতিক পরিসরেও তারা নব্য-সাম্রাজ্যবাদের সকল সুবিধা ভোগ করে। কোনো দেশ যদি তাদের ব্যবসার জন্য প্রতিকূল হয়, তবে তারা ক্রমশ সেদেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে তাদের স্বার্থে আইন প্রণয়নের জন্য। সুতরাং অপর নব্য-উদারতাবাদী ফ্রেডারিক হায়েক যে নব্য-উদারতাবাদকে আইনের শাসনের কেন্দ্র মনে করেছেন, সেই আইন প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর স্বার্থে প্রণীত হয়ে থাকে। কর্পোরেশনগুলো যেমন নিজ দেশের আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখে, তেমনিভাবে বহির্বিশ্বেও নিজেদের সুবিধামতো আইন প্রণয়নে সেদেশের আইনপ্রণেতাদের ব্যবহার করে। সম্প্রতি আমরা ভারতে দেখেছি যে, ভারতের বাজার উন্মুক্ত করা এবং পণ্যের বিক্রি ও ব্যবসার সম্ভাবনা বাড়ানোসহ সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে মার্কিন কংগ্রেসকে দিয়ে তদবির করিয়েছে মার্কিন কিছু প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান বোয়িং, টিএন্ডটি, স্টারবাকস, লকহিড মার্টিন,এলি লিলি এবং জি ই। এছাড়া স্পেকট্রাম

Dhaka University Institutional Repository

লাইসেন্স পেতে কোয়ালকম এবং অগ্রাধিকার বাজার সুবিধা পেতে এলকাটেল-লুসেন্ট তদবির চালিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের তদবির সংক্রান্ত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে যে, প্রচডেনশিয়াল ফাইন্যান্সিয়াল তদবির কাজে ৬০ লাখ ডলার ব্যয় করেছে। মর্গান স্ট্যানলি ব্যয় করেছে ২০ লাখ ডলার। এছাড়া ডেল ২০ লাখ ডলার, এইচপি ১৫ লাখ ডলার এবং কারগিল ১০ লাখ ডলার ব্যয় করেছে। এসব তদবির ব্যয়ের বড় অংশই ছিল ভারতের বাজারে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য।[১০৪] বাজার দখলের জন্য এ অবৈধ ঘুষদান প্রক্রিয়া কখনোই 'স্বাধীনতা'র পরিচয় নয়। বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে শোষণ করে গুটিকয়েক বিত্তবানদের অধিক মুনাফা আদায়ের জন্যই এই 'বাজার সুবিধার স্বাধীনতা'। এখানে অধিকসংখ্যক মানুষকে 'উপায়' হিসেবে ব্যবহার করে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের 'উদ্দেশ্যসিদ্ধি' হয়ে থাকে। হায়েক এ দিকটি অত্যন্ত খোলামেলা ও নগ্নভাবেই স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিছক মানবজীবনের একটি খাতেরই নিয়ন্ত্রণ নয় যা অন্যসব কিছু থেকে পৃথক, এটা আমাদের সব ধরনের 'অভীষ্টলাভের' 'উপায়'কে নিয়ন্ত্রণ করে।"[১০৫] বস্তুত, যেসব দেশের সরকার কর্পোরেট গোষ্ঠীর বাজার দখল ও অবাধ লুণ্ঠনের 'উদ্দেশ্য' অর্জনের 'উপায়গুলো' (সুবিধামত আইন প্রণয়ন, প্রয়োজনে ঘুষ দিয়ে বাজার সুবিধা পাওয়া প্রভৃতি)তে বাধা সৃষ্টি করে সেসব সরকারকেই সাম্রাজ্যবাদীরা 'শত্রচ' বলে ঘোষণা করে এবং প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপ চালায়। এজন্যই প্রায়শ বলা হয়ে থাকে, নব্য-উদারপন্থী মৌলবাদীরা বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি মিশ্র আদর্শের প্রতিফলন ঘটান যার মধ্য দিয়ে নব্য-সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটে থাকে। এতে স্বল্পোন্নত দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর উপনিবেশে পরিণত হয়। ফ্রিডম্যান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য এ নীতির কার্যকারিতার কথা বলেন। এ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কোনো দেশের ধর্মীয় বা জাতিগত সম্প্রদায় নয়, বরং অর্থনৈতিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নির্দেশ করে। কারণ এ ব্যবস্থায় গুটিকয়েক ধনাঢ্য ব্যক্তি সারা বিশ্বের দরিদ্র মানুষকে শোষণের সুবিধা ভোগ করে।

নব্য-উদারতাবাদীরা যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, চিলিতে নব্য-উদারবাদী নীতি প্রবর্তন করাতে তার জিডিপি সর্বোচ্চ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জিডিপি বৃদ্ধিই একটি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক চিত্র বহন করে না। পুঁজিবাদীরা সাধারণত অধিক উৎপাদনকে গুরুত্ব দিয়ে থাকলেও এ উৎপাদনের সুফল ভোগ করে কেবল গুটিকয়েক ধনাঢ্য মানুষ। উৎপাদন সমস্যা প্রকৃত সমস্যা নয়, মূল সমস্যা নিহিত রয়েছে ত্রচটিপূর্ণ বণ্টনব্যবস্থায়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা সাধারণত প্রচার করে থাকে যে, উচ্চ হারের প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য

দূরীকরণে সহায়ক। কিন্তু কয়েক দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, শুধু জিডিপি বাড়লেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়ে না, বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি বাড়ার এই গাণিতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে গণমানুষের উন্নয়নের কোনো সম্পর্কই থাকে না। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে গত দুই দশকে জিডিপি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যও বেড়েছে দ্রূত গতিতে। এ সময়ের মধ্যে ৮০ লাখ কৃষক গৃহহারা হয়েছেন। দুই লাখ কৃষক দেনার দায়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রায় সাড়ে চার কোটি শিশু ভুগছে চরম অপুষ্টিতে। বহুদিন ধরে কৃষকের আত্মহত্যা ও শিশু অপুষ্টির বিষয়টি ভারত সরকার গুরুত্ব না দিলেও শেষ পর্যন্ত স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এক দশকের উচ্চ প্রবৃদ্ধির সময়েই ক্ষুধা ও অপুষ্টি বেড়েছে ভারতে। প্রায় ৮০ কোটি মানুষের দৈনিক আয় ২০ রুপির নিচে। অর্থনীতিবিদ উতসা পাটনায়েকের গবেষণায় দেখা যায়, গত দুই দশকে প্রবৃদ্ধি বাড়ার সময়ে ভারতের দরিদ্রদের বার্ষিক মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ১৭৭ কেজি থেকে ১৫৫ কেজিতে নেমে এসেছে। পাটনায়েক এ অবস্থাকে তুলনা করেছেন ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী চরম খাদ্যসংকটের দিনগুলোর সঙ্গে। এছাড়া অমর্ত্য সেনের ২০১০ সালের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, প্রতি বছর জিডিপি বাড়লেও নারী শিক্ষার হার, স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন, শিশুমৃত্যু ইত্যাদি সামাজিক উন্নয়নের সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতের স্থান একেবারেই নিচের দিকে।[১০৬] অথচ জিডিপির দিক থেকে ভারতের অবস্থান বিশ্বে দশম। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার চেয়েও ভারত জিডিপির দিক থেকে এগিয়ে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, নব্য-উদারতাবাদী মডেলে জিডিপি বৃদ্ধি কখনোই একটি দেশের জন্য সার্বিক মঙ্গল নিয়ে আসে না। তারা যে চিলির দৃষ্টান্ত দেয়, সেখানেও নব্য-উদারতাবাদী মডেল বাস্তবায়িত হয়েছিল সামরিক একনায়কতন্ত্র ও ব্যাপক সামাজিক দমননীতি কায়েমের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে নব্য-উদারতাবাদীদের যুক্তি হলো: গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অধিক জরুরী। এ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, কর্পোরেট স্বার্থরক্ষা করাই নব্য-উদারতাবাদীদের প্রধান কাজ।

সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে সবচেয়ে বহুল প্রচলিত যে তত্ত্বটি বারবারা ওয়ার্ড ও ডব্লুই রস্টোর মতো তাত্ত্বিকরা নিয়মিত প্রচার করে আসছেন তা হলো: প্রযুক্তি প্রদান ও যথাযথ কর্মঅভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে দক্ষিণ গোলার্ধের 'পশ্চাৎপদ দেশগুলোর উদ্ধারের দায়িত্ব হচ্ছে উত্তর গোলার্ধের ধনী দেশগুলোর।' মাইকেল প্যারেন্টির মতে, এটি হচ্ছে জনপ্রিয় সাম্রাজ্যবাদী ফ্যান্টাসি ' সাদা মানুষের

দায়'– এর আধুনিক ভাষ্য।[১০৭] কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির বিপুল আগ্রাসনী ক্ষমতা থাকার পরেও এবং সকল দেশে তাদের আধিপত্য নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও পুঁজিবাদী রূপান্তর সর্বত্র একই মাত্রায় ঘটেনি। বিশ্বের সিংহভাগ প্রায় ৪০০ কোটি মানুষ যেমন পুঁজিবাদের আগ্রাসনের শিকার, তেমনিভাবে পুঁজিবাদ বিকশিত না হবার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিরও শিকার। অনুন্নত বিশ্বে যেখানে পৃথিবীর শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ অর্থাৎ ৩৫০ কোটি মানুষের বাস, তারা জাতিসংঘের হিসাব মতে, পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগেরও কম অংশীদার। বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তাদের অংশ শতকরা ১৭ ভাগ।[১০৮] অথচ, পুঁজিবাদের খণ্ডিত প্রতিফলন বিপুল একচেটিয়া পুঁজির মালিক একটা শ্রেণী গড়ে উঠছে। এসব বাস্তব তথ্য প্রমাণ করে, বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের প্রচারিত তত্ত্বের সাথে প্রকৃত সত্যের গড়মিল কতখানি।

তবে সাম্প্রতিককালে মরিয়া হয়ে ওঠা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বগতভাবেও আর বাহ্যিক শিষ্টাচার অক্ষুণ্ন রাখতে পারছে না। সাম্প্রতিককালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যামুয়েল হন্টিংটন তাঁর *Clash of Civilization and Remaking of the World Order* গ্রন্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভাবাদর্শগত ভিত্তি রচনা করার প্রয়াস পান। কোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছাড়াই তিনি বর্তমান বিশ্বে নয়টি সভ্যতার কথা উল্লেখ করেন। সভ্যতাগুলোর তুলনামূলক আলোচনায় উদ্ধতভাবে তিনি পশ্চিমী সভ্যতাকে সবচেয়ে উন্নত সভ্যতা বলেছেন। তাঁর আশঙ্কা এ উন্নত সভ্যতা ইসলামী ও কনফুশিয়ান সভ্যতা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। কনফুশিয়ান সভ্যতা বলতে তিনি চীন ও জাপানকে বুঝিয়েছেন। এ দু'য়ের মধ্যে আবার তিনি চীনকে অধিক বিপজ্জনক মনে করেছেন। ইসলামকে তিনি অসহিষ্ণু ও বর্বর বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ জাতিবিদ্বেষ ও ধর্মবিদ্বেষ আজকের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শগত হাতিয়ার।[১০৯]

এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা মিত্রদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ তারা সম্মিলিতভাবে বিশ্ব লুণ্ঠনের কাজে অংশ নিয়ে থাকে। আবার চীনকে 'শত্রচ' ভাবা হচ্ছে। কারণ বর্তমানে (সাম্প্রতিককালের জিডিপি অনুসারে) চীনের অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই। তাই চীনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করছে। কথিত আছে যে, ২০৪৫ সালের মধ্যে চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে প্রথম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে। অপরদিকে,

ইসলামকে বর্বর বলার পেছনে কারণ হচ্ছে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ (বিশেষত তেল, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি)। শাহর আমলে ইরানের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মধ্যপ্রাচ্যের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করত। কিন্তু ইসলামী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইরান মার্কিন 'প্রভাব বলয়' থেকে বেরিয়ে আসে। এরপর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের সম্পদ দখলদারিত্বকে কেন্দ্র করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমাগত উত্তেজনা সৃষ্টি করেই রাখছে।

সুতরাং বলা যায়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পশ্চিমা প্রীতির কারণ যেমন অভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থ, তেমনিভাবে চীন ও ইসলাম ভীতির কারণ হচ্ছে যথাক্রমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতিযোগিতা ও প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ লুণ্ঠন (বিশেষত তেলক্ষেত্রগুলোর দখল) নিশ্চিত করা। সেখানেও একই অর্থনৈতিক স্বার্থেরই প্রশ্ন। মার্কস বলেছিলেন, অর্থনীতিই মূল কাঠামো ও সবকিছুর নিয়ন্ত্রক, এছাড়া অন্য সবকিছু (রাজনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম) উপরিকাঠামো। এখানেও সেই সত্যেরই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা যে ব্যাপক শোষণ ও নিপীড়ন চালায় তারই অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে বিশ্বময় ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন। লেনিন বলেছিলেন, শোষণ যত বাড়বে প্রতিরোধ আন্দোলনও তত বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে এ বাস্তবতাই লক্ষণীয়।

তথ্যসূত্র :

১. V.I. Lenin, *Imperialism, The Highest Stage of Capitalism*, in *Selected Works* (in three volumes), Moscow: Foreign Language Publishing House, 1960, pp.707-815.

২. *Ibid*. p. 782.

৩. John Atkinson Hobson, *Imperialism : A Study*, Newyork: James Pott and company, 1902.

৪. R. Hilferding, Tr. by Morris Watnick & Gordon (edited with an introduction Tom Bottomore), *Finance Capital*, London: Routledge & Kegan Paul, 1981.

৫. মাইকেল প্যারেন্টি, অনু. ওমর তারেক চৌধুরী, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা : শ্রাবণ প্রকাশনী, জুলাই, ২০০৫, পৃ. ২৬।

৬. *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৩১।

৭. *প্রাগুক্ত*।

৮. Kwami Nkrumah, *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism,* NewYork: International Publishers, 1965, p. ix.

৯. হায়দার আকবর খান রনো, *মার্কসীয় অর্থনীতি*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা: তরফদার প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ৭১।

১০ David Harvey, *New Imperialism*, Oxford: Oxford University Press, 2005.

১১ Rajen Harshe, *Twentieth Century Imperialism, Shifting Contours and Changing Conceptions*, New Delhi: Sage Publications India Pvt. Ltd., 1997, pp.22-24.

১২ V. I. Lenin, *Selected Works*, Moscow: Gaspolitizdat, vol. I, Book2, 1960, pp.725-26.

১৩. *Ibid*. p. 738.

১৪. *Ibid*. pp. 740-41.

১৫. *Ibid*. p.742.

১৬ *Ibid*. p. 757.

১৭. *Ibid*. pp. 758-59.

১৮. *Ibid*. p. 759.

১৯. *Ibid*. pp. 760-61.

২০. *Ibid*. pp. 763-64.

২১, *Ibid*. p. 776.

২২. হায়দার আকবর খান রনো, *মার্কসীয় অর্থনীতি*, পৃ. ৫৪-৫৬।

২৩, Regional Conferences Latin America, Return to Contents Issue 8: Present day Imperialism, Caracas : M-L Communist Party of Ecuador (PCMLE) & Red Flag, Party of Venezuela (Bandera Roja), 1999.

২৪. মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৩৫-৩৬।

২৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬।

২৬ Christian Fuchs, æNew Imperialism. Information and Media Imperialism?", *Global Media and Communication*, vol.6(1), 2010, pp. 36-37.

২৭. *Ibid*. p.38.

২৮. জন বেলামি ফস্টার, "সর্বাধিক পরিমাণে তেল উৎপাদন এবং ইন্ধন সাম্রাজ্যবাদ", অনূ. ও সম্পা. ফারুক চৌধুরী, *বাজার ও বৈষম্য: মান্থলী রিভিয়ু প্রবন্ধ সংকলন*, ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৬৯-৭০।

২৯. http://What-when-how.com./Social Sciences/petroleum industry social science.

৩০. জন বেলামি ফস্টার, "সর্বাধিক পরিমাণে তেল উৎপাদন এবং ইন্ধন সাম্রাজ্যবাদ", পৃ. ৬৬।

৩১. *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৬৫।

৩২. Vladimir Ilyich Lenin, *Imperialism: the Highest Stage of Capitalism*, in Henry M. Christman, (ed.), *Essential Works Lenin*, New York: Dover, 1917, p. 194.

৩৩. জোয়ান এডলম্যান স্পেরো, অনু. মমতাজউদ্দীন আহমদ, *আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের রাজনীতি*, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮৪, পৃ. ৭৪-৭৫।

৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫।

৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯।

৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।

৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৮।

৩৮ মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৩৬-৩৭।

৩৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।

৪০ হায়দার আকবর খান রনো, *মার্কসীয় অর্থনীতি*, পৃ. ৬২।

৪১. Christian Fuchs, æNew Imperialism. Information and Media Imperialism?", pp. 40-41.

৪২. Regional Conferences Latin America, 1999.

৪৩. হায়দার আকবর খান রনো, *মার্কসীয় অর্থনীতি*, পৃ. ৬২।

৪৪. মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৬৯-৭০।

৪৫. *দৈনিক প্রথম আলো*, "যুক্তরাষ্ট্রে ধনীদের ওপর কর বৃদ্ধির প্রস্তাব বাতিল", ২০১২, ২২ ডিসেম্বর: ০৯।

৪৬. মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৭০-৭১।

৪৭. জোয়ান এডলম্যান স্পেরো, *আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের রাজনীতি*, পৃ. ১৭৪।

৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭।

৪৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯-৭০।

৫০. হায়দার আকবর খান রনো, *মার্কসীয় অর্থনীতি*, পৃ. ৬৫।

৫১. Christian Fuchs, æNew Imperialism: Information and Media Imperialism?", p. 44.

৫২. হায়দার আকবর খান রনো, *মার্কসীয় অর্থনীতি*, পৃ. ৬৫-৬৬।

৫৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭।

৫৪ রবার্ট ম্যাকচেজনি, "গণমাধ্যম ফার্মগুলোর বাণিজ্যিক কেন্দ্রীভবন: যোগাযোগীয় অধিকারের প্রতি হুমকি"। মুসতাক আহ্‌মেদ, নূর-এ-জান্নাতুল ফেরদৌস, হুজ্জাতুল ইসলাম (অনু. ও সম্পা.), *কর্পোরেট মিডিয়ার সাংস্কৃতিক আগ্রাসন*, ঢাকা : শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ১৮-২০।

৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-২২।

৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩-২৫।

৫৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩।

৫৮. Christian Fuchs, æNew Imperialism. Information and Media Imperialism?", pp. 50-51.

৫৯. *Ibid.* pp. 51-52.

৬০. *Ibid.* pp. 52-53.

৬১. *Ibid.* p. 54.

৬২. *Ibid.* p. 55.

৬৩. Tom Kemp, æThe Marxist Theory of Imperialism", in Kenneth E. Boulding, & Tapan Mukerjee, (eds.), *Theories of Imperialism*, Mich : Ann Arbour, 1972.

৬৪. Herb Addo, *Imperialism: The Permanent Stage of Capitalism*, Japan: The United Nations University, 1986, p. 100.

৬৫. টেরেসা হেয়টার, অনু. গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার, *বিশ্বদারিদ্র*, ঢাকা: গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার, ১৯৮৩।

৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮।

৬৭, মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ২৭।

৬৮. আনু মুহাম্মদ, *পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও অনুন্নত বিশ্ব*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ৩১-৩২।

৬৯. Herb Addo, *Imperialism: The Permanent Stage of Capitalism*, p.

101.

৭০. *Loc. cit.*

৭১. Rajen Harshe, *Twentieth Century Imperialism, Shifting Contours and Changing Conceptions*, pp. 26-28.

৭২. Embassy of Sweden, Sweden Abroad, Sudan. Available from http:/lwww.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/khartoum/ Business/Risk-capital-and-financial-support-in-merging-markets-and-post-conflict-countries [Accessed 2012].

৭৩. *Loc. cit.*

৭৪. মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৩৪ ।

৭৫ Rajen Harshe, *Twentieth Century Imperialism, Shifting Contours and Changing Conceptions*, pp. 104

৭৬. *Ibid*, pp. 28-29.

৭৭. Regional Conferences: Latin America, 1999.

৭৮. Herb Addo, *Imperialism: The Permanent Stage of Capitalism*, p. 45.

৭৯. E.M. Winslow, *The Pattern of Imperialism: A Study in Theories of Power*, New York: Octagon press, 1972.

৮০. Hannah Arendt, *Imperialism: The Origins of Totalitarianism*, London: Allen and Unwin, 1968.

৮১. Richard Koebner, æThe Concept of Economic Imperialism", in *Theories of Imperiliasm*, 1972.

৮২. David. S. Landes, æThe Nature of Economic Imperialism", in *Theories of Imperiliasm*, 1972.

৮৩. Benjamin J. Cohen, *The question of Imperialism: The Political Economy of Dominance and Dependence*, London: Macmillan,

1974, p. 245.

৮৪. *Ibid*, pp. 46-47.

৮৫. *Ibid*, pp. 45-46.

৮৬. *Ibid*, p. 46

৮৭ *Ibid*, p.47.

৮৮. *Ibid*, pp. 48-49.

৮৯. Herb Addo, quotes from Benjamin J. Cohen's *The Questions of Imperialism*, (1974, p. 245) in his *Imperialism: The Permanent Stage of Capitalism*, 1986, p. 50.

৯০. Michael Hart and Antonio Negri, *Empire*, Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 2000.

৯১. *Ibid*, p. 57.

৯২. আনু মুহাম্মদ, *পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও অনুন্নত বিশ্ব*, পৃ. ৩১.

৯৩. Herb Addo, *Imperialism: The Permanent Stage of Capitalism*, p. 60.

৯৪. Nicolo Machiavelli, *The Prince.* London: Oxford University Press, 1921.

৯৫. F. Nietzsche, Tr. by. R.J. Holingdale, *Beyond Good and Evil.* Harmonds : Penguin Press, 1973.

৯৬. Bertrand Russell, *Power*, London: Allen & Unwin, 1938, pp. 13-17.

৯৭. Bertrand Russell, *Human Society in Ethics and Politics*, George Allen & Unwin Ltd., 1954, p. 109.

৯৮. Monica Prasad, *The Politics of Free Markets: The Rise of Neoliberal Economic Policies in Britain, France, Germany and United States*. Chicago : University of Chicago Press, 2006.

৯৯. John Williamson, æWhat Washington Means by Policy Reform”, in John Willamson (ed.), *Latin American Adjustment: Now How Much Has Happened?*, Washington, D.C: Institute for International Economics, 1990.

১০০. Alejandro Portes, and Bryan R. Roberts, æFree-Market City: Latin American Urbanization in the Years of the Neoliberal Experiment”, *Studies in Comparative International Development*, 2005, pp.43-82.

১০১. Regional Conferences Latin America, 1999.

১০২. J Pfeffer, æInternational NGO’s and primary health care in Mozambique the need for new model of collaboration”, *Social Science & Medicine*, 2003, 56 (4).

১০৩. Milton Friedman, *Capitalism and Freedom*, Chicago : Chicago Universiy Press, 2002, pp. 8-21.

১০৪. *দৈনিক প্রথম আলো*, “তদবিরে কোটি ডলার ব্যয় করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ১৫টি প্রতিষ্ঠান”, ২০১২, ১৭ ডিসেম্বরঃ ১৩।

১০৫. Friedrich Hayek, *The Road to Serfdom*, Chicago: University of Chicago Press, 1944, p. 95.

১০৬. মাহা মীর্জা, “৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি সমাহার”, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১২, ১১ ডিসেম্বর, ১২।

১০৭. মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৩১।

১০৮. আনু মুহাম্মদ, *পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও অনুন্নত বিশ্ব*, পৃ. ৪৫।

১০৯. হায়দার আকবর খান রনো, *আজকের সাম্রাজ্যবাদ*, ঢাকাঃ গণ প্রকাশন, ২০০৬, পৃ. ১৩-১৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা ও করণীয়

পুঁজি রপ্তানির (বৈদেশিক বিনিয়োগ ও ঋণপ্রদান) মাধ্যমেই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ওপর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তাই উন্নত দেশগুলোকে লেনিন 'সুদী রাষ্ট্র' ও অনুন্নত দেশগুলোকে 'ঋণী রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী যুগে অর্থাৎ নব্য ঔপনিবেশিক পর্বে এসে একটি ধনী দেশ রাজনৈতিক দখল ছাড়াই একটি দরিদ্র দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে উপর্যুপরি প্রভাব বিস্তারে সক্ষম–এ বিষয়টিও লেনিন তাঁর গ্রন্থে ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো শোষণের ভিত্তিকে আরও পাকাপোক্ত করতে গড়ে তোলে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবির মত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলোর পদানত করে রাখে। অসম বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন, ঋণভারে জর্জরিত রাখা, বাজার দখল, ব্যাপক বেসরকারীকরণ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বে নিজ নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়াও রয়েছে সেবাপ্রদানের নামে এনজিওগুলোর কার্যক্রম যা একটি দেশের মানব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে বিদেশী সংস্থার হাতে তুলে দেয়। এ সমস্ত শোষণমূলক তৎপরতার শিকার একটি দরিদ্র ও জনবহুল দেশের নাম বাংলাদেশ। নিম্ন জীবনযাত্রার মান, কৃষিক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, শিল্পক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা, ধনী-গরীব বৈষম্য, স্বাক্ষরতার অভাব, মৌলিক চাহিদা পরিপূরণে ব্যর্থতা প্রভৃতি সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত এ রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক সম্পদও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হিংস্র থাবায় বিপর্যস্ত। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু সমস্যা মোকাবেলার লড়াই।

বিশ্বায়নের ছদ্মাবরণে সাম্প্রতিককালে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো যে 'গ্লোবাল ভিলেজ' এর ধারণা প্রদান করে তা পরাশক্তিকে মোড়লে পরিণত করে আর হতদরিদ্র বাংলাদেশের মতো দেশকে করে তোলে তাদের প্রজাসদৃশ। তার পাশাপাশি কাজ করে উপ-সাম্রাজ্যবাদী বা পার্শ্ববর্তী শক্তিধর রাষ্ট্রের আধিপত্য। সুতরাং, মুক্ত বিশ্ব হয়ে ওঠে তথাকথিত শক্তিমানদের স্বাধীনতা ও তাদের প্রতি দুর্বলদের অধীনতা। আর এ অধীনতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর বহুজাতিক ও ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানিসমূহের আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে। এ লক্ষ্য পূরণে পরাশক্তিগুলো

তৃতীয় বিশ্বের কৃষিজমি নিধন, তাদের সঙ্গে অসম বাণিজ্যিক চুক্তি স্থাপন, নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে দরিদ্র দেশের পরিবেশকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে। একটি নব্য-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশও প্রধান পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অপরাপর শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহ ও ক্ষমতাধর বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মইনুল ইসলাম মন্তব্য করেন, "ঋণ নির্ভরতা থেকে বাণিজ্য নির্ভরতায় অর্থনীতির উত্তরণ সত্ত্বেও বাংলাদেশের পক্ষে 'আধিপত্য-পরনির্ভরতা সিনড্রোম' থেকে বেরোনোর সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না"।[১] তার ওপর বৈশ্বিক সামরিকীকরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সাম্প্রতিককালে এদেশের অনাবশ্যক সামরিক ব্যয় বৃদ্ধিও সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি পূরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান

পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার অধীনে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ ও দেশের ধনিক শ্রেণীর সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। ফলে এখানে গড়ে উঠেছে পরজীবী রাজনৈতিক অর্থনীতি ও বৈষম্য। সাম্প্রতিককালে সাম্রাজ্যবাদ 'উন্নয়ন তত্ত্বে'র নামে তৃতীয় বিশ্বে তার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে। এ বিশ্বায়নের যুগে 'উন্নয়ন তত্ত্ব' বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে এনজিওগুলোর কার্যক্রম। পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক যেহেতু শ্রেণী বৈষম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই এসব কর্মসূচীতেও শ্রেণী বৈষম্যের ছাপ লক্ষ্যণীয়। এনজিওগুলো এদেশের গ্রাম উন্নয়নে একাধিক মডেলের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। এতে ভূমিমালিকরা উৎপাদনের উপকরণ, সেচ ও ঋণ এবং বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে নানা সুবিধা লাভ করে, পাশাপাশি গরীব জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশ খুদে মালিক বা ব্যবসায়ীতে রূপান্তরিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে তাদের কর্মতৎপরতায় আয়-সঞ্চয় বিনিয়োগ চক্রকে গতিশীল মনে হলেও স্থায়ী ও স্থিতিশীল কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা এতে তৈরি হয় না। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধিষ্ণু এসব এনজিওগুলো সরকারি পুঁজিবাদী কেন্দ্র রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক সাহায্যপুষ্ট বলে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের কাজেই মূলত এদের ব্যবহার করা হয়। এনজিওগুলোর সামগ্রিক অর্থনৈতিক পর্যালোচনা থেকে জানা যায় যে, এসব কার্যক্রমের ফলে ঐসব অঞ্চলে গ্রূপভুক্ত সদস্যদের কিছু আয়বৃদ্ধি ঘটলেও এ বৃদ্ধি সাধারণভাবে আত্মপোষণমূলক অবস্থা অতিক্রম করার মতো নয়।[২] সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, সাপ্তাহিকভিত্তিক নিয়মিত সঞ্চয়ের পরও তাদের অধিকাংশেরই সঞ্চয় অর্থনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের মতো অবস্থায় পৌঁছায় না।

বিনিয়োগক্ষেত্রে উৎপাদনশীল স্থায়ী বিনিয়োগ করার মতো পুঁজি গড়ে ওঠে না এবং সামাজিকভাবে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশের অভাবে তারা তাদের সঞ্চিত অর্থ এবং ঋণ বিনিয়োগ করে ব্যবসা বা সুদে লগ্নিতে।[৩] তারপরেও বাংলাদেশ সরকার এনজিওগুলোর কর্মকাণ্ডকে সর্বজনগৃহীত পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে একটি প্রান্তিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের যেকোনো উন্নয়ন প্রকল্পই কেন্দ্র রাষ্ট্রগুলোর প্রেসক্রিপশনে হয়ে থাকে। তবে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার প্রান্তিক অবস্থানে থাকলেই বিশ্বের প্রতিটি দেশেরই একইরকম পরিণাম ঘটে না। শাসক শ্রেণীর অবস্থান এক্ষেত্রে পার্থক্যটি সৃষ্টি করে। বলিভিয়া ও ভেনিজুয়েলার মতো রাষ্ট্রগুলো পূর্বে প্রান্তিক অবস্থানে থাকার পরেও শাসক শ্রেণীর দৃঢ়তার কারণে নিজের সম্পদের ওপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ লিখেছেন: "ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের মধ্যেও একটি দুর্বল অংশ। এদেশের শাসক শ্রেণীর উৎপাদনশীল ভিত্তি নেই এবং সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক দিক থেকে তা বরাবর আত্মসমর্পণে উন্মুখ। সে কারণে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার আঞ্চলিক বিন্যাস-পুনর্বিন্যাসে বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর ভূমিকা খুবই নগন্য"।[৪] বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সংস্কৃতিতে এখন দুর্নীতি, কালোটাকা ও ঐ টাকায় লালিত সন্ত্রাস একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকে পরিণত হয়েছে। চোরাচালাননির্ভর ব্যবসা-বাণিজ্যকে টিকিয়ে রাখতেও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা অগ্রগণ্য। এছাড়া বিশ্বায়নের প্রভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে পুঁজির সঞ্চয় করতে গিয়ে রাষ্ট্রই পুঁজি লুণ্ঠনকে ছত্র-ছায়া প্রদান করছে। ফলে একটি অতি ক্ষুদ্র মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি গোষ্ঠী, সামরিক কর্মকর্তা, বেসামরিক কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, স্মাগলার এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো দ্রুত কোটিপতিতে পরিণত হয়ে দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অপরদিকে, বৈষম্যের কারণে নিম্নবিত্ত জনগণের দারিদ্র ও নি:স্বায়ন প্রক্রিয়াও উৎসাহিত হচ্ছে।[৫]

পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার প্রান্তস্থ ৪৯টি রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে জনবহুল। তাই স্বাধীনতার পর থেকেই বিদেশী সাহায্য ছাড়া জনগণকে রক্ষা করা যাবে না এমন মন্তব্য হরহামেশাই শোনা যেতো। দেশের অর্থনীতিও ক্রমশ পরনির্ভর হয়ে উঠছিল। নানা সমস্যায় জর্জরিত একটি

সাহায্যনির্ভর দেশ হিসেবে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং নানাবিধ দাতা সংস্থা ও দাতা দেশের ঋণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলী পরামর্শ আকারে আরোপিত হতো। এ বাস্তবতার অংশ হিসেবে বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশ দাতাদের নির্দেশিত কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।[৬] এ কর্মসূচীর অধীনে এসে বাংলাদেশকে নব্য-উদারতাবাদী দর্শনের আওতায় ও প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের রক্ষণশীল নীতির অধীনে আসতে হয়। এর ফলে রাষ্ট্রীয় খাতে ব্যয় কমিয়ে ব্যক্তিখাতকে অর্থনীতির নিয়ামকে পরিণত করা হয়। অর্থনৈতিক কার্যক্রমে বাজার ব্যবস্থার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়।

পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার অধীনে এসে দেশের ব্যাংকিং খাত ও বীমা ব্যবস্থাসহ ঋণবাজারকে ব্যক্তি মালিকানায় অর্পণ এবং ঋণবাজারে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনা হয়। এমনকি বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহ, টেলিযোগাযোগ, সড়ক ও নৌপরিবহন, রেলওয়ে, বিমান পরিবহন প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক দ্রব্য ও খাত থেকে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রত্যাহার করে ব্যক্তিমালিকানা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী করে তোলা হয়। এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক খাতের কার্যক্রমে প্রদত্ত সরকারি ভর্তুকি ক্রমসংকোচন করে এসব খাতে ব্যক্তি খাতের উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়। এরই অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে বিদেশী দাতা সংস্থা ও এনজিওগুলোর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়া। তদুপরি, শেয়ার ও মূলধন বাজারের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ফটকামূলক প্রবণতাকে উৎসাহ দেয়া হয় এবং ঐসব বাজারে বৈদেশিক পুঁজির প্রবেশকে অধিক অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। বন্দর, মহাসড়ক, বিদ্যুৎ প্লান্ট প্রভৃতি ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যস্থাপনায় সরকারি ভূমিকাকে গুটিয়ে নেয়া হয়।[৭] এসবই হচ্ছে রিগানোমিক্সের কুফল আর বিশ্বায়নের নামে বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশের কাছ থেকে পশ্চিমা বিশ্বের লব্ধ সুবিধার বহি:প্রকাশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মূলত আইএমএফের মাধ্যমে এসব নীতির বাস্তবায়ন ঘটায়।

বাংলাদেশের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অযাচিত হস্তক্ষেপ। বিভিন্ন সময় মার্কিন রাষ্ট্রদূতরা এদেশের নির্বাচন, শাসনব্যবস্থা, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও কর্মকাণ্ড নিয়ে আদেশসূচক বক্তব্য উপস্থাপন করে

থাকেন। বাংলাদেশের ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এহেন আচরণ সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর মন্তব্য করেন, "বর্তমান দুনিয়ায় যে দেশগুলোর শাসক শ্রেণী সব থেকে দুর্বল অবস্থায় আছে বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর অবস্থান তার সামনের সারিতে। এদেশের অর্থনীতির কোনো মেরুদণ্ড নেই। কারণ প্রথমত, এখানে শিল্পশক্তি বলতে যা বোঝায় তার অবস্থা কাহিল। এখানকার কৃষিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণ প্রায় অবাধ বলা চলে, বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজারের নামে বাংলাদেশের বাজার মার্কিনসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে"।[৮] এই নির্ভরশীলতা চক্রে পড়েই মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর ইজারা দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। এছাড়া আমাদের দেশের পানি, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, যাতায়াত ব্যবস্থা সবকিছুতেই সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশে নৌ ঘাঁটি স্থাপনের পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের বহু বছরের। মার্কিন কোম্পানিকে ১৯৮ বছরের মেয়াদে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর সংলগ্ন বড় আকারে জমি পত্তন দেয়ার জন্য তারা বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই চক্রান্ত করছে। একবার এই ইজারা লাভ করলে সেখানে বাংলাদেশ সরকারের কোনো কর্তৃত্বই থাকবে না, এমনকি তাদের অনুমতি ছাড়া কোনো সরকারী প্রতিনিধির প্রবেশাধিকার পর্যন্ত থাকবে না।[৯] ৮০র দশকে যে কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে এদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণাধীনে এসে পড়ে, তারই ধারাবাহিকতায় ৯০ দশকে ব্যক্তি মালিকানা ও বিশেষত বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন যুক্তি ও কর্মসূচীতে খনিজ সম্পদ ও বন্দরও যুক্ত হয়।[১০] এরপর থেকে বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা 'উন্নয়ন ফোরাম' ও বিনিয়োগের নাম করে বিদেশী কোম্পানিকে বন্দর এলাকা ইজারাদানের ষড়যন্ত্র চালায়।

শুধুমাত্র বন্দর ইজারা নয়, সমুদ্রবক্ষের তেল-গ্যাস সম্পদ দখল করতেও বিদেশী কোম্পানিগুলো মুখিয়ে আছে। সম্প্রতি বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও ডেটনেটর ভর্তি (বিস্ফোরণ ঘটানোর কাজে ব্যবহৃত একটি দণ্ড) একটি দেশি জাহাজ আটক করেছে নৌবাহিনী। নৌবাহিনীর সূত্র থেকে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কোম্পানি শেভরন সিলেটের জালালাবাদ গ্যাসক্ষেত্রে ত্রিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপের কাজে ব্যবহারের জন্য এগুলো আমদানি করেছে। কিন্তু আমদানির বৈধ কাগজপত্র নেই। উপরন্তু, জাহাজটির গতিবিধিও ছিল রহস্যজনক। নিয়ম অনুসারে, বন্দরে বিস্ফোরক আনতে হলে নৌবাহিনীর অনুমতি নিতে হয়। জাহাজটি সে

অনুমতি ছাড়াই বন্দরে প্রবেশ করে।[১১] এর সঙ্গে বাংলাদেশে মার্কিন নৌঘাঁটি স্থাপনের দীর্ঘদিনের চক্রান্তের কোনো সংযোগ নেই তা-ও হলফ করে বলা যায় না।

বাংলাদেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের ষড়যন্ত্র ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংবিধান প্রণয়নসহ অন্যান্য সকল রাষ্ট্রনীতিতে এদেশের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ অব্যাহত রাখছে। ২০০০ সালে মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীন আর্থিক সংস্থা বিশ্বব্যাংকের 'রিফরমিং-গভর্নমেন্টস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় রাজনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে এ বিষয়ে শাসনতান্ত্রিক সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়। এভাবেই বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ও তাদের সমর্থনপুষ্ট শোষণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ রক্ষার চেষ্টায় নিযুক্ত আছে। আর এ কাজে তারা সবসময়ই এদেশের লুণ্ঠনজীবী বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠীকে সঙ্গে পাচ্ছে। কোনো সরকার বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের শর্ত মানতে অস্বীকৃতি জানালে সেই সরকারকে এসব সংস্থা তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরাগভাজন হতে হয়। তখনই স্তিমিত হয়ে পড়ে অনুদানের প্রবাহ। আবার তাদের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ৭০/৭৫ শতাংশই দেশী-বিদেশী কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আমাদের অর্থনীতি তাদের পছন্দমতো সাজানো হলেই তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা হয়। তাই বিশ্বব্যাংক কথিত উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে একমাত্র গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কিছু দৃশ্যমান ফলাফল ছাড়া অন্য কোনো প্রকল্প থেকে জনগণের সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। এভাবে তাদের পছন্দমতো প্রকল্পে এদেশকে ঋণভারে জর্জরিত করার সাফল্যের পরে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য ১৫০টি শর্ত প্রদান করে। এসব শর্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বিরাষ্ট্রীকরণ, ব্যাংকের জনবল ছাঁটাই, সরকারের জনবল ছাঁটাই, গ্যাস রপ্তানি, চট্টগ্রাম বন্দরে প্রাইভেট টার্মিনাল নির্মাণ ও বন্দরের বিভিন্ন অপারেশন বেসরকারিকরণ, আমদানি উদারীকরণ প্রক্রিয়া তরান্বিতকরণ, সম্পূরক শুল্ক হ্রাসকরণ, রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানা বিরাষ্ট্রীকরণ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ফি বৃদ্ধি, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বিরাষ্ট্রীকরণ ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য যে, এগুলোর অধিকাংশই দেশের জন্য ক্ষতিকর অভিঘাত সৃষ্টি করবে।[১২]

এনজিওভিত্তিক দারিদ্র্যহ্রাসকরণ কর্মসূচীতে কখানো মানুষের উন্নয়ন ঘটে না। এতে মানুষের জীবনযাত্রার মানে গুণগত কোনো পরিবর্তন আসে না। কেবলমাত্র কিছুসংখ্যক খুদে মালিকের জন্ম হয়, যারা পরবর্তীতে কায়েমী স্বার্থভোগীদের শোষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। পুঁজিবাদী উন্নয়ন ব্যবস্থা এহেন শোষণ কাঠামো ও শ্রেণী বৈষম্যকে টিকিয়ে রেখেই সাধিত হয়ে থাকে। আবার এসব ওয়াশিংটনভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গতিবিধি আমাদের দেশে অবাধ করার পেছনেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সদা তৎপর। এর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে ২০০৫ সালের ১২ মে জাতীয় সংসদে বিশ্বব্যাংকের দায়মুক্তির বিল উত্থাপন। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাংকের বিরুদ্ধে মামলা করার পথ ও তার বেআইনি ও দেশের স্বার্থবিরোধী কার্যক্রমকে প্রতিহত করার উপায় একেবারেই রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে বাংলাদেশে এটিই একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। ১৯৭২-৭৩ সালেও একইভাবে আইএমএফ ও এডিবিকে সম্পূর্ণভাবে দায়মুক্ত করা হয়েছিল।[১৩] এভাবে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অবৈধ কার্যক্রমকে বৈধ করার মাঝেই তাদের কর্মপ্রয়াস সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করে পুরোপুরি দাসখত দেয়ার পথও তারা তৈরি করেছে। বস্তুত, স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটার পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে নগ্ন ও নিয়ন্ত্রণহীন। আর তাদের এ বল্গাহীন আচরণে সবসময়ই পূর্ণভাবে সমর্থন দিয়ে আসছে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী।

আমাদের করণীয়

বাংলাদেশ রাজনৈতিক ও ভৌগলিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার একটি দুর্বলতম অংশ। শাসকগোষ্ঠীও রাষ্ট্র পরিচালনায় বরাবরই দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে। ৮০'র দশকে 'কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী'তে অংশগ্রহণ করে যে পরাশ্রয়ী অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে তা থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। এজন্য দরকার স্বনির্ভর রাষ্ট্রনীতি ও শক্তিশালী নেতৃত্ব। ভেনিজুয়েলার প্রাক্তন শাসকবর্গ পরজীবী রাজনৈতিক অর্থনীতি গড়ে তুললেও বর্তমান শক্তিশালী নেতৃত্ব পূর্বের দুর্বল অবস্থা কাটিয়ে উঠে অর্থনীতিকে নতুনভাবে সচল করে তুলেছে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যাপক চাপ ও ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে চাভেজ দেশের সম্পদকে বিদেশীদের হাতে তুলে না দিয়ে তাকে নানা কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে কাজে লাগিয়েছেন।

১৯৯৯ সালে চাভেজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই ভেনিজুয়েলায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকগুলো ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে। খাদ্যদ্রব্যের সহজলভ্যতা, স্বাস্থ্যসেবা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার মতো জনপ্রিয় সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেই চাভেজ সরকার এ সাফল্য অর্জন করে। তাঁর এসব কল্যাণমূলক কর্মসূচী ভেনিজুয়েলাকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে আয়বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে সফলতম অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। সেইসঙ্গে তাঁর শাসনামলে অশিক্ষা, শিশুমৃত্যু ও বেকারত্বের হার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে, পক্ষান্তরে বৃদ্ধি পেয়েছে জনগণের গড় আয়ু। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অমুখাপেক্ষী, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের রূপকার এ শাসক তৈরি করতে পেরেছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা ও প্রগতিশীল ধারার সংবিধান। হুগো চাভেজের ভেনিজুয়েলা তাই হতে পারে বাংলাদেশের জন্য একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। শুধুমাত্র শাসকের দেশপ্রেম ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব কীভাবে একটি দেশকে সমৃদ্ধ করতে পারে তারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন এই ভেনিজুয়েলা। সম্পদের সদ্ব্যবহার ও রাষ্ট্রায়ত্তকরণ নীতির প্রবর্তন ঘটিয়ে তিনি জনগণের ব্যাপক উন্নতিবিধানে সক্ষম হয়েছেন। সুতরাং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-এর প্রেসক্রিপশন ছাড়াও যে এ বিশ্বে টিকে থাকা সম্ভব এবং বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই ভেনিজুয়েলা। চাভেজ সরকারের স্থায়ীত্ব এদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এনে দিয়েছে, বাড়িয়ে তুলেছে জাতীয় ঐক্য। ফলে অর্থনীতিকে পৌঁছে দিয়েছে শক্তিশালী অবস্থানে। অপরদিকে, বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাই, নেতৃবর্গের দুর্বলতা ও দুর্নীতি। ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক সংকট ও অস্থিতিশীলতার জন্ম হয়, জনমনে তৈরি হয় অনাস্থা। ফলে কোনো সরকারই স্থায়ীত্ব পায় না। এর অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে উন্নয়ন প্রকল্প থমকে দাঁড়ানো ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। এ প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিহার করে যদি একটি বিদেশী হস্তক্ষেপমুক্ত স্বনির্ভর রাজনৈতিক অর্থনীতি গড়ে তোলা যায়, তবে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারে অনেকদূর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ নির্ভরতা আমরা কাটাবো কীভাবে? এক্ষেত্রে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জোসেফ ষ্টিগলিজের* পরামর্শগুলো অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। আমরা দেখেছি, বাংলাদেশ সেই ৮০'র দশকে আইএমএফ-এর প্রেসক্রিপশনে 'কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি'র অধীনে আসে। এরপর থেকেই নব্য উদারতাবাদী ছকে এদেশে এক পরজীবী অর্থনীতি বিকশিত হয়। স্টিগলিজ বাংলাদেশকে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। স্টিগলিজের মতে, আইএমএফ একটি অগণতান্ত্রিক ও অস্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান যার প্রধান নিয়ন্ত্রক হচ্ছে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ। প্রান্তস্থ অর্থনীতির দেশগুলোর ওপর ভুল সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়াই তাদের নীতি। তিনি দৃষ্টান্ত সহকারে ব্যাখ্যা করেন যে, আইএমএফ-এর ভুল পরামর্শেই মেক্সিকো ও আর্জেন্টিনার অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো, আইএমএফ-এর প্রতি এমন শর্তহীন আনুগত্য দেখানোর পরও আর্জেন্টিনাকে সম্প্রতি তারা লাল কার্ড দেখানোর হুমকি প্রদান করেছে। তারা ঘোষণা করেছে, আর্জেন্টিনা যদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য উপাত্ত প্রদানে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বাংলাদেশ আইএমএফ, এডিবি ও বিশ্বব্যাংকের মতো সংস্থাগুলোকে দায়মুক্ত করে চরম আনুগত্য পোষণ করলেও 'পদ্মা সেতু প্রকল্প'কে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের সঙ্গে চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে।

স্টিগলিজ দেখান যে, ১৯৯৭-৯৯ সালের পূর্ব এশীয় সংকটের সময় আইএমএফ-এর চাপিয়ে দেয়া নীতি গ্রহণের কারণে দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতি পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মালয়েশিয়া তাদের কথা না শোনাতেই সংকট থেকে উত্তরণ লাভে সক্ষম হয়েছিল। ঐ সময়ে আইএমএফ ঐসব দেশকে সম্প্রসারণমূলক নীতি গ্রহণের পরিবর্তে আরো সংকোচন নীতি গ্রহণে বাধ্য করেছিল। এতে ঐসব দেশের সংকট আরো গুরুতর মন্দাবস্থায় পতিত হয়। সুতরাং বাংলাদেশের প্রতি তাঁর প্রথম পরামর্শই ছিল, আইএমএফ-এর নিয়ন্ত্রণে যেতে হয় এমন পরিস্থিতি

* নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোসেফ স্টিগলিজ ২০০১ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার জয় করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বিশ্বব্যাংকের চিফ ইকনোমিস্ট ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই পদে চাকুরীরত থাকাকালীন সময়ে ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সফরে এসে তিনি এদেশকে কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও আইএমএফের ভুল প্রেসক্রিপশনের সরাসরি সমালোচনা করায় তাকে ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।

এড়িয়ে চলা। আমরা দেখেছি, বাংলাদেশের সরকার বার বার আমদানি উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করেছে। সাধারণত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেসব সেবাখাতে শক্তিশালী (যেমন- আর্থিক খাত, যোগাযোগ খাত ও তথ্যপ্রযুক্তি খাত) সেগুলো উদারীকরণের জন্য ব্যাপক চাপ প্রদান করা হয়। আবার যেসব খাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল (যেমন- নির্মাণ খাত) ঐ খাতগুলো উদারীকরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে ভারসাম্যহীন ও একতরফা। তাই বিশ্বায়ন সম্পর্কে স্টিগলিজের বক্তব্য হলোঃ শিল্পায়িত দেশগুলোর পণ্য ও পুঁজির বিশ্বব্যাপী চলাচলকে অবাধ করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদার করাই বিশ্বায়নের লক্ষ্য।

আশির দশক থেকে বাংলাদেশে যে বেসরকারীকরণের মহোৎসব শুরু হয়েছিল তা এখনও অব্যাহত রয়েছে। স্টিগলিজ ঢালাওভাবে প্রাইভেটাইজেশনে মেতে ওঠার পরিবর্তে সুচিন্তিতভাবে খাত বাছাই করে এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, বেসরকারিকরণ রাশিয়ায় বিদ্যমান পরিস্থিতিকে আরো বিপর্যয়কর অবনতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। কারণ সেখানে ব্যাপক বেসরকারিকরণ পুরো অর্থনীতিকে দুর্নীতি ও মাফিয়া কবলিত করে ফেলেছিল।[১৪] ২০১২ সালের দুর্নীতির বৈশ্বিক সূচকে রাশিয়ার স্কোর ছিল ২৮ আর বাংলাদেশের ২৬। ট্রান্সপারেন্সির সূচক অনুযায়ী দুর্নীতির দৌঁড়ে এই দুই দেশের সহাবস্থান বেশ কয়েক বছর ধরেই বহাল আছে।[১৫] এ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক পথ থেকে বেরিয়ে আসার পর রাশিয়ার অর্থনীতিতে ব্যাপক বেসরকারীকরণের কুপ্রভাব। বাংলাদেশও তার সংবিধান থেকে ‘সমাজতন্ত্র’ নীতিটি পরিহার করে একই পথে হাঁটছে আর অর্থনীতিকে করে তুলছে বিপর্যস্ত।

এই বাজারীকরণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে যেসব তৃতীয় বিশ্বের দেশ ব্যাপক বেসরকারীকরণের আশ্রয় গ্রহণ করেছে তারাই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে এবং দুর্নীতির প্রকোপ বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও এ বেসরকারীকরণের কুপ্রভাব লক্ষ্যণীয়। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া রাষ্ট্রায়ত্ত ৭৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩২টি বন্ধ আছে। আর ৪৪টি প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত চালু আছে, চরম অব্যবস্থাপনার কারণে তার লাভ-লোকসানের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।[১৬] এ ধরনের অপরিকল্পিত বেসরকারীকরণ সম্পর্কে স্টিগলিজের মন্তব্য হলোঃ ভুল প্রাইভেটাইজেশন পরিহার করে রাষ্ট্রের এবং বাজারের

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকাকে সুচিন্তিতভাবে বিন্যস্ত করতে হবে। আর্থিক খাতে শক্ত নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখতে হবে। যেসব দেশ উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় সফলতা অর্জন করেছে ওগুলোর প্রায় সবগুলোতেই ব্যক্তিখাতকে সহায়তাকারী শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভূমিকা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অতএব, রাষ্ট্র এবং বাজারের মধ্যে ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন, যেমন, রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ও ব্যক্তিখাতের মধ্যে ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, দুর্নীতি দমনে সরকারকে কঠোর হতে হবে। পুঁজিবাজারে ফটকাবাজি কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ব্যাংকগুলোকে শক্ত হাতে তত্ত্বাবধান করতে হবে।[১৭]

প্রান্তিক অর্থনীতির দেশ

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম বাংলাদেশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের আওতামুক্ত হয়। স্বাধীনতার পর দেশের সম্পদের ওপর বাংলাদেশের সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলেও আন্তর্জাতিক বাজার বহুলাংশেই বিদেশী মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণেই রয়ে গেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণের বাইরেও বহুজাতিক কোম্পানিগুলো আমদানির বিকল্প শিল্পের সঙ্গে প্রান্তিকভাবে জড়িয়ে আছে।[১৮] বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের চাপানো শর্ত মেনে নিয়ে বাংলাদেশ আমদানি উদারিকরণ, কৃষিকে নির্বিচারে বাণিজ্যকায়ন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ উপযোগ ও জনসেবা খাতকে ঢালাওভাবে বেসরকারীকরণের মতো আত্মঘাতী কর্মসূচি গ্রহণে বাধ্য হয়। ১৯৯৪ সালে বিশ্বায়নের নামে যে গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তারও নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছে। বার বার আমদানি উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করে বহির্বিশ্বের জন্য নিজের বাজার উন্মুক্ত করে দিলেও বহির্বিশ্বে বাজার সুবিধা সৃষ্টি হয়নি বাংলাদেশের।

নব্য-উদারতাবাদীদের আরেকটি উন্নয়ন প্রস্তাব হচ্ছে, মানব উন্নয়ন খাতগুলোকে রাষ্ট্রীয় প্রভাবমুক্ত করে বেসরকারি এনজিওগুলোর হাতে ছেড়ে দেয়া। পুঁজিবাদী কেন্দ্রগুলোর নির্দেশিত পথে এসব উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বৈষম্য, দারিদ্র্য ও এক ধরনের বিকলাঙ্গ উন্নয়নের বিস্তার ঘটে। বাংলাদেশে উত্তরোত্তর এনজিওগুলোর আয়তন, প্রভাব, কাজের ব্যাপ্তি, সরকার ও দাতা সংস্থাগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতির সম্প্রসারণ ঘটায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যেকোনো ব্যবসায়িক সংস্থার মতই এসব সংস্থার মধ্যেও ক্রমেই একচেটিয়া সংস্থার উদ্ভব হয়েছে। এসব সংস্থা একচেটিয়া রূপ লাভ করায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তাদের প্রভাব বিস্তারকারী অংশগ্রহণও নিশ্চিত হয়েছে। ফলে

বাংলাদেশের ক্ষমতার কাঠামোয় বৃহৎ এনজিওর কর্তা ব্যক্তিরাও গুরুত্বপূর্ণ শরীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এদেশে যখন প্রথম এনজিওগুলোর কার্যক্রম শুরু হয়, তখন তাদের “সামাজিক পরিবর্তন” এর মতো বিপ্লবাত্মক কথাবার্তা বলতে শোনা যেতো। কিন্তু এখন তারা অর্থনৈতিক কার্যক্রমেই অধিক আগ্রহী। তাই তাদের কাজকর্মের মধ্যে ঋণদান কর্মসূচিকেই সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে।[১৯] এ ঋণদান কর্মসূচিতে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা অগ্রগণ্য। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংকসহ যেসব সংস্থা ঋণদান কর্মসূচিতে আগ্রহী তাদের ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে নিপীড়নমূলক ভূমিকা দিনে দিনে বাড়ছে। এর ফলে কোনো কোনো গ্রামে অসন্তোষও সৃষ্টি হচ্ছে। এসব বিরোধিতা সত্ত্বেও আমাদের শাসকগোষ্ঠী ‘এনজিও’কে উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য করে আসছেন। উন্নয়নের মূল সংকট আড়াল করতে গিয়েই তারা এনজিওগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জনগণকে প্রতারিত করে থাকে।[২০]

এনজিও প্রক্রিয়ায় ঋণগ্রহীতাদের সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয় না। এনজিওগুলোর প্রহসনমূলক এ উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পুঁজির সীমানা ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়। এতে আন্তর্জাতিক পুঁজি পুরনো প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কগুলোতে আঘাত করে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর অবস্থান ও ভূমিকার কারণে তা গতিশীল পরিবর্তনের দিকে সমাজকে নিতে পারে না। তাই এসব উন্নয়ন কর্মসূচি বাহ্য আড়ম্বরেই সীমিত হয়ে পড়ে। এভাবেই দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যবসা চলতে থাকে। তাতে লাভবান হয় মুৎসুদ্দি শাসক শ্রেণী, এনজিও, দাতাগোষ্ঠী তথা সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো। বলাই বাহুল্য যে, বাংলাদেশে সামগ্রিক উন্নয়নের পদক্ষেপ নিতে হলে প্রয়োজন স্বনির্ভর তৃণমূল সংগঠন। বিদ্যমান এনজিও ব্যবস্থা কোনো স্বনির্ভর তৃণমূল সংগঠনের মডেল নয়।[২১]

লেনিন বলেছিলেন, পুঁজি রপ্তানি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আর ঋণপ্রদান হচ্ছে পুঁজি রপ্তানির সবচেয়ে সুবিধাজনক মাধ্যম। প্রধান পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি অথবা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ বা এডিবির মতো আর্থিক সংস্থার মাধ্যমে তাদের পছন্দমতো কর্মসূচিতে চড়াসুদে ঋণ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে এর অর্থনীতি সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের নিয়ন্ত্রিত ও ঋণভারে জর্জরিত ছিল। এই প্রক্রিয়া কখনো হ্রাস পায়নি, বরং দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশে এ ঋণের ভূমিকা কতটুকু? এ ঋণের

কোনো ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে কি না তা যাচাই করে দেখা যেতে পারে। আমরা জানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ ঋণের চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এদেশের মুৎসুদ্দি শাসক গোষ্ঠী সাধারণত দেশের স্বার্থ তুচ্ছ করে তাঁদের ফাঁদে পা দেয়, বিনিময়ে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হলেও দেশ পরিণত হয় ভিক্ষুক রাষ্ট্রে। আমাদের অর্থনীতিতে এ ঋণের অবদান যদি আমরা যাচাই করে দেখি, তাহলে দেখতে পাই, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জিডিপি'র অনুপাত হিসেবে প্রকৃত ছাড়কৃত বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের অবদান ২ শতাংশেরও নিচে নেমে গেছে। অর্থাৎ বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান এখন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রান্তিক গুরুত্বের দাবিদার, এর বেশি কিছু নয়। জিডিপির এই দুই শতাংশ প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে বাংলাদেশের অর্থনীতির কোনো ক্ষতি হবে না।[২২] সুতরাং, বৈদেশিক ঋণ এদেশের গণ উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক বিকাশে কোনো ফলপ্রসূ অবদান রাখে না। স্বার্থান্বেষী, দুর্নীতিপরায়ণ ও লুণ্ঠনজীবী গোষ্ঠীগুলোর কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজেই এ ঋণ ব্যবহৃত হচ্ছে। ধনিক কল্যাণে ব্যবহৃত এ ঋণের দুষ্টচক্রটিও কম সুদূরপ্রসারী নয়। কারণ ঋণ গ্রহণ করে যে সরকারি ব্যয় হয় তা অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহ বাড়িয়ে দেয়। এর সরাসরি ফলাফল হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি। আবার এই মুদ্রাস্ফীতির ভার লাঘব করার জন্য সরকারকে ঋণের বিপরীতে উচ্চহারে সুদ নিতে হয়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি আরও বাড়ে এবং টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়।

বৈদেশিক ঋণ আমাদের অর্থনীতিতে কতটা অপ্রয়োজনীয় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো আমাদের দেশের অর্থ পাচারের আতিশয্য। আমরা বিদেশ থেকে যে পরিমাণ ঋণ আনি তার চেয়ে বেশি অর্থ বিদেশে পাচার করা হয়। অর্থাৎ, যে সুবিধাভোগী মহল এ ঋণের টাকায় সমৃদ্ধ হয়, তারা আবার এ অর্থ ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে বিদেশে পাচার করে দেয়। সুতরাং, বিদেশ থেকে আসা ঋণের টাকা বিদেশেই চলে যাচ্ছে। আর এ ঋণের ভারবহন করতে হচ্ছে এদেশের ১৬ কোটি মানুষকে। সাধারণত একটি সরকারের মেয়াদ শেষ হলে সে সরকারের আমলে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীটি সরকারের মেয়াদের শেষদিকে বিদেশে অর্থ-সম্পদ সরিয়ে নেয়। এছাড়া পরজীবী ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা সর্বদাই অর্থ সরিয়ে নেয়ার কাজে ব্যাপৃত। এ বিপুল অর্থপাচার সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এম.এ. তাসলিম মন্তব্য করেন, "উন্নত বিশ্বও এখন গরিব দেশ থেকে অর্থ-সম্পদ স্থানান্তর করতে নানাভাবে উৎসাহ জোগায়। একটা বাড়ি কিনলে বা বিপুল

পরিমাণ বিনিয়োগ করলেই স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দেয়া হয়। তাই যাঁরা অভিবাসী হচ্ছেন তাঁরাও অর্থ সরিয়ে নিচ্ছেন। যেহেতু বাংলাদেশ থেকে বৈধ পথে বড় অঙ্কের অর্থ-সম্পদ অন্যত্র স্থানান্তর করা যায় না, সেহেতু অবৈধ পথে স্থানান্তর বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে সব যে কালো টাকা, তা নয়। বৈধ আয়ও অবৈধ পথে চলে যাচ্ছে।"[২৩] অতএব, কালো বা সাদা যেকোনো অর্থই বিদেশী প্রভুদের সাহায্যে নিবেদিত হচ্ছে। তাই আপাতদৃষ্টিতে যে অর্থনীতিকে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বলে মনে হয়, তা প্রকৃতপক্ষে উন্নত বিশ্বকে সহায়তা দানেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমাদের করণীয়

বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা এখন দাতাদের ফর্মুলায় বৈষম্যমূলক পথে জিডিপি অর্জনের মাধ্যমে দেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার স্বপ্নে বিভোর। গণমানুষের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্ক বিবর্জিত এ জিডিপির হিসেবটিও আমাদের বোঝা দরকার। প্রচলিত জিডিপি হিসাব পদ্ধতি পুঁজিবাদী অর্থনীতি বা বাজার অর্থনীতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তৎপরতাকে হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে না। আবার অনেক খরচ আছে যেগুলো জিডিপি হিসাবের সময় বিবেচনা করা হয় না। যেসব অর্থনৈতিক তৎপরতা অর্থনীতিতে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, মুনাফা, মুদ্রা সরবরাহকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, কিন্তু জিডিপিতে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত হয় না তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'কালো অর্থনীতি' বলে পরিচিত গোপন, অপরাধমূলক বে-আইনী অর্থনীতি।[২৪]

এ ধরনের অসঙ্গতিপূর্ণ ধনিক কল্যাণে নিবেদিত জিডিপি বাংলাদেশে দারিদ্র ও বৈষম্য আরও বাড়িয়ে তুলছে। পক্ষান্তরে, আমরা যদি হুগো চাভেজের ভেনিজুয়েলার দিকে তাকাই, ১৯৯৯ সালে সেখানে জিডিপির পরিমাণ ছিল নয় হাজার ১০০ কোটি (৯১ বিলিয়ন) ডলার। ২০১১ সালে তা বেড়ে হয় ৩২ হাজার ৮০০ কোটি (৩২৮ বিলিয়ন) ডলার।[২৫] তাছাড়া চাভেজের উদ্যোগে সামাজিক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের ফলে দেশটির দরিদ্র জনগোষ্ঠী লাভবান হয়েছে। এ ধরনের প্রকৃত দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধির দিকেই বাংলাদেশকে এগোনো উচিত। এজন্য প্রয়োজন বিশ্বব্যাংক আইএমএফ-এর বাতলানো পথে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা পরিহার করা। দাতগোষ্ঠীর পরামর্শ অনুযায়ী Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) বাংলাদেশের জন্য অকার্যকর ও অপ্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব, দেশের জিডিপিতে মাত্র দুই শতাংশ অবদান রাখা এই বৈদেশিক

সাহায্যের জন্য দাতা সংস্থা ও দেশগুলোর বাগাড়ম্বরপূর্ণ উপদেশ আমাদের দেশের অর্থনীতিতে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া তারা সাহায্যের নামে যে ঋণের দুষ্টচক্র সৃষ্টি করে তা থেকে বেরিয়ে আসাই আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। আবার ঋণের দুষ্টচক্রের একটি অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে অসহনীয় মুদ্রাস্ফীতি। এ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে অর্থনৈতিক ঝুঁকির সম্মুখীন। কিন্তু এ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বেশি সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও অনেক সময় শ্লথ হয়ে পড়ে। তাই মুদ্রার মান স্থিতিশীল করা দেশের অর্থনীতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। কারণ মালয়েশিয়া এ পদক্ষেপ গ্রহণ করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। সম্প্রতি ইরানও অর্থনৈতিক সংকট এড়াতে মুদ্রাকে স্থিতিশীল করেছে। এ দৃষ্টান্তগুলো বাংলাদেশের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে।

অধিক প্রান্তিকীকরণের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় পরিমণ্ডলেই ব্যাপকভাবে শ্রেণী বৈষম্যের শিকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার হওয়া সত্ত্বেও সেখানেই বাংলাদেশকে সবচেয়ে উচ্চমাত্রার শুল্ক দিতে হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোসহ বিশ্বের অনেক দেশেই শুল্ক সুবিধা পাওয়ার পরেও আমরা সেসব জায়গায় বাজার তৈরি করছি না, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক বাজারনীতিকেই গ্রহণ করছি। এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধি করে অশুল্ক বাণিজ্য বাধা অপসারণের মাধ্যমে আঞ্চলিক বাণিজ্য বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। এমনকি বিশ্বব্যাংকও বলেছে, দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক বাণিজ্য বাধা দূর হলে বাংলাদেশ বেশি লাভবান হবে। আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমেই ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো ও সম্প্রতি লাতিন আমেরিকার দেশগুলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। তাছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শুল্কমুক্ত সুবিধা নিশ্চিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বাজার সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে। অধনবাদী পথেও অর্থনীতির বিকাশের চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে চীন। বিশ্বমন্দার সময়কালেও চীন রেকর্ড পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করেছে। এতে দেশটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধিও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। সম্প্রতি কঠোর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখেও ইরান বেশকিছু সুসংহত পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে। এ পদক্ষেপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বিলাসবহুল গাড়ি ও মুঠোফোন আমদানি নিষিদ্ধকরণ, অর্থনীতি সচল রাখতে স্বর্ণ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, ছয়

হাজার কোটি মার্কিন ডলারেরও অধিক পরিমাণ অর্থ রিজার্ভ রাখা প্রভৃতি। এসব পদক্ষেপ বাংলাদেশের জন্য সবসময়ই অনুসরণীয়। আর অভ্যন্তরীণ শ্রেণী বৈষম্য কমিয়ে আনতে বাংলাদেশকে অবশ্যই সাম্যভিত্তিক করনীতি প্রবর্তন, সত্যিকার দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, এনজিওভিত্তিক কর্মকাণ্ড কমিয়ে এনে সেবাখাতকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা, ন্যূনতম একটি সন্তোষজনক মজুরি হার নির্ধারণ, মানি লন্ডারিং এর প্রবণতা দূর করা প্রভৃতি ফলপ্রসূ অর্থনৈতিক কর্মসূচি হাতে নিতে হবে।

মানব উন্নয়নে দূরবস্থা

নব্য-উদারতাবাদী মডেলে মানব-উন্নয়ন মানে রাষ্ট্রের অধীনে মানব-সেবা কর্মসূচি শিথিল করে তাকে বেসরকারি এনজিওগুলোর হাতে তুলে দেয়া। এই ধারার অন্যতম অনুসারী বাংলাদেশেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকরণের প্রকোপ লক্ষ্যণীয়। ক্ষমতাসীন মহলের সক্রিয় ভূমিকা ও তাদের দাতা, প্রভুদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে দিন দিন বাজারীকরণের পথে যাচ্ছে। সুতরাং, ক্রয়ক্ষমতার অভাবে নিম্নবিত্তরা পিছিয়ে পড়ছে। কারণ বৈষম্যমূলক বাজারব্যবস্থায় সকলের প্রবেশাধিকার নেই। নব্য-উদারপন্থী দর্শন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবার পরিবর্তে তৈরি করেছে ধনীদের জন্য কসমেটিক সার্জারির হাসপাতাল। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী রয়ে গেছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। দেশ পরিচালনা কিংবা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণে এদেশের শাসকগোষ্ঠী যেমন বিদেশি প্রভু ও তাদের স্বীকৃত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ওপর নির্ভরশীল, তেমনি মানব উন্নয়ন খাতও তুলে দেয়া হয়েছে বিদেশি অর্থ-সাহায্যপুষ্ট এনজিওগুলোর হাতে।

পুঁজিবাদী বিশ্ব কখনোই গণমানুষের উন্নয়ন চায় না। এ কারণে এনজিওর মাধ্যমে ব্যক্তি খাতে সেবামূলক কাজগুলো তুলে দিয়ে শ্রেণীবৈষম্য টিকিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করে। কখনো কখনো এসব সংস্থার আয় বৃদ্ধিতে অনুন্নত বিশ্বের অনাহার, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি প্রচারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেসব দেশে উদারনৈতিক গণতন্ত্র রয়েছে, তারাও তাদের ত্রাণ ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে আন্তর্জাতিক পুঁজির ক্রিয়ার অনুগত রাখতে তৎপর। তাই গণতান্ত্রিক চেতনার পরিবর্তে এনজিওগুলোতে ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য লক্ষণীয়। সেরকম একজন ব্যক্তিত্ব গ্রামীণ ব্যাংকের ডঃ মোঃ

ইউনুস। দেশের চেয়ে মার্কিনিদের কাছেই তিনি অধিক জনপ্রিয়। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডি. মজীনা এক সাক্ষাৎকারে গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "..... গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই উঁচু। আমার এখানে কেউ এলেও আমি তাদের ব্যাংকের কার্যক্রম পরিদর্শনে নিয়ে যাই। কারণ আমি দেখাতে চাই যে, বাংলাদেশীরা নিজেরাই নিজেদের উন্নতির চেষ্টা করছে। জীবন ও মানুষের উন্নয়ন সম্পর্কে গ্রামীণের যে দর্শন তাকে খুবই পছন্দ করি। গ্রামীণ শুধু ক্ষুদ্রঋণের বিষয় নয়, আরও বড় কিছু। এটা এক ধরনের জীবন পদ্ধতি, এক ধরনের আশা জাগানিয়া বিষয়, এটা নিজের দায়িত্ব নিজে গ্রহণের একটা ধারণা। এ ধরনের একটা প্রতিষ্ঠান টিকে থাকুক এবং কাজ করে যাক, এটা যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাশা। কারণ ৮৪ লাখের বেশি মানুষ, যাদের মধ্যে ৮০ লাখই নারী, তাদের ক্ষমতায়নে গ্রামীণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ফলে আমরা চাই যে এ প্রতিষ্ঠান কার্যকরভাবে টিকে থাকুক।..."[২৬] অথচ বাংলাদেশের বহু গবেষক তাদের গবেষণায় গ্রামীণ ব্যাংকের শোষণমূলক চরিত্র তুলে ধরেছেন।

২০০৭ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত এক সমীক্ষার মাধ্যমে কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ ও অন্যরা ক্ষুদ্রঋণের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করে দেখেছেন, তাদের সমীক্ষাধীন অঞ্চলগুলোতে শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশি উত্তরদাতা কিস্তি শোধ করতে অক্ষম। এদের মধ্যে শতকরা ৭২.৩ ভাগ উচ্চ সুদে মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে কিস্তি পরিশোধ করেছে এবং শতকরা ১০ ভাগ নিজের ছাগল বা অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করে কিস্তি শোধ করতে বাধ্য হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ক্ষুদ্র ঋণ মডেলের অন্যতম দাবি হলেও এই সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, গৃহীত ঋণের ওপর শতকরা মাত্র ১০ ভাগ নারী ঋণগ্রহীতার নিয়ন্ত্রণ থাকে, শতকরা ৯০ ভাগ নারীকেই ঋণের টাকা তুলে দিতে হয় স্বামী, ভাই বা অন্য কোনো সদস্যের হাতে। ক্ষুদ্রঋণ এখন অনেকক্ষেত্রে যৌতুকের বিকল্প। এর ফলে শতকরা ৮২ ভাগ উত্তরদাতা (নারী) জানিয়েছেন, ঋণগ্রহণ শুরুর পর থেকে যৌতুকের চাপ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীরা ১৯৯৬, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মোট ১৫টি গ্রামের ওপর সমীক্ষা চালিয়েছে। এসব সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা মাত্র ৫ থেকে ৯ ভাগ ঋণগ্রহীতা এই ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছে। শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ ঋণগ্রহীতার অবস্থা একইরকম আছে, কিন্তু তাদের অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছে। শতকরা ৪০ থেকে ৪২ ভাগের

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থার অবনতি ঘটেছে। যাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে তাদের অধিকাংশের আয়ের অন্যান্য উৎস ছিল। নৃবিজ্ঞানী আমিনুর রহমান তাঁর গবেষণায় দেখেছেন, ঋণগ্রহীতারা অধিকাংশই নারী হওয়া সত্ত্বেও ঋণ আদায় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অধিকাংশই পুরুষ। এর কারণ হিসেবে ব্যাংক কর্মকর্তারাই বলেছেন, 'কিস্তি আদায় করার ক্ষেত্রে মেয়েরা যথেষ্ট শক্ত হতে পারে না বলে পুরুষদেরই এ কাজে রাখা হয়।'[২৭]

এতসব শোষণমূলক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরেও গ্রামীণ ব্যাংকের একনিষ্ঠ সমর্থক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার পক্ষে সাফাই গেয়েই চলেছে। বাংলাদেশের সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি. মাইলাম এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "... ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে আমি যুক্তরাষ্ট্রে কোনো সমালোচনা দেখিনি। তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিবিদদের আমি এ নিয়ে সমালোচনা করতে দেখেছি। কিন্তু আমি মনে করি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্তিপ্রসূত।"[২৮] অথচ গ্রামীণ ব্যাংকের নিজস্ব তথ্যই এ দাবির ভ্রান্তি নিশ্চিত করে। তাদের তথ্য অনুযায়ী, এ ব্যাংকের শতকরা ৮১.৪০ ভাগ শাখা মুনাফা অর্জন করেছে, শতকরা ৭৪.৩৭ ভাগ শাখা একশভাগ ঋণ আদায় করছে। কিন্তু ঋণগ্রহীতারা দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠে এসেছে এরকম শাখার শতকরা হার ২ ভাগের সামান্য উপরে।[২৯] আবার যদিও ক্ষুদ্রঋণ পরিশোধের হার ৯৮ ভাগ বলে স্বীকৃত, কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি অপ্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, নতুন ঋণ দিয়ে পুরনো কিস্তি পরিশোধ করার হিসাব বাদ দিলে ক্ষুদ্র ঋণ পরিশোধের হার শতকরা ৬০ ভাগেরও কম। বরং, একের পর এক ঋণের বোঝা চাপানোয় অনেকেই গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি দুর্যোগ কবলিত মানুষের অসহায়ত্বকে পুঁজি করেও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবসা কার্যকরী ছিল। একশন এইডের গবেষণায় দেখা গেছে, ব্র্যাক, আশা ও গ্রামীণ ব্যাংকসহ ৪২টি ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা সিডরে আঘাতপ্রাপ্ত এলাকায় ১৫ লাখ মানুষকে ১ হাজার ২ শ' কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, ঋণের কিস্তি পরিশোধের চাপ এতই প্রবল ছিল যে, অনেকেই প্রাপ্ত রিলিফ সামগ্রী, সরকার প্রদত্ত গৃহনির্মাণ সুবিধা বিক্রি করে কিস্তি শোধ করেছেন। অনেকে নতুন ঋণ নিয়ে পুরনো কিস্তি শোধ করেছেন। এছাড়া সমাজবিজ্ঞানী লামিয়া করিম নাকছাবি তার গবেষণায় মুরগি, ঘরের টিন, আসবাবপত্র বিক্রি করে ঋণের কিস্তি পরিশোধের একাধিক উদাহরণ দিয়েছেন। এ ধরনের বহু ঘটনার সাক্ষী বহু গবেষক ও সাংবাদিক, যার অল্পই প্রকাশিত হয়।[৩০]

বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিওগুলোর মতো গ্রামীণ মহাজনেরাও দরিদ্র শোষণে কম যান না। ২৮ নভেম্বর, ২০১২ প্রথম আলোর সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, রাজশাহী শহরে মহাজনেরা ১০০ টাকায় সাত দিনে সুদ নেন ১০ টাকা। এতে বার্ষিক সুদের হার দাঁড়ায় ৫২১ টাকা। এজন্য এসব কথিত মহাজন নিজ অর্থও বিনিয়োগ করেন না। তাঁরা বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করছেন। মহাজনি ঋণের সুদের হার থেকে এসব সংস্থার সুদের হার অনেক কম। ফলে একদিকে গ্রহীতারা কঠিন ঋণচক্রে বাধা পড়ছেন, অন্যদিকে মহাজনেরা মোটা অঙ্কের মুনাফা হাতিয়ে নিচ্ছেন। সুতরাং, এদেশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যকে পুঁজি করে দেশি-বিদেশি সুবিধাভোগীরা মুনাফা অর্জনে তৎপর। এটাই পুঁজিবাদের শোষণমূলক কাঠামোর মূল ধর্ম। এখানে মানব উন্নয়ন বলতে বোঝায় গুটিকয়েক মানুষের বিকাশ ও প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা। বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে পেছনে ঠেলে বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখাই সাম্রাজ্যবাদীদের মূলনীতি। তাই তৃতীয় বিশ্বের যে সরকারই জনকল্যাণে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদেরই বিরুদ্ধাচরণ করেছে। বাংলাদেশের মুৎসুদ্দি শাসকগোষ্ঠী সর্বদাই বিদেশি প্রভুদের তৃপ্ত রাখতে মানব উন্নয়নে নির্লিপ্ত থেকেছে। ফলে দাতাদের পরামর্শমতো মানব উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা দিন দিন কমে আসছে।

দারিদ্র নিয়ে যে ব্যবসার বিপুল আয়োজন ঘটেছে, শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেও এক ধরনের বিপণন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। নব্য-উদারতাবাদী উন্নয়ন দর্শনের মূলকথা হলো, সর্বজন প্রতিষ্ঠান ও সম্পদকে দ্রূত ব্যক্তিমালিকানাধীন মুনাফাকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। প্রান্তস্থ দেশগুলোতে এই নীতি বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ সদা সক্রিয়। তাদের বিভিন্ন ঋণদান কর্মসূচিতে যেসব শর্ত জুড়ে দেয়া হয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব কমিয়ে আনা। এসব শর্ত পূরণ করতে গিয়ে এদেশের স্কুল-কলেজ পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা কার্যক্রমে অব্যাহতভাবে আনুষ্ঠানিক বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া চলেছে। এ কারণে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ব পার করেই ষাট শতাংশেরও অধিক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। আবার, মাধ্যমিক পর্যায়ে এডিবির প্রকল্পের বাস্তবায়ন ঘটায় মাধ্যমিক শিক্ষার সিংহভাগ দায়ভার এখন বেসরকারি স্কুলগুলোর। অবহেলার শিকার হওয়ায় সেগুলোতেও ধ্বস নেমেছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও বেসরকারি কলেজগুলোর ওপর নির্ভরশীল ৮৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা তেমন না

বাড়লেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে উচ্চহারে। সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাংক সমর্থিত শিক্ষানীতি গ্রহণ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ২০ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ বাণিজ্যিকিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাজার অর্থনীতির দাপটে আমাদের শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, পানীয়–সবই বহুজাতিক পুঁজির নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। ফলে মানব উন্নয়নের খাতগুলো সেবার পরিবর্তে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছে। দারিদ্রকবলিত এদেশে দারিদ্রকে পুঁজি করেও এনজিওগুলোর রমরমা ব্যবসা শুরু হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসের গতিও হয়ে পড়েছে মন্থর। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, শিক্ষিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যমুক্ত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের সম্পৃক্ততা দিন দিন কমে আসায় এখনও দেশের ৪০ শতাংশ মানুষই নিরক্ষর রয়ে গেছে। বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আরও পিছিয়ে দিচ্ছে। ঢালাও বেসরকারিকরণের কারণে শিক্ষা বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় সমাজে কর্পোরেট দাসত্বের সংস্কৃতি বিকশিত হচ্ছে। অর্থাৎ, শিক্ষালাভ হয়ে উঠেছে মুনাফা লাভের হাতিয়ার। জাতীয় অগ্রগতি অর্জনে সুস্থ দেহ ও মনের বিকাশ যে শিক্ষা, সে শিক্ষার ধারণা হারাতে বসেছে। তাই সামাজিক জীবনে ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রভাব বেড়ে গিয়ে দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে। এজন্য খাদ্যপণ্য ও ওষুধশিল্পের মতো সেবামূলক দ্রব্যকে কেন্দ্র করেও অসাধু ভেজালসমৃদ্ধ ব্যবসা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাণিজ্যিক উদ্যোগগুলো বেড়ে যাচ্ছে এবং মানব উন্নয়নে দুর্গতি দেখা দিচ্ছে।

আমাদের করণীয়

সাম্রাজ্যবাদীদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে কিউবার অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল কাস্ত্রো তার দেশের সকল অঞ্চলে সকল মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে পেরেছেন। সেদেশে শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা হয়েছে। কিউবায় মানুষের গড় আয়ুও বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক দুর্যোগকালেও সেদেশের কোনো স্কুল বন্ধ হয়নি। কোনো শিক্ষক কর্মচ্যুত হননি। এছাড়া কিউবা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষ চিকিৎসক তৈরি করছে। পরবর্তীতে একইভাবে কাস্ত্রোর অনুসারী ভেনিজুয়েলার সদ্যপ্রয়াত বিপ্লবী নেতা হুগো চাভেজ নিজ দেশের মানব উন্নয়নে স্বল্প সময়ে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছেন। সেন্টার ফর ইকোনমিক এ্যান্ড পলিসি রিসার্চের পরিসংখ্যান

অনুযায়ী, চাভেজের ১৪ বছরের শাসনামলে ভেনিজুয়েলার দারিদ্র অর্ধেকের বেশি কমেছে। দারিদ্র দূর করার পাশাপাশি তিনি জনগণের সুস্বাস্থ্যের ও সুশিক্ষার দিকেও মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁর সরকার বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা চালু করেছেন। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক থেকে পি-এইচ.ডি. পর্যন্ত অবৈতনিক করেছেন। প্রত্যন্ত ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। সবার কাছে শিক্ষাসেবা পৌঁছে দিতে ভ্রাম্যমান শিক্ষাব্যবস্থাও চালু করেন।[৩১]

কিউবা ও ভেনিজুয়েলার মানব উন্নয়নে বিপুল সাফল্য প্রমাণ করে যে, সরকারের সদিচ্ছা থাকলে দারিদ্র দূর করে জনগণের জন্য সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার বিদেশি সংস্থাগুলোর পরামর্শ মোতাবেক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে ক্রমাগত বাজারীকরণ করে চলেছে। সরকারের এ বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলেছে। বিশ্বব্যাংকের ২০ বছরব্যাপী কৌশলপত্র মেনে নিয়ে যে শিক্ষানীতি সম্প্রতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার তা বাস্তবায়িত হলে উচ্চশিক্ষা কেবল ধনিক শ্রেণীর মাঝেই সীমিত হয়ে পড়বে। সুতরাং, দেশের শিক্ষা পরিস্থিতি আগামী দিনে আরও ভয়াবহ হয়ে পড়বে। দক্ষ জনশক্তির অভাবে জাতি মুখ থুবড়ে পড়বে। শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বাড়ানো ছাড়া এ বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব নয়। আর স্বাস্থ্যখাতে জনগণের কাছে সেবা পৌঁছে দিতেও বাংলাদেশকে আরও বহুদূর পথ পাড়ি দিতে হবে। সম্প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রী কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করে আন্তর্জাতিক প্রশংসা পাওয়ার দাবি করলেও দেশের ৬০ শতাংশ মানুষই স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে অসন্তুষ্ট। এক্ষেত্রেও চাভেজের নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে। তিনি রেডিও-টিভিতে প্রতি সপ্তাহে সরাসরি জনগণের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন। বস্তির স্বাস্থ্যসেবা বা গৃহায়ন কীভাবে চলবে? এসব ব্যাপারে যে কেউ ফোন করে প্রশ্ন বা মতামত দিতে পারতো। এভাবেই তৈরি হতো তাঁর নীতি ও কর্মসূচি।[৩২] এভাবে জনসম্পৃক্ততা ছাড়া জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ সফল হতে পারে না। সরকারকে তাই সরাসরি জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমেই স্বাস্থ্যনীতি কার্যকর করতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদী সামরিকায়ন

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা একটি সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এই যুদ্ধে জনগণ এবং পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ছিলেন একাত্ম ও অবিচ্ছেদ্য। সে সময়ে সামরিক বাহিনীর

সদস্যসহ পুরো দেশে মানুষের মধ্যে একটি নিপীড়নমুক্ত, শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্নই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পরেই শাসক শ্রেণী নিজ ক্ষমতার নতুন বৃত্ত প্রস্তুতকল্পে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে অধিক থেকে অধিকতর হারে সম্পৃক্ত হতে থাকে। বৈধ ও অবৈধ বাণিজ্য এবং লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে তাদের এই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। লুণ্ঠনজীবী এই শ্রেণীর জন্য তাই নিপীড়নকারী ব্যবস্থার পুরনো কাঠামোর প্রয়োজন পড়ে। ফলে বলপ্রয়োগের প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুলিশ, রক্ষীবাহিনী ও সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার প্রক্রিয়ার সূত্র ধরে একসময় সামরিক বাহিনী নিজেই ক্ষমতায় আবির্ভূত হয়।[৩৩] এরপর দুই দশকের বেশি সময় সামরিক বাহিনীকে গণতন্ত্র রক্ষা ও উন্নয়নের নামে সারাদেশে ব্যবহার করা হয়।

স্বৈরাচারী শাসনামলে বৃহৎ সামরিক আমলাদের সহযোগিতায় লুণ্ঠনকারীদের অবাধ বিকাশের কাজে যেভাবে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করা হয় তা একমাত্র ইন্দোনেশিয়া বা চিলির সঙ্গেই তুলনীয়। পরবর্তীতে স্বৈরাচারের পতন ঘটে প্রধান দুটো দল ক্ষমতায় আসলেও রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। বিগত তিন দশকে এদেশের অর্থনীতি, শ্রেণী ও সামাজিক শক্তির অনেক রকম পরিবর্তন ঘটলেও সমাজে শোষণ ও বঞ্চনার রক্ষাকবচ হিসেবে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। এই ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বলপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে রাখা হয়েছে। তাই শাসক শ্রেণী সামরিক বাহিনীকে শোষণ করে নিজেদের প্রয়োজনমতো তাকে ব্যবহার করেছে। সেই সঙ্গে বিগত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রবাহে নতুন কিছু উপাদানের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল শেয়ার মার্কেট ও বিশেষভাবে তেল-গ্যাসখাত। এই সময়কালে এদেশে মার্কিন সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এদেশের শাসকবর্গ গ্যাসখাতকে ২৩টি ব্লকে বিভক্ত করে বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থাগুলোর হাতে তুলে দেয়ার কাজ করেছে। বিভিন্ন গ্যাস চুক্তির বাস্তবায়ন ও নতুন নতুন আরও গ্যাস চুক্তির প্রেক্ষাপটেই এসেছে ‘সোফা’[*১] ও ‘হানা’[*][*২] ও পিসকোরের মতো সামরিক চুক্তিগুলো। এর মধ্যে বাংলাদেশে মার্কিনী কর্মকর্তাদের বাণিজ্যিক সফরও অনেক বেড়েছে। একইসঙ্গে বেড়েছে মার্কিন সেনাদের এদেশে আগমনের ব্যবস্থা, বেড়েছে মার্কিন সেনা কর্মকর্তাদের সফর। বলাই বাহুল্য যে, ঘাঁটি করার

---

[*]১ SOFA (Status of Forces Agreement)

[*]২ HANA (Humanitarian Assistance Needs Assessment)

চেয়ে সোফা এবং পিসকোর জাতীয় ব্যবস্থা মার্কিন বাহিনী ও পেন্টাগনের জন্য আরও সুবিধাজনক হয়। কারণ এসব চুক্তির বলে সমগ্র বাংলাদেশই তাদের বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর অন্ত:সারশূন্য অবস্থার কারণে বাংলাদেশের সামরিক খাত সরাসরি বৈশ্বিক সামরিক অর্থনীতি ও কৌশলের একটি অংশে পরিণত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের সামরিক, আধা সামরিক ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে বিশ্ব ও আঞ্চলিক প্রভুদের সামগ্রিক পরিকল্পনার অধীনস্থ একটি অংশমাত্র।[৩৪]

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অস্ত্রব্যবসাও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সামরিক ব্যয় বাড়াতে বাধ্য করে। লেনিন সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য পুঁজির রপ্তানি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, একচেটিয়ার যুগে একচেটিয়া কারবার আবার একচেটিয়া রাজনীতি প্রবর্তন করেছে। তাই প্রায়শই দেখা যায়, সাম্রাজ্যবাদী দেশটি যে দুর্বল দেশটিকে ঋণ প্রদান করছে, সেই ঋণের টাকা আবার সেই দেশকেই ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে যুদ্ধসামগ্রী বা যুদ্ধযান ক্রয়ের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের বিনিময়ে তাদের ওপর সামরিক বা বাণিজ্য চুক্তিও চাপানো হয়। সাম্প্রতিককালে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা সংলাপে বিভিন্ন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরের পাশাপাশি সমরাস্ত্র ক্রয়ের বিষয়টিও অগ্রাধিকার লাভ করেছে। এর আগে রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের বিপুল অঙ্কের সমরাস্ত্র ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয় যাকে অনেকেই অত্যন্ত বেপরোয়া বিনিময় বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়া কক্সবাজারের পেকুয়ায় লবণ চাষিদের জমি দখল করে বিপুলায়তনের সাবমেরিন ঘাঁটি তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সাবমেরিন ক্রয়ের পেছনে খরচ হবে বিপুল অর্থ। বিমানবাহিনীতে সংযুক্ত হয়েছে ১৬টি এফ-৭ বিজি-১ যুদ্ধবিমান ও তিনটি এম.আই-১৭১ এসএইচ হেলিকপ্টার। এসব বিমান ও কপ্টারের মূল্য এক হাজার ৮৮৩ কোটি টাকা।[৩৫] ইতোপূর্বে তথ্য-প্রযুক্তি সহযোগিতার নাম করে সম্পাদিত বিভিন্ন সামরিক চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সামরিক যন্ত্রপাতির অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। টিআইবির সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বাংলাদেশে সামরিক খাতে দুর্নীতির ঝুঁকি বেশি। সরকারিভাবে সমরাস্ত্র ক্রয়ের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে অস্ত্রক্রয়ও বিগত দুই দশকে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। অস্ত্র উৎপাদন, অস্ত্র পাচার ও অস্ত্র আমদানি ক্রমে লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র হচ্ছে এর ব্যবহারের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে। তাই কাটা রাইফেল, জর্দা বোমা, ককটেল ইত্যাদির উৎপাদন ও কেনা-বেচা এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুঁজির বিকাশ প্রবণতায় এ সামরিকীকরণের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে।

আমাদের করণীয়

যেদেশে শতকরা ৫০ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে মারা যায় ও বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে সেদেশের জন্য সামরিক বিলাসিতা নিতান্তই গরীবের ঘোড়ারোগের মতো। নিরাপত্তার অজুহাতে এদেশে যে সামরিকায়ন ঘটছে দেশ ও জনগণের স্বার্থের পরিবর্তে তা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের রক্ষক হয়ে উঠছে। জনগণের স্বার্থ সংরক্ষিত হতে পারে মানব উন্নয়নে অগ্রগতি অর্জনের মধ্য দিয়ে, সামরিক বিস্তারের মধ্য দিয়ে নয়। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে কিউবা। দেশটি সুদীর্ঘকাল ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হুমকি উপেক্ষা করে টিকে আছে মানব উন্নয়নের জোরে, সামরিক সরঞ্জাম বিস্তারের মাধ্যমে নয়। জনগণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হতে পারে দারিদ্র বিমোচন, সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে সাম্প্রতিককালের ভেনিজুয়েলা। চাভেজ সরকার সামাজিক খাতে জাতীয় বাজেটের ৪৩ শতাংশ ব্যয় করেছে। এর ফলে ভেনিজুয়েলা সাম্রাজ্যবাদীদের গ্রেট গেমের শিকারে পরিণত হয়নি। পরিণামে সেদেশে কোনো আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রই কার্যকর হয়নি। কারণ যেসব দেশে জনঅসন্তোষ বিদ্যমান, সেসব দেশেই সাম্রাজ্যবাদী গোয়েন্দা তৎপরতা সফলভাবে গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। সেসব দেশই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ক্রীড়ানকে পরিণত হয়। তাই পৃথিবীজুড়ে জ্বালানিসমৃদ্ধ এলাকাগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষ, ছাত্রবিক্ষোভ, অব্যাহত অস্থিতিশীলতা ও ভঙ্গুর অর্থনীতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একটি তেলসমৃদ্ধ দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভেনিজুয়েলায় এসব বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত, কেবল মানব উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যাপক সাফল্য অর্জনের জন্য। জনগণের মানবিক অধিকারগুলো সুনিশ্চিত করতে পারলে কোনো দেশেই আর গণঅসন্তোষ দেখা দেয় না, ফলে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রও নস্যাৎ হয়ে পড়ে। পৃথিবীর বুকে কিউবা ও ভেনিজুয়েলা সে দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এক ধরনের গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। এহেন পরিস্থিতির সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে মার্কিন স্বার্থ রক্ষা ও জ্বালানি খাতের বিদেশি তৎপরতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মার্কিনিদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সামরিক চুক্তি ও যৌথ সামরিক তথা নৌ-মহড়ার ঘটনা। এসমস্ত কিছু একই কার্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এশিয়া টাইমসে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে মাকিন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা টিম

হেইনম্যান লিখেছেন, “যুদ্ধোত্তর ইরাক-আফগানিস্তানে বিস্তর কেলেঙ্কারির পর যুক্তরাষ্ট্র এখন মিয়ানমারের দিকে নজর ফেলেছে। বিপুল ধ্বংসের বিনিময়ে পাওয়া শিক্ষা এবার তারা ফলাতে যাচ্ছে এখানে। .... যুক্তরাষ্ট্র উত্তরোত্তর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খেলায় জড়িয়ে যাচ্ছে...।”[৩৬] এই খেলারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে বাংলাদেশে সংঘটিত রামুর সহিংসতা। তাছাড়া পাশ্চাত্য রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রশ্নে বাংলাদেশকে যেভাবে চাপ প্রদান করছে তা-ও যুক্তরাষ্ট্রের এই খেলারই অংশবিশেষ। তাই বাংলাদেশকে এ গ্রেট গেমের ক্রীড়নকে পরিণত না হয়ে রোহিঙ্গা ইস্যুতে যেমন মানবিকতার পরিচয় দিতে হবে, তেমনি হতে হবে কৌশলী। জাতিসংঘ, আসিয়ানের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা ও ক্ষমতাধর যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার কাছে রোহিঙ্গা ইস্যুতে রাজনৈতিক সমর্থন ও তহবিল দাবি করতে হবে। সেইসঙ্গে তাদেরকে মিয়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগ করতেও তাগিদ দিতে হবে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কল্যাণে আরেকটি সামরিক প্রশিক্ষণ একাডেমি খোলা বাংলাদেশের জন্য কখনোই লাভজনক হবে না। মনে রাখা দরকার, এদেশে র‌্যাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই জঙ্গি তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। সুতরাং, এ ধরনের উদ্যোগ দেশের জন্য কখনোই মঙ্গল বয়ে আনবে না, বরং বিপদ ডেকে আনতে পারে।

বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে এক সংকটকাল অতিক্রম করছে। প্রশান্ত মহাসাগর তথা বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে বৈশ্বিক ষড়যন্ত্র ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এ ষড়যন্ত্রেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একের পর এক আত্মঘাতী সামরিক ও এদেশের সঙ্গে তাদের গোয়েন্দা সংশ্লিষ্টতা বাড়ানোর মাধ্যমে এদেশের শাসকগোষ্ঠী এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করেছে। বর্তমানে রাজনৈতিক অচলাবস্থাকে কেন্দ্র করে প্রধান দু'দলই বিদেশী দূতাবাসের শরণাপন্ন হচ্ছে। এটি দেশের সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদার প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা। সম্প্রতি বহুজাতিক তেল কোম্পানিগুলোকে দায়মুক্তি দেয়ার মতো নির্লজ্জ পদক্ষেপও নেয়া হচ্ছিল। অতীতেও বিদেশি তেল কোম্পানিগুলো বড় আকারের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সম্পদ ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে মুৎসুদ্দি শাসকগোষ্ঠীকে ঘুষ দিয়ে পার পেয়ে গেছে। বিভিন্ন রকম গণ-অসন্তোষ এখন মুৎসুদ্দি শাসকগোষ্ঠীর সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল নিয়েও নানা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সম্পদকে কেন্দ্র করে বহুজাতিক কর্পোরেশনের স্বার্থ রক্ষার জন্য যেসব যুদ্ধ ও সহিংসতা লক্ষ্য করা যায়, বাংলাদেশেও এখন সে বাস্তবতা পরিদৃশ্যমান। নব্য-উদারতাবাদ জাতি-রাষ্ট্রের মর্যাদাকে তুচ্ছ করে যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো আজ তার নির্মম শিকারে পরিণত হচ্ছে। ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক নিরাপত্তা সংলাপ ও ঘন ঘন মার্কিন সেনা কর্মকর্তাদের উপস্থিতি এ বাস্তবতারই স্বাক্ষর বহন করে।

তথ্যসূত্র

১) মইনুল ইসলাম, *পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ*, ঢাকা: সূচীপত্র, ২০০৬, পৃ. ৮৭।

২) আনু মুহাম্মদ, *বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল*, ঢাকা: প্রচিন্তা প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ৯৬-৯৭।

৩) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭-৯৮।

৪) আনু মুহাম্মদ, *বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিমুখ*, ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ৩৬।

৫) মইনুল ইসলাম, *পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ*, পৃ. ৭৭।

৬) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯।

৭) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০-৮১।

৮) বদরুদ্দীন উমর, *দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ১২।

৯) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।

১০) আনু মুহাম্মদ, *পুঁজির অন্তর্গত প্রবণতা: মানুষ সম্পদ প্রকৃতি*, ঢাকা: সংহতি প্রকাশন, ২০১০, পৃ. ১২।

১১) *দৈনিক প্রথম আলো*, "শেভরনের বিস্ফোরক ভর্তি জাহাজ আটক", ২০১৩, ১৯ জানুয়ারি: ২০।

১২) মইনুল ইসলাম, *পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ*, পৃ. ১০৬-১০৭।

১৩) বদরুদ্দীন উমর, *দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ*, পৃ. ১৫০-৫১।

১৪) মইনুল ইসলাম, *পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ*, পৃ. ১০৯-১১।

১৫) কামাল আহমেদ, "রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের যত মিল", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৩, ১৭ জানুয়ারি, ১০।

১৬) *দৈনিক প্রথম আলো*, " বেসরকারীকরণের পর অনেক তথ্যই আর পাওয়া যাচ্ছে না", ২০১২, ৮ আগস্ট: ১৫।

১৭) মইনুল ইসলাম, *পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ*, পৃ. ১১২।

১৮) রেহমান সোবহান, *বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার সংকট: বাংলাদেশের অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধাবলী*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ১৯।

১৯) আনু মুহাম্মদ, *বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল*, পৃ. ১১৭-১১৮।

২০) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১।

২১) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫-১২৭।

২২) মইনুল ইসলাম, *পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ*, পৃ. ১০৫-০৬।

২৩) আসজাদুল কিবরিয়া, "১০ বছরে সোয়া লাখ কোটি টাকা পাচার", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১২, ১৯ ডিসেম্বর, ০১।

২৪) আনু মুহাম্মদ, *অর্থশাস্ত্র পরিচয়*, ঢাকা: সংহতি প্রকাশন, ২০১০, পৃ. ১৮৫-৮৬।

২৫) *দৈনিক প্রথম আলো*, "চাভেজ অসম্পূর্ণ বিপ্লবের নায়ক!", ২০১২, ২ অক্টোবর: ১০।

২৬) ড্যান ডব্লিউ মজীনা, "যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ", *দৈনিক প্রথম আলো*, সাক্ষাৎকার ২০১২, ১৮ জুন, ১২।

২৭) আনু মুহাম্মদ, *পুঁজির অন্তর্গত প্রবণতা*, পৃ. ৩৫-৩৬।

২৮) উইলিয়াম বি মাইলাম, "কম নিরপেক্ষ পরিবেশে নির্বাচন মঙ্গলজনক হবে না", *দৈনিক প্রথম আলো*, সাক্ষাৎকার ২০১৩, ৩ মার্চ, ১০।

২৯) আনু মুহাম্মদ, *পুঁজির অন্তর্গত প্রবণতা*, পৃ. ৩৫।

৩০) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

৩১) *দৈনিক প্রথম আলো*, "স্বপ্নের নায়ক চাভেজ", ২০১৩, ৮ মার্চ: ১০।

৩২) ফারুক ওয়াসিফ, "মৃত্যুতেও তুমি জয়ী হুগো চাভেজ", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৩, ৭ মার্চ, ১০।

৩৩) আনু মুহাম্মদ, *বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিমুখ*, পৃ. ১৪৫-৪৭।

৩৪) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮-৫১।

৩৫) *দৈনিক প্রথম আলো*, "শান্তিরক্ষা বাহিনীতে দেশের ভাবমূর্তি বাড়বে: প্রধানমন্ত্রী", ২০১৩, ১০ এপ্রিল: ১৬।

৩৬) টিম হেইনমান, অনু. ফারুক ওয়াসিফ, "মিয়ানমারের জাতিগত দ্বন্দ্ব ও যুক্তরাষ্ট্র", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১২, ১৩ অক্টোবর, ১২।

তৃতীয় অধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদের সমরবাদী নীতি

লেনিন দেখিয়েছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী যুগে পুঁজিবাদের জোয়াল আরও নিপীড়নমূলক হয়ে ওঠে। এ সময়ে ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলোতে বৈপ্লবিক সংকট আরও তীব্র হয়ে ওঠে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উপাদানগুলো ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিযুদ্ধের উপাদানগুলো সঞ্চিত হতে থাকে। বিদেশী বাজার দখল, মূলধন রফতানি করার মতো উপযোগী ক্ষেত্র, উপনিবেশ স্থাপন ও কাঁচামালের উৎস দেশগুলোতে প্রভাব বিস্তারের জন্য এবং বিশ্বকে ভাগাভাগি করে নেয়ার উদ্দেশ্যে প্রায়শই সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, পুঁজিবাদের অসম বিকাশই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জনক। কারণ এ সময়ে পুঁজিবাদের অন্তর্গত দ্বন্দ্বগুলো বিশেষ তীব্র হয়ে ওঠে। লেনিনের তত্ত্বকে সত্য প্রমাণিত করে যুদ্ধ প্রস্তুতি বা সমরাস্ত্র খাতের অব্যাহত বিকাশ সাম্প্রতিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির অপরিহার্য জৈবিক অঙ্গে পরিণত হয়েছে। অর্থনীতি ও রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্যই আজকের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধমুখী প্রবণতা তীব্রতর হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ অর্থনীতি, সমরাস্ত্র উৎপাদন, সামরিক ঘাঁটি, দেশে দেশে সমরসজ্জা, উত্তেজনা–এসব অর্থনীতির অন্যান্য খাতগুলোর টিকে থাকা ও বিকশিত হবার অন্যতম অবলম্বন হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যুদ্ধ।

বিগত এক শতাব্দী ধরে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার অধীনে বৈশ্বিক পরিসরে বেশকিছু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। প্রতিটি যুদ্ধেই একটি শক্তিধর রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ বিশ্বশক্তিটি সর্বজনীন নিরাপত্তা, বিশ্ব ব্যবস্থাপনাসহ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রধান নিয়ন্ত্রক। সকল ক্ষমতাধর বিশ্বশক্তিই আবার ক্ষমতাধর সফল জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে এবং এ জাতি-রাষ্ট্রটিই বিবদমান বিশ্বব্যবস্থায় সবচেয়ে আধিপত্যবিস্তারকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রতিটি বিশ্বব্যবস্থার দীর্ঘ পরিক্রমা সমাপ্ত হয়েছে কোনো যুদ্ধের মাধ্যমে।[১] সর্বশেষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের স্থলে প্রধান পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে এবং এ সময়ে বিশ্বের অর্থনৈতিক কাঠামোতে বেশকিছু পরিবর্তন সূচিত হয়। বর্তমান অধ্যায়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমরবাদী চরিত্র বিশ্লেষণের একটি প্রয়াস নেয়া হবে। তবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধংদেহী নীতি বোঝার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সম্পর্কে ধরণা লাভ করা একান্ত প্রয়োজন, সেই সঙ্গে অন্যান্য যুদ্ধের সঙ্গে এর পার্থক্য বোঝাটাও জরুরী।

লেনিন প্রদত্ত যুদ্ধের শ্রেণীবিভাগ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ

মার্কসের শ্রেণী দর্শনের আলোকে লেনিন দেখান যে, যুদ্ধের সঙ্গে শ্রেণী বৈষম্যের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর মতে, শ্রেণীগুলো অবলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব নয়। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, মার্কসবাদীরা যুদ্ধকে ঐতিহাসিকভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে লিখিত তাঁর æSocialism and War”[২] প্রবন্ধে তিনি বলেন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সরকার এবং শাসক শ্রেণী উপনিবেশ বিস্তারের কৌশল গ্রহণ করেছে। এর মধ্য দিয়ে তারা অন্যান্য জাতিসমূহকে শোষণ করবে এবং শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করবে। এর বিপরীতে বিগত কয়েক দশক ধরে নিপীড়িত দেশগুলোর লক্ষ লক্ষ মানুষকে মহাশক্তিগুলোর শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তির জন্য লড়াই করতে দেখা যাচ্ছে। তিনি মনে করেন, বিগত দিনে সংঘটিত বহুসংখ্যক যুদ্ধের ভয়াবহতা, নৃশংসতা, আর্থিক দৈন্যতা ও দুঃখ-কষ্ট থাকা সত্ত্বেও ক্ষতিকর ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তা মানবিকতার উন্নয়ন সাধনে ভূমিকা রেখেছে। ঐতিহাসিকতার প্রেক্ষিতে লেনিন তাই যুদ্ধকে তিনভাগে ভাগ করেছেন । এগুলো হচ্ছে: সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, বেসামরিক যুদ্ধ ও জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ।[৩]

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলতে লেনিন সেই যুদ্ধকে বুঝিয়েছেন যা অন্যান্য জাতিসমূহকে শাসন ও শোষণের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক সংঘটিত হয় কিংবা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যখন এ বিশ্বকে পুনর্বণ্টনের জন্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অপরদিকে, বেসামরিক যুদ্ধ হচ্ছে সেই যুদ্ধ যেখানে কোনো শোষিত শ্রেণী (দাস, ভূমিদাস, শ্রমিক) কোনো শোষক শ্রেণীর (দাসমালিক, সামন্তপ্রভু, পুঁজিপতি) বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আর জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শোষক বা ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত শোষিত উপনিবেশের জনগোষ্ঠীর লড়াই। এখানে লক্ষণীয় যে, প্রতিটি যুদ্ধই একটি শ্রেণীযুদ্ধ। মানবসমাজে শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে ব্যক্তিমালিকানাধীন উৎপাদনব্যবস্থার কারণে। পরস্পরবিরোধী শ্রেণীর উপস্থিতির জন্যই সমাজ শোষক ও শোষিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এর ফলস্বরূপ দেখা দিচ্ছে অপ্রতিরোধ্য শ্রেণীসংগ্রাম যা বিভিন্ন যুদ্ধের জন্ম দিচ্ছে। তাই শ্রেণীসংঘাতকে বাদ দিয়ে যুদ্ধগুলোকে

মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। যেকোনো যুদ্ধেই অবর্ণনীয় ত্যাগ ও অপরিসীম দু:খ কষ্ট বরণ করে নিতে হয় বলে সাধারণভাবে শ্রমজীবী মানুষ যুদ্ধবিরোধী। কিন্তু, যুদ্ধোন্মত্ত শোষক শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করার মাধ্যমেই যুদ্ধের চূড়ান্ত অবলুপ্তি সম্ভব । সুতরাং, আজকের দিনের সকল যুদ্ধের কারণ পুঁজিবাদকে সমগ্র পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করতে পারলেই চিরতরে শ্রেণীসংঘাত বিদূরিত হবে এবং আর কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হবে না।[৪]

উপরে বর্ণিত ত্রিবিধ যুদ্ধের মধ্যে বেসামরিক ও জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ গণমানুষের দাবির প্রেক্ষিতে সংঘটিত হয়। তারা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয় বলে এ যুদ্ধের কারণ পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত । কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা অপর জাতির সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য কিংবা অপরাপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সঙ্গে সম্পদের দখলদারিত্বকে কেন্দ্র করে যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তা সম্পূর্ণ অন্যায্য ও অনৈতিক। অতএব এ তিন ধরনের যুদ্ধকে আবার তাদের প্রকৃতি বিচারে ন্যায় ও অন্যায়-এ দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যখন মানুষ কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দাসত্বের বিরুদ্ধে নিজ জাতির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে কিংবা ঔপনিবেশিক নির্ভরতা ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে সে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ অবশ্যই ন্যায়যুদ্ধ। আরেক ধরনের ন্যায়যুদ্ধ হচ্ছে বেসামরিক যুদ্ধ যেখানে প্রলেতারিয়েতরা পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অন্যায় যুদ্ধ। কারণ এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় কাঁচামালের উৎস ও বাজার দখলকে কেন্দ্র করে। তারা কখনো জনগণের রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে শোষণের সামগ্রী বা লক্ষ্যবস্তু কৌশলে অর্জন করার জন্য নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।[৫] প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এ ধরনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দৃষ্টান্ত।

লেনিন মনে করেন, ন্যায়যুদ্ধগুলো প্রগতিশীল ও বিপ্লবাত্মক আর অন্যায় যুদ্ধগুলো পশ্চাৎমুখী ও প্রতিক্রিয়াশীল। তাই একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র শুধুমাত্র ন্যায়যুদ্ধকে সমর্থন করবে। তারপরেও অন্যায় যুদ্ধের উদগাতা সাম্রাজ্যবাদীরা কাঁচামাল ও বাজার দখলের জন্য একের পর এক যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে। এটাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রকৃতি। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কারণ নিহিত আছে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের মাঝে। এজন্য সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, বিশ্ব আধিপত্য রক্ষার সংগ্রামই সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক সারধর্ম।[৬]

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমরবাদী নীতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমে পুঁজিবাদী বিশ্বের প্রধান সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষপ্রান্তে পরাজিত ও আত্মসমর্পণে আগ্রহী জাপানের দুটি শহরে পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ অভিযান শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন সরকার ৮০টি দেশের ২৩ লাখের বেশি সৈন্য ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষীকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করতে সামরিক সাহায্য হিসেবে ২০ হাজার কোটি ডলারের বেশি প্রদান করেছে। দেশের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদবিরোধী বিদ্রোহ থেকে স্থানীয় শাসকচক্র ও বহুজাতিক বিনিয়োগকারীদের রক্ষার জন্য এসব দেশকে এই বিপুল পরিমাণ সাহায্য দেয়া হয়েছে। এই সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ইতিহাসের সর্বাধিক কুখ্যাত সামরিক স্বৈরতন্ত্রগুলো। এসব দেশ হচ্ছে তুরস্ক, জায়ারে, শাদ, পাকিস্তান, মরক্কো, ইন্দোনেশিয়া, হন্ডুরাস, পেরু, কলম্বিয়া, এল সালভাদর, হাইতি, কিউবা (বাতিস্তার আমলে), ইরান (শাহর আমলে), ফিলিপাইন (মার্কোসের আমলে), পর্তুগাল (সালাজারের আমলে) ইত্যাদি। এসব দেশে রাজনৈতিক ভিন্নমত পোষণের জন্য নাগরিকদের ওপর হত্যা-নির্যাতন চালানো হয়।[৭]

ডকট্রিন আকারে সমরবাদ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা যেসব সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করে সাধারণত সেগুলো কোনো ডকট্রিন দ্বারা আদর্শায়িত করে। তাই তাদের ডকট্রিনগুলো পরীক্ষা করলেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস ও বর্তমান লক্ষ্য বোঝা সহজ হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই তারা তৈরি করে মনরো ডকট্রিন। তারা আমেরিকা মহাদেশকে তাদের লুণ্ঠনের এলাকা বলে ঘোষণা করে। এর সূত্র ধরে তারা তখনই লাতিন আমেরিকায় আন্তর্জাতিক পুলিশি ভূমিকা গ্রহণ করে, যা এখন গোটা বিশ্বে সম্প্রসারিত হয়েছে। ১৯৪৫ সালে আসে ট্রুম্যান ডকট্রিন। এর আগে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর পৃথিবীর এককে এলাকায় খণ্ড খণ্ড রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দখলদারিত্ব বা আধিপত্য ছিল। এমতাবস্থায় ট্রুম্যান ডকট্রিন সমগ্র বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক অখণ্ড আধিপত্যের ধারণা নিয়ে এলো। এ লক্ষ্য অর্জনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে নিজেদের অধীনে নিয়ে আসে এবং পুঁজিবাদী বিশ্বে পুঁজি রপ্তানি ও বাণিজ্যের শর্তাবলী নতুন করে তৈরি করে। সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদকে কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এসে প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়।[৮] ১৯৪৭ সালে প্রণীত হয় আইজেনহাওয়ার

ডকট্রিন। এই প্রস্তাবে মধ্যপ্রাচ্যকে মার্কিন জাতীয় স্বার্থের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

আশির দশকে মার্কিন শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে উগ্র সমরবাদী প্রজন্ম বিকাশ লাভ করে, যারা নিও কনজারভেটিভ নামে পরিচিত। এ ধারা বিকশিত হয়ে নব্বইয়ের দশকে নতুন বিশ্বব্যবস্থার ধারণায় রূপায়িত হয়। এ ধারণা ডকট্রিন আকারে উপস্থিত হয়েছিল পেন্টাগনের তৈরি গোপন দলিলে **১৯৯২** সালে, যা 'ডিফেন্স প্লানিং গাইডেন্স' নামে পরিচিত। এই দলিলের দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে এক দশক পরে রচিত হয় National Security Study। ১৯৯৭ সালে খসড়া আকারে রচিত হয়েছিল Project for the New American Century (PNAC) যা দলিল আকারে বা ডকট্রিন আকারে প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে। এই দলিলে সরাসরি বিশ্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়, সেজন্য যুদ্ধের দরকার।

২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বুশ প্রশাসন National Security Strategy ঘোষণা করে। এতে বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক আধিপত্যকে স্থায়ী ও টেকসই করার জন্য সম্ভাব্য সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা হবে, এজন্য প্রয়োজনে সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগের অধিকার যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে। এই নতুন কৌশলটি তাদের বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়িক মুনাফা লাভের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এমনকি এর সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নকারী এলিটদের স্বার্থও বিজড়িত হয়ে আছে। সেই সেপ্টেম্বরে প্রচারণা চালানো হয়, সাদ্দাম হুসেইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এক বিরাট হুমকি এবং কৌশলে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়, তিনি ৯/১১ এর ভয়াবহতার জন্য দায়ী। এ প্রচারণাটি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী কংগ্রেস নির্বাচনে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে। আমেরিকার এই জনমতটি দ্রুত বৈশ্বিক পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে। একইসঙ্গে এটি প্রশাসনের নির্বাচনী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে এবং ইরাককে নতুন ডকট্রিনে ঘোষিত শক্তি প্রয়োগের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার প্রকৃত পরীক্ষায় অবতীর্ণ করে দেয়।[৯] ২০০২ সালের National Security Strategyতে আলংকারিক ভাষায় আনুষ্ঠানিকভাবে আরও ঘোষণা করা হয়: "আমাদের বলপ্রয়োগ হবে এতটাই শক্তিশালী যে তা যেকোনো সম্ভাব্য শত্রুর সামরিক শক্তি বৃদ্ধির আশাকে ছাড়িয়ে যাবে কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তির সমকক্ষ হওয়ার উদ্দেশ্য থেকে বিরত রাখবে।" সাধারণভাবে এ ডকট্রিনটি আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী ও 'সংকীর্ণ মূল্যবোধে'র পরিচায়ক।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

সমরবাদী নীতির প্রকৃত কারণ

বহিরাগত বণিক ও দখলদারদের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নামক রাষ্ট্রটির অভ্যুদয় ঘটে। তাই শুরু থেকেই এদের স্বার্থের উপযোগী এক ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এদেশে বিকশিত হয়। তদুপরি, বিশ শতকে সংঘটিত দুটি বিশ্বযুদ্ধসহ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার বেশকিছু অনুকূল শর্ত যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ ব্যবসায়িক সংস্থার জন্য সুফল বয়ে আনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতির কল্যাণে যুক্তরাষ্ট্র একক পরাশক্তি হিসেবে পুঁজিবাদী বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সে সময় থেকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। তখন ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপানের মতো শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধকালীন ক্ষতির কারণে বাণিজ্য ঘাটতির সম্মুখীন হয়। পক্ষান্তরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক বাণিজ্য উদ্বৃত্তের দরুন ডলার বিশ্বের প্রধান মুদ্রায় পরিণত হয়। ফলে এখন পর্যন্ত মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ সহজেই ডলার যোগান দিয়ে তার অর্থনীতির ঘাটতি পূরণ করতে পারে। অপরদিকে, যুদ্ধের পরে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপেই বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো গঠিত হওয়ায় অদ্যাবধি এসব সংস্থার নিয়ন্ত্রণভার মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের ওপর ন্যস্ত আছে। এসব সংস্থা তাই যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক সংস্থাগুলোকে বিরাট আনুকূল্য প্রদান করে। যুক্তরাষ্ট্রের এ অর্থনৈতিক বলয় সৃষ্টির পেছনে সামরিক শক্তির ভূমিকা বিশেষভাবে অগ্রগণ্য। এ অর্থনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতেই সিআইএ ও পেন্টাগনের মতো অভ্যন্তরীণ ও ন্যাটোর মতো আন্তর্জাতিক সামরিক সংস্থাগুলো গড়ে উঠেছে যার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বিদ্যমান। বর্তমানে তিন হাজারের বেশি সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের মধ্য দিয়ে বৈশ্বিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে রাজনৈতিক–সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে তার আড়ালেও রয়েছে এ বৃহত্তর বাণিজ্যিক স্বার্থ। আমরা এখন যুক্তরাষ্ট্রের সমরবাদী নীতির প্রকৃত কারণগুলো বিশ্লেষণ করে দেখবো।

প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ রক্ষা করা, নতুন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা, ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য রক্ষা করা, পুঁজি পুঞ্জিভবন বা কথিত বাজার অর্থনীতি রক্ষা করা, অস্ত্র বাণিজ্য রমরমা রাখা প্রভৃতি কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে ঘন ঘন সামরিক হস্তক্ষেপ চালায়। মনরো ডকট্রিন অনুসরণে এসময়ে বিনিয়োগ সংক্রান্ত স্বার্থরক্ষায় দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ এবং অন্য দেশ দখল করে রাখার ঘটনা ঘটতে থাকে। সে সময়ে এসব দেশের চিনি, তামাক, তুলা ও মূল্যবান ধাতুসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে মার্কিন বিনিয়োগ

লক্ষণীয়।[১১] ১৯৪৫ সালে প্রণীত ট্রুম্যান ডকট্রিন তাদের পঞ্চাশের দশকে লাতিন আমেরিকায় কাঁচামাল ও জ্বালানির উৎসগুলো শোষণে ধাবিত করে। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকার কপারের ৯০ শতাংশ, সীসার ৯৫ শতাংশ, জিংকের প্রায় ১০০ শতাংশ, সিলভারের ৭০ শতাংশ এবং লোহার ৬০ শতাংশেরও বেশি মার্কিন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের অধীনে নিয়ে আসে। এ দখলদারিত্ব কায়েম করতে গিয়ে তারা শ্রমজীবী মানুষের উপর নির্মম নির্যাতন চালায় এবং শোষণের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনতার আন্দোলন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে অস্ত্র ও সামরিক বাহিনী প্রেরণ করে।[১২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মার্কিন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো মধ্যপ্রাচ্যে তেলক্ষেত্রগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়। বার বার তেলের স্বল্পতার অজুহাত তুলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি বৃহৎ তেল কোম্পানি অধিকসংখ্যক তেলক্ষেত্রগুলোর ওপর নিজেদের দখলদারিত্ব কায়েম করে। এ লক্ষ্য অর্জনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ভূমধ্যসাগরে ষষ্ঠ নৌবহর ও এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনীকে নিয়োজিত রেখেছে।[১৩] জর্ডান নদী থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও একে টিকিয়ে রাখার পিছনেও রয়েছে এ অঞ্চলে পরাশক্তিগুলোর ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য রক্ষা করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে যে ইসরাইলি সমরবাদের বিকাশ ঘটেছে তা সবসময়ই মার্কিন স্বার্থের রক্ষক হিসেবে কাজ করছে। অথচ আরব বিশ্বে তারা তাদের এ আধিপত্য রক্ষা করেছে ইসরাইলকে নির্বাহী অঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করে। আধুনিক ইসরাইলি সেনাবাহিনী বিপুল মার্কিন সাহায্যে গড়ে উঠেছে। প্রতিবছর ইসরাইল আমেরিকার কাছ থেকে ৩ বিলিয়ন ডলার সামরিক সাহায্য লাভ করে। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ইসারইলি বুর্জোয়ারা মার্কিন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।[১৪] এই যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল জোট তুরস্ককে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে বছরের পর বছর আরব রাষ্ট্রগুলোকে পর্যুদস্ত করে তাদের ঘৃণ্য স্বার্থগুলো হাসিল করে চলেছে।

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এক ভাষণে জানান, মার্কিন সামরিক বাহিনী এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাদের ভূমিকা বাড়াবে। কারণ উঠতি পরাশক্তি হিসেবে চীনের বিকাশ ঠেকাতে পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সামরিক শক্তি বৃদ্ধি জরুরী। এজন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে বিশ্ব রাজনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে এ অঞ্চল সত্যিকার

Dhaka University Institutional Repository

অর্থে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সুযোগ নিয়ে আসবে বলে তারা মনে করছে। তাই এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের নকশা নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এ এলাকায় শক্তিধর দেশগুলো নিজ নিজ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কৌশলগত বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। এ কারণে সেখানে আন্তর্জাতিক সামরিক শক্তি প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা ভয়ানক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের মতো আফ্রিকাতেও বিশেষ করে গিনি উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা এখন আশা প্রকাশ করছে যে, যুক্তরাষ্ট্র যত তেল আমদানি করে, তার ২০ শতাংশ ২০১০ সাল নাগাদ এবং ২৫ শতাংশ ২০১৫ সাল নাগাদ আফ্রিকা থেকে আসবে। এ লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী আলাদাভাবে আফ্রিকা কম্যান্ড গঠন করেছে।[১৫] সাম্প্রতিক সময়ে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, কঙ্গো ও রুয়ান্ডায় মার্কিন আগ্রাসনের নেপথ্যে যেমন রয়েছে সেসব দেশের হীরা, সোনা, ইউরেনিয়াম ও তেলের মতো মূল্যবান খনিজ দখলের আকাঙ্ক্ষা, তেমনি আফ্রিকান অর্থনীতিতে চীনা প্রভাব দূর করা। আফ্রিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্র দক্ষিণ সুদানের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পরাশক্তিগুলোর সহমর্মিতাও নিতান্ত অনাবশ্যক নয়। কারণ এদেশটির জ্বালানি, ভূ-গর্ভস্থিত খনিজ সম্পদ, লোহা, তামা, ক্রোমিয়াম, দস্তা, টাংস্টেন, সোনা, রূপা এবং পানি-বিদ্যুৎ সঞ্চালনের সুবিধা পরাশক্তিগুলোর জন্য নতুন উৎকৃষ্ট বিনিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে সক্ষম।

বিশ্বজুড়ে শ্রেণী বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা রক্ষা করা ও বিনিয়োগ ও মুনাফার সার্বিক প্রক্রিয়াটি টিকিয়ে রাখাও সাম্রাজ্যবাদী সমরবাদের অন্যতম লক্ষ্য। এ প্রক্রিয়া রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র তাই সম্পদ পুনর্বণ্টনমূলক গঠনমুখী আন্দোলনগুলোকে গুড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে তারা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানি বা কর্পোরেট বিনিয়োগকারীদের সুযোগ-সুবিধা ক্ষুণ্ন করে নিজ দেশের সুবিধার দিকে মনোনিবেশকারী রাষ্ট্রগুলোকে চরম মূল্য দিতে বাধ্য করে। বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত মার্কিন বিভিন্ন সামরিক হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদ ভিন্ন অন্য কোনো সামাজিক ব্যবস্থার উত্থান প্রতিরোধ করা এবং পুঁজিবাদের তাঁবেদার রাষ্ট্রের কার্যকর কোনো বিকল্প সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা।[১৬] হাইতি, গ্রানাডা, ডোমিনিকান রিপাবলিক ও নিকারাগুয়ায় পরিচালিত সামরিক হস্তক্ষেপ এ ধরনের উদ্দেশ্যসিদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে।

সমরাস্ত্র প্রস্তুতকারকদের সীমাহীন লোভ যুদ্ধের অন্যতম একটি সাধারণ কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। অস্ত্র উৎপাদকরা যেকোনো অজুহাতে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে মুনাফা লোটার আশায় থাকে। যুদ্ধ ছাড়া বিপুল সংখ্যক সমরাস্ত্র বিক্রি হওয়া সম্ভব নয়। তাই অনেকে মনে করেন, যুদ্ধের একটা কারণ হলো যুদ্ধবাজ ও ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্র। এ বিষয়টি এখন সর্বজনবিদিত যে, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে অস্ত্রোৎপাদকরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তাদের এ অস্ত্রোৎপাদন ব্যবসা দিন দিন আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী যুদ্ধমুখী প্রবণতাকে উসকে দিচ্ছে। দেশটির প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ক্রমবৃদ্ধি এদিকটিকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলেছে। SIPRI* থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, ২০০৬ সালে ৪১টি মার্কিন অস্ত্রোৎপাদক কোম্পানি সমগ্র বিশ্বের ৬৩ শতাংশ অস্ত্র বিক্রি করে। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে বার্ষিক সামরিক সরঞ্জাম খরচ ৪৫ শতাংশ হারে বেড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ক্রিশ্চিয়ান ফাচ্‌স মন্তব্য করেন, এসব তথ্য প্রমাণ করে যে, নব্য সাম্রাজ্যবাদ সামরিক ব্যয় ও কর্মকাণ্ডে মার্কিন সামরিক আধিপত্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।[১৭]

যেসব মিথ্যাচারের মাধ্যমে সামরিক আগ্রাসন চালানো হয়

সাম্রাজ্যবাদ যুগে যুগে তাদের লুণ্ঠনমূলক মুনাফালোভী অন্যায় যুদ্ধকে বৈধতা দিতে গিয়ে বহু মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তৎকালীন সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষিতে 'ঈশ্বরের জন্য যুদ্ধ' করার ঘোষণা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করতো। সাম্প্রতিক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সুদীর্ঘকাল যাবৎ নতুন নতুন ইস্যু সৃষ্টি করে জনগণকে প্রতারিত করে আসছে। নিজেদেরকে বীরজাতি আখ্যা দিয়ে বাগাড়ম্বরপূর্ণ মানবতাবাদী যুক্তির ধুয়ো তুলে প্রতি মুহূর্তে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার জনগণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করছে। মিডিয়া অলিগর্কির কারণে তাদের মিথ্যে প্রচারণাগুলো কখনো বা মানুষের কাছে জনপ্রিয় ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন রাষ্ট্রে গণতন্ত্র না থাকার অজুহাত তুলে সেসব দেশে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেসব দেশে কর্পোরেট পুঁজির অবাধ প্রবেশাধিকার ব্যাহত হচ্ছে, সেখানেই গণতন্ত্র না থাকার অজুহাত দাঁড় করানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ফিদেল ক্যাস্ট্রোর কিউবা ও মুয়াম্মার গাদ্দাফির লিবিয়ার কথা বলা যেতে পারে। এ উভয় দেশেই কাস্ত্রো ও

* Stockholm International Peace Research Institute.

গাদ্দাফির পূর্বে স্বৈরতান্ত্রিক বাতিস্তা ও রাজতান্ত্রিক ইদ্রিস সরকারের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ সমর্থন ছিল। এখানে রহস্য হলো প্রথমোক্ত শাসক দু'জন জনকল্যাণমুখী ও কর্পোরেট স্বার্থের পরিপন্থী। আর শেষোক্ত শাসক দুজন কর্পোরেট স্বার্থের ধারক-বাহক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ দ্বৈতনীতি প্রমাণ করে যে, তারা বিশ্বের কোনো দেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নিয়ে আদৌ চিন্তিত নয়। তারা কেবল চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন যখন তাদের বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো অন্য দেশের সম্পদের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করতে ব্যর্থ হয়।

স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মার্কিন হস্তক্ষেপবাদী কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেয়ার জন্য সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদের ভীতিকে বহু দশক ধরে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সে সময়ে কিউবাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল বিশ্ব ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে, যে ষড়যন্ত্রের সদরদপ্তর মস্কোয়।[১৮] কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের বহু দশক থেকে প্রচারিত সোভিয়েত রাশিয়ার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিশাল নৌবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক যুক্তি এখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে। এছাড়াও মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপকে বৈধতা দেয়ার জন্য মার্কিনবিরোধী কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে দানব হিসেবে চিহ্নিত করা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মাইকেল প্যারেন্টি বলেন, দুষ্ট বিপক্ষ শক্তির কারণে আমেরিকানদের অস্তিত্ব বিপন্ন, একথা আমেরিকানদের বোঝাবার একটা কৌশল হচ্ছে, কোনো মানুষকে দুষ্ট শক্তি হিসেবে চিত্রিত করা। এই কৌশল অবলম্বন করে বহু বছর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দানব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট জোসেফ স্তালিনকে।[১৯] জনগণের সুযোগ-সুবিধা সংকুচিত করে কর্পোরেট স্বার্থে বিপুল সামরিক ব্যয়ভারবহনকারী বাজেটকে যৌক্তিক করে তুলতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরবর্তীতে দানব হিসেবে চিহ্নিত করেন মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট গামেল আব্দেল নাসের, লিবিয়ার মুয়াম্মার গাদ্দাফি, পানামার ম্যানুয়েল নরিয়েগা, ইরাকের সাদ্দাম হোসেন ও সৌদি ধনকুবের ওসামা বিন লাদেনকে। এসব দানবদের নাম করে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে সামরিক হস্তক্ষেপ চালানোর যৌক্তিকতা দেখানোর চেষ্টা করে।

অন্য দেশ দখল ও আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে আমেরিকানদের জীবন রক্ষা করার অজুহাতটি বারবার ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। লেবাননে ১৯৫৮ সালে ১০,০০০ মেরিন সেনা পাঠানোকে বৈধ করার জন্য, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে হুয়ান বশ্চের গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করার যৌক্তিকতা প্রদর্শনে,

১৯৮৩ সালে গ্রানাডায় সামরিক হস্তক্ষেপকে বৈধতা দিতে এ যুক্তি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। আবার কখনও মাদকবিরোধী যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে মার্কিনিরা বিদেশে তাদের নানারকম দূরভিসন্ধি হাসিল করে। কলম্বিয়ায় তারা বহুবার এমন অজুহাত দেখিয়ে বামপন্থীদের হত্যা করেছিল। একইভাবে পেরুতেও মার্কিন বাহিনী মাদক পাচারবিরোধী যুদ্ধের নামে রাজনৈতিক বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়। এ সংঘাতে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত পেরুর সৈন্যদের নির্মম দমন-নিপীড়ন চালানোর জন্য তখন বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হয়। পানামার প্রেসিডেন্ট ম্যানুয়েল নরিয়েগা মাদক ব্যবসায় জড়িত থেকে আইন ভঙ্গ করেছেন অভিযোগ তুলে তাকে গ্রেফতার করতে ১৯৮১ সালে পানামায় মার্কিন সামরিক অভিযান চালানো হয়েছিল। আর এ কাজটি করতে গিয়ে মার্কিন বাহিনী পানামা সিটিতে শ্রমজীবী মানুষের এলাকাগুলোতে বোমা বর্ষণ করে। অবশেষে তারা বিভিন্ন কোম্পানি ও ব্যাংকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ধনী মুৎসুদ্দিদের ক্ষমতায় বসায়। বাস্তবিকপক্ষে, নব্য ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে মাদক ব্যবসায়ী ও পাচারকারীরা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল।[২০] আর নরিয়েগা সরকারের প্রধান অপরাধ ছিল জনমুখী জাতীয়তাবাদী হওয়া।

উন্নত দেশগুলো বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের জন্য পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার তাত্ত্বিকভাবে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য প্রায়শই অস্ত্র বিস্তার নিরুৎসাহিতকরণের অজুহাত দাঁড় করায়। আন্তর্জাতিক আইনের দ্বৈততার কারণে ১৭টি পশ্চিমা দেশ বিশেষ পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার জন্য পারমাণবিক অস্ত্র রাখার অধিকার রাখে। এই দেশগুলোই আবার অপরাপর দেশগুলো অস্ত্র তৈরি করছে কি না তার ওপর খবরদারি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। মার্কিন নিরাপত্তা রাষ্ট্র ১৯৪৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতি ১৮ দিনে একটি করে কমপক্ষে ৯৫০টি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।[২১] বর্তমানে তাদের ৫,১১৩টি যুদ্ধোপকরণের মজুদ রয়েছে।[২২] বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের নেশায় উন্মত্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ অভিযানের নাটককে যদি আমরা যুক্তিবিদ্যক দ্বি-কল্প অনুমানের আকারে প্রকাশ করি তাহলে যুক্তিটি দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

যদি অন্যরা অস্ত্র বিস্তার করে থাকে, তাহলে আমার অস্ত্র বিস্তার না করে উপায় নেই এবং যদি অন্যরা অস্ত্র বিস্তার নাও করে থাকে, তাহলেও আমার অস্ত্র বিস্তার না করে উপায় নেই।
হয় অন্যরা অস্ত্র বিস্তার করবে অথবা অন্যরা অস্ত্র বিস্তার করবে না।

অতএব আমার অস্ত্র বিস্তার না করে উপায় নেই।

বিশ্বময় অস্ত্র বাণিজ্য টিকিয়ে রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের মহোৎসব। আর এ অস্ত্র বিস্তারের ধারা টিকিয়ে রাখার জন্য কল্পিত নানা শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র বিস্তারের অভিযোগ গঠন করা হয়। বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন, উত্তর কোরিয়া, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র বিস্তারের অভিযোগ তুলেছে। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, পাকিস্তান, ১৯৯৪ পূর্ববর্তী দক্ষিণ আফ্রিকার পারমাণবিক অস্ত্র ভাণ্ডার নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনোই চিন্তিত হয়নি।[২৩] সুতরাং, মার্কিনিদের অস্ত্র বিস্তার নিরুৎসাহিতকরণ অভিযান কেবল ভিন্নমতাবলম্বীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিপরীতক্রমে, নিজ দেশ ও নিজস্ব জোটভুক্ত দেশগুলোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরং অস্ত্রবিস্তার উৎসাহিতকরণে আগ্রহী হয়। যেমন, উত্তর কোরিয়াকে যখন পারমাণবিক শঙ্কার জন্য হুমকি দেয়া হচ্ছিল, সেই একই সময়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ করে প্লুটোনিয়ামের স্তূপ জড়ো করার দায়ে জাপানকে মার্কিন প্রশাসন কোনোভাবে দোষারোপ করেনি।[২৪] দ্বৈততায় ভরপুর মার্কিন নিরস্ত্রীকরণ অভিযান সম্পর্কে তাই মাইকেল প্যারেন্টির বক্তব্য হচ্ছে: "মার্কিন 'নিরস্ত্রীকরণ' নীতি আসলে ভণ্ডামিপূর্ণ দ্বৈততায় পূর্ণ। মার্কিন নেতৃবৃন্দ যদি সত্যিই বিশ্ব থেকে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মূলে আগ্রহী হতো, তবে তারা নিজেদের অস্ত্রভাণ্ডার বিপুলভাবে হ্রাস করত এবং অত্যন্ত জোরালোভাবে সকল দেশের জন্য নিরস্ত্রীকরণের নীতি অবলম্বন করতো"।[২৫]

১৯৯১ ও ২০০৩ সালে ইরাক আগ্রাসনের পেছনে রাসায়নিক অস্ত্র বিস্তারের অভিযোগ আনা হয়েছিল। যুদ্ধের পর এই মিথ্যাচার পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত হয়েছে। যে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো তাদের শত্রু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র তৈরীর অভিযোগ তোলে, তারাই ইরাক ও লিবিয়া যুদ্ধে নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম সম্বলিত শেল ও বোমা নিক্ষেপ করেছে। উপসাগরীয় যুদ্ধ ও যুগোশ্লাভিয়া যুদ্ধে আমেরিকান যুদ্ধবিমান থেকে নিক্ষিপ্ত শেল থেকে ভয়াবহ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটেছে। এ কারণে ২০১০ সালের শেষদিকে ১৪৮টি রাষ্ট্র জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইউরেনিয়াম ব্যবহারকারী রাষ্ট্রগুলোর খোলাখুলি জবাবদিহিতার প্রস্তাব আনলে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইসরায়েল এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়।[২৬] তাদের এই অন্যায় কার্যক্রমকে বৈধতা দেয়ার আরেকটি বড় অস্ত্র হচ্ছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ।

স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক পরিচালনা করার অভিযোগে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অভিযুক্ত করতো। সোভিয়েত পতন ও কেজিবির দলিলপত্র প্রকাশিত হবার পরেও এসব অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর ৯/১১-এর বোমা হামলার প্রেক্ষিতে নতুনভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধ শুরু হয়। অনেকেই[*১] মনে করেন, এ হামলা চালনো হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র সমর্থিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও আফগান যুদ্ধকে বৈধতা দেয়ার জন্য। ৯/১১-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে অনেকে[*২] সন্ত্রাসবাদের অকল্যাণকে পরম বলে যুক্তি দেন এবং এ থেকেই অনুরূপ একটি বিপরীতমুখী ডকট্রিনের আবির্ভাব ঘটে। 'বুশ ডকট্রিন' বলে পরিচিত এ মূলনীতিটি হচ্ছে "যদি আপনি সন্ত্রাসবাদীদের মনে স্থান দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনিও একজন সন্ত্রাসবাদী, যদি আপনি সন্ত্রাসবাদীদের সহযোগিতা ও উৎসাহিত করে থাকেন, তাহলেও আপনি সন্ত্রাসবাদী এবং আপনার সঙ্গেও তাদের মতোই আচরণ করা হবে"।[২৭] এ সম্পর্কে নোয়াম চমস্কি[*৩] লিখেছেন, এ ডকট্রিনটি যিনি গ্রহণ করবেন, তিনি যেকোনো সন্ত্রাসবাদী অপরাধের প্রত্যুত্তরে বোমা হামলাকে যুক্তিসিদ্ধ করার চেষ্টা করবেন। কোনো সুস্থ মানুষই একথা মানবেন না যে, সন্ত্রাসবাদী নৃশংতার জবাবে ওয়াশিংটনে বোমা হামলা চালানো আইনসিদ্ধ হবে। তারপরেও আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের বোমা হামলাকে আইনসিদ্ধ করার জন্য বেশকিছু যুক্তি উপস্থাপন করতে দেখা গেছে।[২৮]

সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধের ঘোষণা দেয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী পুলিশি রাষ্ট্রের ভূমিকা নেয়ার প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধের সরাসরি তাণ্ডবে শুধুমাত্র ইরাকেই ১২ লাখ সাধারণ মানুষের মৃত্যু ঘটে। মার্কিন কংগ্রেশনাল বাজেট অফিসের ধারণা, বিন লাদেনের শুরু করা সন্ত্রাসী ঘটনার জের সামাল দিতে যুক্তরাষ্ট্রকে আগামী ১০ বছর আরও বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হবে। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৮০ লাখ কোটি ডলারে পৌঁছাতে পারে।[২৯] এ সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধের অংশীদার হওয়ার জন্য আবার তৃতীয়

[*১] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা ৭৫ জন বিজ্ঞানী, অধ্যাপক ও গবেষকরা সম্মিলিতভাবে বিবৃতি দেন ৯/১১ একটি অভ্যন্তরীণ ঘটনা। এছাড়াও নোয়াম চমস্কির *হেজেমনি অর সার্ভাইভাল* গ্রন্থে, ডেভিড হার্ভের *নিউ ইম্পিরিয়ালিজম* গ্রন্থে ও মাইকেল প্যারেন্টিসহ বহু তাত্ত্বিকের গ্রন্থ ও প্রবন্ধে এ মতের সমর্থনে যুক্তি দেয়া হয়েছে।

[*২] নোয়াম চমস্কি তাঁর *হেজেমনি অর সারভাইভাল* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ৯/১১-এর পর থেকে কিছুসংখ্যক মার্কিন তাত্ত্বিক সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে এক ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মতামত দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

[*৩] মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ঘোরবিরোধী বিখ্যাত মার্কিন চিন্তাবিদ। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের 'ম্যাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটি অব টেকনলজি'র ভাষাতত্ত্ব ও দর্শন বিভাগে ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

বিশ্বের দেশগুলোর ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে এসব দেশে তাদের পছন্দমতো মৌলিক মানবিক অধিকার ও সংবিধানের পরিপন্থী সন্ত্রাসবাদবিরোধী আইন প্রণয়নেও বাধ্য করা হয়। বস্তুত, সোভিয়েত পতনের পর ইসলামী জঙ্গিবাদের ধারণাকে পুঁজি করে মার্কিন জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) তাদের নতুন যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। কিন্তু, মজার ব্যাপার হলো, যে জঙ্গি তৎপরতাকে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের ওপর হুমকি বলে গণ্য করা হচ্ছে, তাদের হাতে খুব কমসংখ্যকই পশ্চিমারা প্রাণ হারিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম জনগোষ্ঠীই এ জঙ্গি আক্রমণের শিকার হচ্ছে। খুব কম ক্ষেত্রেই এসব জঙ্গি সংগঠন সাধারণ মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। অথচ মার্কিনিদের জঙ্গিনিধন অভিযানে প্রাণ হারাতে হচ্ছে আজও সাধারণ মুসলিমকে। এতে মুসলিম বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ক্ষোভ, অবিশ্বাস ও অনাস্থা ক্রমশ বেড়েই চলছে। এ সম্পর্কে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তারিক রামাদান *দ্য গার্ডিয়ানে* প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লিখেছেন: "আফগানিস্তান ও ইরাকে অব্যাহত আমেরিকান ও ইউরোপীয় উপস্থিতি আর সেইসঙ্গে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত সমাধানে দৃঢ় সংকল্পের অভাব যেকোনো ইতিবাচক অগ্রগতির পক্ষে প্রতিবন্ধক । এই তালিকায় আরও যোগ হবে কতগুলো অভ্যন্তরীণ বিষয়; যেমন-মানুষের মর্যাদা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় আঘাত হানে এমন বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়ন, গুয়ানতানামোর অস্তিত্ব এবং নির্যাতনের ব্যবহার, এগুলোর অনুশীলন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাঁর মিত্রদের প্রতি অবিশ্বাস বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। মধ্যপ্রাচ্যে অথবা তেলসমৃদ্ধ শেখতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে বাছাই করা কয়েকজন স্বৈরশাসকের প্রতি সমর্থনদানের বিষয়ও শিগগিরই পুনর্বিবেচনা করা উচিত। নয়তো এসব নীতির ফলে যুক্তিসংগতভাবেই প্রশ্ন জাগবে আরব বিশ্বের গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার প্রতি পাশ্চাত্যের প্রকৃত সমর্থন আছে কি না।"[৩০] প্রকৃতপক্ষে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির কূটকৌশল থেকে যে আল-কায়েদার জন্ম তাকে তারা এখন তাদের কথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের বৈধতা দেয়া এবং দীর্ঘায়িত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

মার্কিনিদের অন্য দেশে আগ্রাসন চালানো বা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের চিরাচরিত অজুহাত হলো যেকোনো দেশের মানবিক পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগ তোলা। প্রকৃতপক্ষে, অধিকাংশ মার্কিন ত্রাণ সাহায্য মিশনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো গোপন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের পটভূমি হিসেবে কাজ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এসব গোপন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে। কোনো রক্ষণশীল শাসককে সমর্থন যোগানো, অবকাঠামো নির্মাণের সুযোগ তৈরি করে দিয়ে বড় বড় বিনিয়োগকারীদের সাহায্য করা,

কাউন্টার ইন্সার্জেন্সি প্রোগ্রাম বা বিদ্রোহ দমন কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেবার জন্য মানবতার মুখোশ লাগানো এবং মার্কিন কৃষি ব্যবসার পথ সুগম করার জন্য স্থানীয় স্বয়ম্ভর কৃষিব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলা।[৩১]

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর যুদ্ধ যাত্রার উপর্যুক্ত অজুহাতগুলো বিশ্লেষণসাপেক্ষে বলা যায়, ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী কাঠামো সর্বত্র টিকিয়ে রাখার জন্য এ ধরনের মিথ্যা অজুহাত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এজন্যই মূলধারার একজন অর্থনীতিবিদই বলেছিলেন, "পুঁজিবাদকে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সবসময়ই একজন শত্রচ প্রয়োজন।"[৩২]

মার্কিন সমরবাদের ন্যায্যতা প্রতিপাদন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবসময় নিবর্তনমূলক যুদ্ধের ঘোষণা দেয়, পূর্ব-পরিকল্পিত বা কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যুদ্ধের নয়। কারণ পূর্ব-পরিকল্পিত যুদ্ধ আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। অপরদিকে, আন্তর্জাতিক আইন নিবর্তনমূলক যুদ্ধকে সমর্থন দেয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্নায়ুযুদ্ধের সময় সম্ভাব্য সোভিয়েত আগ্রাসনের আশঙ্কায় গ্রানাডা, নিকারাগুয়া ও কিউবার মতো দেশগুলোতে সামরিক হস্তক্ষেপ চালায়। পরবর্তীতে স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর ইসলামি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে আফগানিস্তান ও ইরাকের মতো দেশগুলোর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। তাদের এই নিবর্তনমূলক যুদ্ধের যৌক্তিকতা কতটুকু তা যাচাই করতে আমাদের নিবর্তনমূলক যুদ্ধ সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ধারণা থাকা প্রয়োজন। নিবর্তনমূলক যুদ্ধ বলতে সে-ই যুদ্ধকে বোঝায় যেখানে একটি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়, এক্ষেত্রে একটি গোষ্ঠীর আক্রমণ পরিচালনা আসন্ন হয়ে ওঠে এবং পরিকল্পনার বিষয়টি প্রকাশিত হয়ে যায়। নিবর্তনমূলক যুদ্ধ এক ধরনের ক্ষমতার ভারসাম্যের নীতি গ্রহণের দাবি করে যাতে কৌশলগতভাবে জাতিসংঘের অনুমোদন সহজ হয়। এক্ষেত্রে নিবর্তনমূলক যুদ্ধের নীতি গ্রহণের জন্য কিছু পরিস্থিতি অত্যাবশ্যক, যেমন:

ক) এটি প্রকৃত অর্থে একটি অরক্ষিত অবস্থায় ঘটে থাকে।

খ) বিপদের সর্বাত্মক আশংকা দেখা দিলে।

গ) আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এটি চূড়ান্ত অকল্যাণ এবং হুমকি বয়ে আনবে তা প্রমাণের একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা থাকতে হবে।[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সর্বাত্মক বিপদের আশংকায় নিজেকে অরক্ষিত বলে দাবি করতো । ষাট ও সত্তরের দশকে কিউবা বেশ কয়েকবার মার্কিন হামলার শিকার হয় যাতে বহুসংখ্যক কিউবান প্রাণ হারায়। আশির দশকেও কিউবার ওপর মার্কিন সন্ত্রাসী আক্রমণ অব্যাহত থাকে যার পেছনে কাজ করেছে মায়ামিভিত্তিক সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক। ১৯৯১ সালের সোভিয়েত পতনের পর ঘোষণা করা হয়, কিউবা থেকে বিপদের আশংকা এখন খুবই কম, তবে একেবারেই নি:শেষ হয়ে যায়নি। ১৯৮১ সালে রিগ্যান প্রশাসন নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। এটি ছিল একটি কৌশলগত ধ্বংসযজ্ঞ। রিগ্যান তখন জাতীয়ভাবে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। কারণ মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য নিকারাগুয়া তখন একটি অনাবশ্যক ও প্রচণ্ড হুমকি হয়ে দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে, সান্দানিস্তা নেতা টমাস বর্জের উন্নয়ন কর্মসূচি অন্যদের জন্য অনুসরণীয় হয়ে ওঠার আশঙ্কায় এ জরুরী অবস্থা ও যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই সুযোগে অপর সংস্কারবাদী নেতা লিবিয়ার মুয়াম্মার গাদ্দাফির বিরুদ্ধেও নিকারাগুয়াকে অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগ করা হয় যার ভিত্তিতে মার্কিনিরা লিবিয়ায় বোমা হামলা চালিয়ে বেসামরিক জনগণকে হতাহত করে। এসবই নিকারাগুয়া ক্যান্সার দূর করার পদক্ষেপ বলে মার্কিন প্রশাসন দাবি করে। এভাবেই নিবর্তনমূলক যুদ্ধের নামে পরিচালিত মার্কিন আক্রমণে রাজনৈতিক নেতৃবর্গসহ বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ প্রাণ হারায়। এ হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পরেই সেদেশে উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে বিশ্বব্যাংকের আবির্ভাব ঘটে। একইভাবে, ক্ষুদ্র দেশ গ্রানাডায় মার্কিন হস্তক্ষেপ ঘটে বিশ্ব পুঁজিবাদের প্রতি হুমকির আশঙ্কায়। এছাড়াও এল সালভাদর, পানামা, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, হাইতি প্রভৃতি দেশে একই উদ্দেশ্যে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ চালানো হয়।

উপর্যুক্ত প্রতিটি যুদ্ধেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত আগ্রাসনের বিপদের আশঙ্কাকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করেছিল, যার সপক্ষে তারা কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। কাল্পনিক অরক্ষিত অবস্থা, বিপদের ঝুঁকি ও অস্তিত্বের বিপন্নতার অজুহাত তুলে যে নিবর্তনমূলক যুদ্ধের ঘোষণা তারা দেয় তা ছিল প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যুদ্ধ। কারণ প্রতিটি যুদ্ধের মাধ্যমেই সমতাবাদী ও সংস্কারবাদী সরকারের উৎখাত ঘটানো হয় কিংবা সরকারকে দুর্বল করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে সোভিয়েত পতনের পর তাদের গোপন নথিগুলো প্রকাশিত হওয়ার পরও মার্কিনিদের কল্পিত বিপদের ঝুঁকির সপক্ষে কোনো তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ষাটের দশকে সংঘটিত ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়েও উত্তর ভিয়েতনামের

Dhaka University Institutional Repository

আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য হস্তক্ষেপের প্রয়োজন বলে দাবি করা হয়। পেন্টাগনের গোপন নথি প্রকাশিত হওয়ার পর ভিয়েতনাম যুদ্ধের মিথ্যাচার এখন একটি ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময় পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়া, লাওস, কম্বোডিয়া, লেবানন, সোমালিয়া প্রভৃতি দেশে প্রত্যক্ষ বিমান হামলা পরিচালনা করে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এসব প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ছাড়াও পরোক্ষ যুদ্ধের মাধ্যমে পুঁজিবাদপন্থী সামরিক বাহিনীকে অর্থ ও অন্যান্য সহযোগিতা দিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের উৎখাত ঘটানো হয়। গুয়াতেমালা, গায়েনা, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ব্রাজিল, চিলি, উরুগুয়ে, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া (সুকর্ণের সময়ে), গ্রিস, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, হাইতিসহ অসংখ্য দেশে। ভাড়াটে বাহিনী গঠন করে পরোক্ষ যুদ্ধের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র কিউবা, এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, ইথিওপিয়া, পর্তুগাল, নিকারাগুয়া, কম্বোডিয়া, পূর্ব তিমুর, পশ্চিম সাহারা প্রভৃতি দেশে বিপ্লবী সরকার বা বিপ্লবী আন্দোলনকে দুর্বল করে দিয়েছে।[৩৪] প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষ যুদ্ধগুলোকে নিবর্তনমূলক হস্তক্ষেপের খোলস পরিয়েছে আর পরোক্ষ যুদ্ধগুলোকে গৃহযুদ্ধ বা অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে চালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল যুদ্ধই ছিল তাদের সুপরিকল্পিত প্রতিহিংসাপরায়ন নীতির বহি:প্রকাশ।

স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর নতুন শত্রচ হিসেবে আবির্ভূত হয় ইসলামি জঙ্গিবাদ যাকে পুঁজি করে আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়ায় সার্বিকভাবে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ চালানো হয়। এখনও আংশিকভাবে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ চলছে পাকিস্তান, ইয়েমেন, লেবানন ও আফ্রিকার বেশকিছু দেশে। সম্প্রতি পশ্চিমা ষড়যন্ত্রে পরোক্ষ যুদ্ধের শিকার হয়ে আছে সিরিয়া ও মিশর। মিশরে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাতের পরেও যুক্তরাষ্ট্র একে সামরিক অভ্যুত্থান বলতে রাজী নয়। কারণ আন্তর্জাতিক আইনানুসারে, অগণতান্ত্রিক সরকারকে সামরিক সাহায্য দেয়া নিষিদ্ধ। যুগের পর যুগ ধরে মিসরের প্রতিক্রিয়াশীল সেনাবাহিনীকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। এ সাহায্য অব্যাহত রাখার জন্যই তারা অভ্যুত্থানকে অভ্যুত্থান বলে স্বীকার করতে নারাজ। আর যে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে তাদের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের সূচনা সে আল-কায়েদাকে ব্যবহার করেই সিরিয়াকে অস্থিতিশীল করে রাখা হচ্ছে। একইভাবে লিবিয়ায় পশ্চিমাদের প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরুর পূর্বে আল-কায়েদার জঙ্গিদের অর্থ, অস্ত্র ও ভারী সামরিক যানে পরিপূর্ণ করে কৃত্রিমভাবে বিদ্রোহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়। মার্কিনিরা এতসব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যুদ্ধ সৃষ্টি করে ৯/১১ এর সন্ত্রাসী আক্রমণকে পুঁজি করে।

কি ছিল সেই ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলা? খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৭৫ জন অধ্যাপক অত্যন্ত যুক্তিসিদ্ধভাবে তথ্য-প্রমাণ সহকারে দেখিয়েছেন, ৯/১১ একটি অভ্যন্তরীণ ঘটনা। তাঁরা মনে করেন, তেলসমৃদ্ধ আরব দেশগুলোতে নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি ও আগ্রাসনকে বৈধতা দিতে হোয়াইট হাউসের যুদ্ধোন্মাদরা এ ধরনের একটি আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন, তাঁদের কাছে বড় ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক অপরাধের প্রমাণ রয়েছে। বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী স্টিভেন জোনস ব্রিগহ্যাম ইয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বলেন, আমরা বিশ্বাস করি না যে, ১৯ জন ছিনতাইকারী ও অন্যরা মিলে আফগানিস্তানের গুহায় বসে এ ধরনের ঘটনার সফল পরিকল্পনা করেছে। আমরা এই প্রশাসনিক ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করছি এবং ঈশ্বরের সহযোগিতায় আমরা এ ঘটনার গভীরে প্রবেশ করতে চাই। তিনি মনে করেন, দুটো বিমানের ধাক্কায় টুইন টাওয়ারের ধ্বসে পড়া অসম্ভব। কারণ তরল জ্বালানি এ ধরনের তাপমাত্রায় ইস্পাতের কড়িকাঠ পোড়াতে পারে না এবং টাওয়ারটি ধ্বসে পড়ার সময়ে যেরকম আনুভূমিকভাবে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ার দাবি করা হয় তা এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের ইঙ্গিত দেয় যার সাহায্যে টাওয়ারটিকে ধ্বসিয়ে ফেলা হয়। বিজ্ঞানীদের এ গোষ্ঠীটি আরও দাবি করেন, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ৭ নম্বর দালানটির পাশের দালানটিতে আগুন লাগলেও এটি দিনের শেষে দেরীতে ধ্বসে পড়ে এবং এটি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ এটি পুরোপুরি ধ্বংস হওয়ার কথা ছিল। এ প্রসঙ্গে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের দর্শনের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক জেমস ফেজার বলেন, "এ প্রমাণটি খুবই অভিভূত করার মতো, কিন্তু অধিকাংশ আমেরিকানেরই এদিকে নজর দেয়ার সময় নেই। ৯/১১-এর পঞ্চম বার্ষিকীতে 'সত্যের জন্য বিদ্বজ্জন' নামক এ বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীটি সেদিনের সন্ত্রাসী হামলার প্রকৃত সত্য উদঘাটনে প্রচুর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হাজির করে অনুসন্ধানের এক নতুন দ্বার উন্মোচন করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, নব্য-রক্ষণশীল মার্কিনীরা তাদের Project for New American Century (PNAC) ডকট্রিনে বিশ্বে মার্কিন আধিপত্য রক্ষার জন্য ৯/১১-এর হামলার পরিকল্পনা করেন এবং একে ইরাক, আফগানিস্তান ও পরবর্তীতে ইরান আক্রমণের সুযোগ সৃষ্টির অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাতে চান। তাঁরা বলেন, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা ও পেন্টাগন আক্রমণের পেছনে তাদের দেয়া বৈজ্ঞানিক প্রমাণটি একটি চূড়ান্ত প্রমাণপত্র।[৩৫] তারপরেও যদি আমরা তর্কের খাতিরে মেনে নেই যে, ওসামা বিন লাদেন ও তাঁর সংগঠন আল-কায়েদার কারণেই ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলা সংঘটিত হয়েছে,

তাহলেও তাদের অপরাধে দেশে দেশে লক্ষাধিক নিরীহ বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে হত্যার পক্ষে কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মার্কিন সমরবাদকে তাদের নিজেদের যুক্তি দিয়েই খণ্ডন করা যায়। রিগ্যান প্রশাসনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুল্জ বলেছিলেন, সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ।[৩৬] সুদীর্ঘকাল যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অজুহাতে আগ্রাসন চালিয়ে অগণিত সাধারণ মানুষ হত্যা করেছে এবং মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে বহু নৃশংস নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। শুধুমাত্র ইরাক যুদ্ধেই ১২ লাখের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এখন পর্যন্ত তাদের কোমল বিভাজন নীতি* প্রসূত গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষিতে ইরাকে প্রতিদিনই অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। একইভাবে আফগানিস্তান, সোমালিয়া, লিবিয়া ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে তাদের আক্রমণে অগণিত নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। ১৯৯৪ সালে মার্কিন আগ্রাসনের খেসারত এখনও সোমালিয়াকে দিতে হচ্ছে। সম্প্রতি সেখানে আড়াই লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারিয়েছে যাদের অধিকাংশই শিশু। এছাড়াও চিলি, হাইতি, নিকারাগুয়াসহ বহু দেশে মার্কিন আগ্রাসনের পরে প্রাণহানি ছাড়াও দারিদ্র, বেকারত্ব, মহামারি প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাগুলো ব্যাপৃত হয়েছে। মার্কিন সমরবাদের নবতর সংযোজন ড্রোন হামলাও সাধারণ মানুষের মৃত্যু ছাড়াও নানাবিধ মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। আমরা দেখেছি, মার্কিন আগ্রাসন সবসময়ই সেসব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হয়েছে, যেখানে কোনো জাতীয়তাবাদী সরকার জনকল্যাণমুখী সমতাবাদী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন, গ্রানাডার নিউ জুয়েল মুভমেন্ট, চিলিতে আলেন্দের নেয়া শ্রমিক ও শিশুকল্যাণসহ নানামুখী সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি। এসব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই মার্কিন আক্রমণের খড়্গ নেমে এসেছে। ফলে বঞ্চিত হয়েছে সাধারণ মানুষ, লাভবান হয়েছে গুটিকয়েক ধনাঢ্য মুৎসুদ্দি শাসক, আমলা ও ব্যবসায়ী। সুতরাং, শ্রেণী শোষণ টিকিয়ে রেখে সাধারণ মানুষকে ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়াই সবসময় মার্কিন নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছে। যেমন, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে তাদের বলপূর্বক হস্তক্ষেপে কমিউনিজমের অবসান ঘটলে সাধারণ মানুষ আবার সুবিধাবঞ্চিত হয়ে শ্রেণী শোষণের শিকার হন। অর্থাৎ, মার্কিন সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্যবস্তু সবসময়ই সাধারণ মানুষ। এজন্য নোয়াম চমস্কি বলেছেন, সন্ত্রাসের আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞাগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি নেতৃস্থানীয় সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে প্রতিপন্ন করে।[৩৭]

---

* মার্কিন গোয়েন্দা তৎপরতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি দেশের বিদ্যমান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করা। ইরাকে তারা শিয়া-সুন্নী-কুর্দীদের মধ্যকার জাতিগত বিভেদের সুযোগ নিয়ে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে উসকে দিয়ে সংঘাত পরিস্থিতি তৈরি করে।

এফবিআইয়ের দৃষ্টিতে, সন্দেহের ভিত্তিতে বোমা হামলা একটি যুদ্ধাপরাধ, এক ধরনের আগ্রাসী কর্মকাণ্ড।[৩৮] আমরা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোমা হামলার শিকার দেশগুলোর দীর্ঘ তালিকা পর্যালোচনা করে দেখি, তাহলে দেখা যাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোনো অমূলক সন্দেহের ভিত্তিতেই দেশগুলোর ওপর বোমা হামলা চালানো হয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী যখন ইরাকের বিরুদ্ধে গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকার অভিযোগ করেছে, তখন তারা ভালোভাবেই জানতো যে তারা স্রেফ মিথ্যাচার করছে। আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ রিচার্ড ফক মনে করেন, এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইরাক যুদ্ধ শান্তির বিরুদ্ধে একই ধরনের অপরাধ যেসব অপরাধে জীবিত জার্মান নেতাদের ন্যুরেমবার্গ আদালতের বিচারে অভিযুক্ত, ফৌজদারি মামলা দায়ের ও শাস্তিপ্রদান করা হয়।[৩৯]

নৈতিকতার নিরিখে মার্কিন সমরবাদ

যেকোনো উগ্র সমরবাদ সাধারণভাবে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে অবমাননা করে পাশবিক প্রবৃত্তির তাড়নাকেই চরিতার্থ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো ছিল মার্কিন সমরবাদের সবচেয়ে নগ্ন বহি:প্রকাশ। আধুনিক যুগের নব্য-সাম্রাজ্যবাদী সমরবাদ তার সামরিকায়নের পেছনে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে তার কিয়দংশও যদি মানবকল্যাণে ব্যয় হতো, তাহলে বিশ্বের এত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র সীমার নীচে মানবেতর জীবন-যাপন করতে হতো না। অধিকন্তু এ সমরবাদ আরও কৃত্রিমভাবে দারিদ্র সৃষ্টি করে। স্বচ্ছল জনগোষ্ঠীকে পরিণত করে শরণার্থীতে। বিভিন্ন দেশে মার্কিন আগ্রাসনের পর সেসব দেশে দারিদ্র, বেকারত্ব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। এমনকি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান নেমে গেছে ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে তাদের এ উগ্র সমরবাদী নীতির কারণে। দেশে-বিদেশে সিআইএ ও মার্কিন বাহিনী পরিচালিত নির্মম নির্যাতন ও মানবাধিকার লংঘন মানবীয় কুপ্রবৃত্তির চর্চাকে প্রকট করে তুলেছে, যেগুলো নিতান্তই অন্যায়। মার্কিন ও মিত্রশক্তিগুলোর সমরবাদের এ নিষ্ঠুর বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের সদগুণাবলীকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাই এটি একটি নৈতিক সমস্যা হিসেবে সাম্প্রতিক বিশ্বে গুরুত্ব পাচ্ছে। যুদ্ধ নীতিবিদ্যায় বেশ কিছু মতবাদ বিকশিত হয়েছে যার প্রতিটি দিয়েই মার্কিন সমরবাদকে অন্যায্য ও অযৌক্তিক বলে প্রতিপন্ন করা যায়। এখন এ মতবাদগুলোর আলোকে সমরবাদকে যাচাই করে দেখা যাক।

শান্তিবাদের পরমনীতি

শান্তিবাদের পরমনীতির মূল ভিত্তি হলো *ওল্ড টেস্টামেন্টে* বর্ণিত ঈশ্বরপ্রদত্ত দশটি আদেশ যার প্রথমটি হলো মানবমনের পবিত্রতা। কিন্তু যুদ্ধ কখনো মানবমনকে কলুষিত ছাড়া শুদ্ধ করতে পারে না। তাই শান্তিবাদের পরম নীতি অনুসারে, সবকিছু নীতিনিষ্ঠ ও আইনসম্মত উপায়ে সম্পাদিত হওয়া উচিত। শান্তিবাদের এ পরম নীতির আলোকে যদি মার্কিন সমরবাদকে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে, মার্কিন সমরবাদ সম্পূর্ণ বেআইনী ও নীতিবিবর্জিত। যেমন, জাতিসংঘের অনুমোদন ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রশক্তিরা ইরাক আক্রমণ করেছে যা পুরোপুরি আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। নিকারাগুয়ায় মার্কিন আগ্রাসনের পরে আন্তর্জাতিক আদালত ১৩/১ ভোটে মার্কিন আগ্রাসনকে অবৈধ ও অন্যায় ঘোষণা করার পরও মার্কিন প্রশাসন আদালতের রায়ে কর্ণপাত না করে তাদের সমরবাদী নীতি অক্ষুণ্ন রাখে। গ্রানাডা আক্রমণের পূর্বে রিগ্যান প্রশাসন কংগ্রেসের অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন মনে করেননি যা নিজ দেশের আইনের প্রতিও চরম অশ্রদ্ধা।

শান্তিবাদের পরমনীতি সাধারণভাবে সকল যুদ্ধকেই নীতিহীন ও বেআইনী মনে করে। এ নীতিতে শুধুমাত্র ন্যায়যুদ্ধকেই বৈধ মনে করা হয়। এ অধ্যায়ের শুরুতেই আমরা ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধের পার্থক্য দেখেছি। সাধারণ মানুষ যখন নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা বা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কোনো নিপীড়ক বা শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখনই কেবল তাকে ন্যায়যুদ্ধ বলা চলে। এদিক বিচারে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কখনোই মহৎ কোনো উদ্দেশ্যে বা মানবমুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না। বাহ্যিকভাবে মানবতা রক্ষা ও গণতন্ত্র বিতরণের কথা বলা হলেও যুদ্ধের পরিণতিগুলো যাচাই করলে আমরা বুঝতে পারি, এসব যুদ্ধ কেবল সম্পদ লুণ্ঠন ও ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারেই পরিচালিত হয়। ব্যাপক মানবাধিকার লংঘন ও প্রাণহানির বিনিময়ে সংঘটিত এসব যুদ্ধকে কখনোই ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না। শান্তিবাদের পরম নীতির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হচ্ছে: 'তাদেরকে যেন হত্যা করা না হয়'। অপরদিকে, মার্কিন সমরবাদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা সবসময় লক্ষ্য করি, বোমা হামলার মাধ্যমে নির্বিচারে লক্ষ লক্ষ বেসামরিক নিরীহ জনতাকে হত্যা করা যা এ মূলনীতির সুস্পষ্ট লংঘন।

শান্তিবাদ

শান্তিবাদ নীতিগতভাবে যুদ্ধকে বর্জন করে। শান্তিবাদের অন্যতম প্রবক্তা বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর *War Crimes in Vietnam* গ্রন্থে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ভয়াবহতা আলোচনা করতে গিয়ে মার্কিন সরকারের যুদ্ধনীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। মার্কিন সমরবাদের অমানবিক ও অনৈতিক চরিত্র নিরূপণ করে রাসেল বিশ্বশান্তির জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। সাধারণভাবে যুদ্ধ বিলীন করার পরিকল্পনাটি যুদ্ধের মতোই প্রাচীন একটি ধারণা হলেও অনেকেই শান্তিবাদকে অসম্ভব বলে মনে করেন। মাত্র দুটো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেই শান্তিবাদের বাস্তবায়ন ঘটবে। প্রথমটি হচ্ছে, একটি ধারাবাহিক ও আংশিক স্থিতিশীল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে যুদ্ধে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ যুদ্ধকে অপরিহার্য মনে করতো না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কিছু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শান্তি পরিকল্পনায় কার্যকরী ও সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে যাতে শান্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে।[৪০]

এক্ষেত্রে প্রথম অবস্থাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যুদ্ধে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গরাই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তোলে। বিভিন্ন দেশে সিআইএর অপতৎপরতার কারণে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রতিক মিশর ও বহু যুগের ভুক্তভোগী কলম্বিয়া এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন সমরবাদীরা ভাড়াটিয়া গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে বিদ্রোহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিক লিবিয়া, সিরিয়া ও ১৯৯৪ সালের সোমালিয়া এ ধরনের পরিস্থিতির বাস্তব উদাহরণ। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী সমরবাদই হচ্ছে শান্তিবাদের প্রধান বাধা যেকথা বার্ট্রান্ড রাসেল উপলব্ধি করেছিলেন। মূলত যুদ্ধে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ যুদ্ধকে অপরিহার্য মনে করে বলেই বিশ্বব্যাপী অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে রাখে। সাম্প্রতিক দক্ষিণ এশিয়ায় অস্থিতিশীলতার পেছনেও সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদের আগ্রহ ও ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের দূরভিসন্ধিটি কার্যকর। অর্থাৎ প্রথম সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে যুদ্ধাগ্রহীদের যেমন মহৎ ভাবা হচ্ছে, তারা ঠিক তেমনটি নয়। মার্কিন বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, নব্য-রক্ষণশীলরা তাদের আগ্রাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অজুহাত সৃষ্টির লক্ষ্যেই ৯/১১এ ৩০০০ মানুষের প্রাণহানির ঘটনা ঘটিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিস্থিতিটির আংশিক সত্যতা রয়েছে। আমরা দেখেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রক্ষণশীল সরকার ক্ষমতাসীন থাকাবস্থাতেই বৃহৎ যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছে। সাম্প্রতিক আফগান ও ইরাক যুদ্ধ রক্ষণশীলদের সময়েই ঘটেছে। এছাড়া গ্রানাডা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধও রক্ষণশীল সরকারের আমলেই সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু, প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাটরা লিবিয়া, সিরিয়া যুদ্ধকে বিলম্বিত করলেও যুদ্ধকে বর্জন করতে পারেনি। কারণ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো ধনিক কল্যাণে নিবেদিত। বিশ্বব্যাপী অস্ত্র ব্যবসাকে আরও রমরমা করতে, সম্পদের দখলদারিত্ব কায়েম করতে ও কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে রাষ্ট্র সরকারকে বাধ্য করে। কেননা এখানে ধনীরাই রাষ্ট্রের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক, গণতান্ত্রিক সরকার নয়। তাই কংগ্রেসের মতামতকে উপেক্ষা করে বহুবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধযাত্রা করতে দেখা গেছে। একটি দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক যদি ধনিক শ্রেণীর পরিবর্তে সেদেশের জনসাধারণ হতো, তাহলে দ্বিতীয় পরিস্থিতিটি সৃষ্টি করা সম্ভব হতো। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নমূলক কাঠামো এই পরিস্থিতি সৃষ্টিতে বাধাদান করে।

অনেক সমাজতন্ত্রীও শান্তিবাদকে এ যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করেন যে, এ মতবাদ শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াইকে থামিয়ে দেয়। কিন্তু যেকোনো যুদ্ধের প্রকৃত কারণই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ। সাম্রাজ্যবাদীরা যদি দেশে দেশে তাদের হস্তক্ষেপ পরিহার করতো, তাহলে সাধারণ মানুষকে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করতে হতো না এবং অধিকার আদায়ের জন্য লড়তেও হতো না। মার্কিন তুলা কোম্পানির নিপীড়ন বন্ধ হলে আফ্রিকার এক কোটি কৃষককে মানবেতর জীবন-যাপন করতে হতো না। আমাদের দেশে কোম্পানিগুলোর দখলদারিত্ব বন্ধ হলে অগণিত মানুষকে ভূমিহীন হতে হতো না। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন না ঘটলে সাধারণ মানুষকে লড়াই করতে হতো না। সুতরাং, যাবতীয় অন্যায়-নিপীড়ন ও যুদ্ধের শেকড়ে কাজ করছে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী সমরবাদ। তাদের সমরবাদী নীতি পরিহার করে নিলে সাধারণ মানুষের ন্যায়যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজন দেখা দিতো না।

রাজনৈতিক বাস্তববাদের ছয়টি মূলনীতি

পৃথিবীতে যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার সবগুলো কোনো না কোনো বাস্তব অবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এ কারণে যুদ্ধের সঙ্গে বাস্তবতার যে সম্পর্ক রয়েছে তার সাধারণ ছয়টি মূলনীতি রয়েছে।

রাজনৈতিক বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত এ ছয়টি মূলনীতির সাহায্যে আমরা এখন মার্কিন সমরবাদের যথার্থতা প্রতিপাদন করে দেখবো।

প্রথম মূলনীতি অনুসারে, মানুষের জীবন কিছু বস্তুগত মূলনীতির আলোকে পরিচালিত হয়। এগুলো মানব প্রকৃতির মধ্যেই বিদ্যমান। এ নীতিগুলো প্রতিটি সমাজের জন্য সাধারণ এবং প্রতিটি সমাজেই নীতিগুলো অনুসরণ করা হয়। রাজনীতি ও সমাজের সাধারণ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি তৈরি করা হয়। বাস্তববাদীদের মতে, মানবজীবনের সাধারণ নীতি এবং বাস্তবতার আলোকে যুদ্ধকে যাচাই করে দেখতে হবে যে, এটি যৌক্তিক না অযৌক্তিক, বাস্তবসম্মত নাকি অবাস্তব, ন্যায়সঙ্গত নাকি অন্যায়।

সুতরাং, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি দেশের স্বার্থে যুদ্ধ করতে হয়, তখন সেই যুদ্ধ করাকে ন্যায়সঙ্গত বা যৌক্তিক বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের ফলে ক্ষতির সম্ভাবনা যদি বেশি থাকে, তখন তাকে অন্যায় বলে মনে করা হয়। এ যুক্তিতে স্বাধীনতা যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত বলা যায়, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে কখনোই ন্যায়সঙ্গত বলে দাবি করা যায় না। কেননা এসব যুদ্ধ আগ্রাসী ও আগ্রাসনের শিকার কোনো রাষ্ট্রেরই জনগণের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনে না। উপরন্তু, এসব যুদ্ধের ক্ষতি অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে থাকে বলে এসব যুদ্ধ সবসময়ই অন্যায় যুদ্ধ বলে পরিগণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইরাক যুদ্ধের কথা বলা যেতে পারে। যুদ্ধের পরে ইরাকে ব্যাপক দারিদ্র্য ও কর্মসংস্থানের অভাব দেখা দেয়। সেইসঙ্গে জাতীয় ঋণ উচ্চমাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং জনসেবামূলক খাতগুলো শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। অপরদিকে, আগ্রাসী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শেয়ারবাজার ৩৪ শতাংশ পতিত হয়, বেকারত্ব বেড়ে ৩৫ শতাংশে পৌঁছায়, ফেডারেল বাজেটে অতিরিক্ত ২৮১ বিলিয়ন ডলার যুক্ত হয়, বাজেট ঘাটতি কমপক্ষে ১৫৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়, ১.৫ মিলিয়ন মানুষ স্বাস্থ্যবীমা সুবিধা হারায় এবং সামরিক খরচ মেটাতে ও সামরিক শিল্পের মুনাফা বাড়াতে জনগণের ওপর অতিরিক্ত করারোপ করা হয় ও অভ্যন্তরীণ জনসেবামূলক খাতগুলো ক্রমশ হ্রাস করা হয়।[৪১]

রাজনৈতিক বাস্তববাদের দ্বিতীয় মূলনীতি অনুসারে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী নৈতিকতার আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করা উচিত। নীতিপ্রণেতাদের ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি বা ব্যক্তিগত বিকারগ্রস্ততা

অনেকসময় পররাষ্ট্রনীতিকে অযৌক্তিক করে তোলে, এক্ষেত্রে ক্ষমতার মোহে রাষ্ট্রনায়কেরা প্রায়ই যুদ্ধে লিপ্ত হয়। রাজনৈতিক বাস্তববাদ মনে করে, একটি ভালো পররাষ্ট্রনীতি সবসময়ই যৌক্তিক হয়ে থাকে এবং একটি যৌক্তিক পররাষ্ট্রনীতি সবসময় ঝুঁকি কমায় ও সর্বাধিক সুবিধা নিশ্চিত করে।[৪২]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে উদারবাদী লেখক জন বুয়েল ও ম্যাথিও রথসচাইল্ড *প্রগ্রেসিভ* পত্রিকায় (অক্টোবর, ১৯৮৪) লিখেছেন, “সবচেয়ে বড়, শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে ধনী ও শক্তিশালী হওয়ার ইচ্ছায় আমেরিকান মানস প্রবলভাবে আবদ্ধ। ব্যাপারটি বোঝার জন্য শুধু আমাদের নেতাদের কথাবার্তা শুনুন। তাঁদের লেখায় তাঁরা আরও মন্তব্য করেছেন, তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশ যখন — তা হোক কিউবা, ভিয়েতনাম, ইরান বা নিকারাগুয়া আমাদের পথে চলতে অস্বীকার করে, তখন তা আমাদের অহংকে খোঁচা দেয়...”।[৪৩] এ ধরনের অহংবাদী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে কখনোই নৈতিক বলে দাবি করা যায় না। আবার ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি ও বিকারগ্রস্ততা পররাষ্ট্রনীতিকে কতখানি অযৌক্তিক করে তোলে তার এক জ্বলন্ত প্রমাণ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের এক দম্ভোক্তি। তিনি বলেছিলেন ঃ “আমি খাল দখল করেছি। কংগ্রেসকে এ নিয়ে বিতর্ক করতে দাও।”[৪৪] দখলদারিত্ব ও ক্ষমতার মোহে অন্ধ মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অযৌক্তিকতা সম্পর্কে সেদেশের জনগণও এখন গভীরভাবে সচেতন। তাই প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় প্রথম বুশ যখন যুদ্ধকে বৈধতা দিতে একের পর এক মিথ্যাচারে লিপ্ত ছিলেন, তখন যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে জনগণকে শ্লোগান দিতে শোনা যায়ঃ “ তেলের জন্য রক্ত নয়।”[৪৫]

কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে জনগণের রক্ত ঝরানো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্বব্যাপী কেবল ঝুঁকিই বাড়িয়েছে, সুবিধা দিয়েছে শুধু বৃহৎ কোম্পানিগুলোকে। সাউল লানডাউ মধ্য আমেরিকায় মার্কিন হস্তক্ষেপের খরচ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, “হস্তক্ষেপের খরচ সেখানে মার্কিন বিনিয়োগের বহুগুণ বেশি”। রিচার্ড বার্নেটের ভাষায়: “সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে খরচ অনেক বেশি।”[৪৬] কেন তাহলে এই ব্যয়সাধ্য সাম্রাজ্য ? এর উত্তর থরস্টেইন ভেবলেন তাঁর *দি থিওরি অব বিজনেস এন্টারপ্রাইজ* গ্রন্থে ১৯০৪ সালেই দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন : “সাম্রাজ্যের লাভ সুবিধাভোগী ব্যবসায়ী শ্রেণী ভোগ করে আর এর জন্য প্রয়োজনীয় খরচের পয়সা আসে বাকি জনসাধারণের শ্রম থেকে।” ভেবলেনের অর্ধ শতক আগে মার্কস দেখিয়েছিলেন, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যয় ‘ইংল্যান্ডের জনসাধারণের পকেট থেকে নির্বাহ হয়’ এবং এই ব্যয় ব্রিটিশ রাজকোষে ফেরত আসা টাকার চেয়ে

বহুগুণ বেশি। ভারত সাম্রাজ্য থেকে গ্রেট ব্রিটেনের পাওয়া সুবিধাটুকুর মধ্যে মুনাফা হিসেবে বিবেচিত অংশ গুটিকয় ব্যক্তির, মূলত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের শেয়ার মালিক ও কর্তাদের হাতে জমা হয়।[৪৭] বর্তমান মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিও প্রাচীন সাম্রাজ্যের অনুসরণে গুটিকয় সুবিধাভোগীর স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যাপৃত। মার্কিন নীতিপ্রণেতারা বিনিয়োগকারীদের এক ডলার রক্ষার জন্য জনগণকে তিন থেকে পাঁচ ডলার খরচ করাতে বাধ্য করেন। তাই বিভিন্ন ধরনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কোনো একটি দেশে বিনিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির সার্বিক ব্যবস্থাটির নিরাপত্তাকেই অধিক অগ্রাধিকার দেয়া হয়।[৪৮] সুতরাং, রাজনৈতিক বাস্তববাদ কখনোই এ ধরনের গণবিধ্বংসী পররাষ্ট্রনীতিকে সমর্থন করে না।

তৃতীয় মূলনীতি অনুযায়ী, ক্ষমতা যখন নৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত ও সাংবিধানিক পন্থায় নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন শৃঙ্খলা বজায় থাকে। কিন্তু ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিত ও বর্বর শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে পরিচালিত হলে শুধুমাত্র শক্তি প্রদর্শন ছাড়া এর আর কোনো ন্যায্যতা থাকে না। এ ধরনের পরিস্থিতি চরম অস্থিতিশীলতা ও ব্যাপক সহিংসতা সৃষ্টি করে। কেবলমাত্র ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি অনুসরণ করে এ অবস্থার অবসান ঘটানো যেতে পারে।[৪৯]

প্রথিতযশা বাম লিবারাল চিন্তাবিদ ম্যাথিউ ইগলেসিয়াস বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, আন্তর্জাতিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রধান কাজগুলোর একটা হচ্ছে পশ্চিমা শক্তিগুলোর দ্বারা মারাত্মক সামরিক শক্তি ব্যবহারকে আইনি বৈধতা দেয়া।[৫০] এক্ষেত্রে নগ্ন ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সাম্প্রতিক বিশ্বে পরাশক্তিগুলো কর্তৃক আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাপক লংঘন একটি নির্মম বাস্তবতা। জাতিসংঘের অনুমোদন ছাড়া একের পর এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ও বিভিন্ন দেশে নিপীড়নমূলক বলপ্রয়োগের নীতি গ্রহণ পরাশক্তিগুলোর উগ্র ক্ষমতালিপ্সু মনোবৃত্তির পরিচয় বহন করে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার ভিত্তিই এটা যে, যুক্তরাষ্ট্র চাইলেই ইচ্ছেমতো বলপ্রয়োগ করতে পারে। বলপ্রয়োগকে বৈধতা দিতে সে ইচ্ছেমতো বিভ্রান্তিকর বক্তব্য ছড়ায়। যেমন, চিলির নির্বাচিত সরকারপ্রধান আলেন্দেকে উচ্ছেদ করে স্বৈরশাসক পিনোশেকে ক্ষমতায় বসানোর পর তারা যুক্তি দিয়েছে, স্থিতিশীলতার স্বার্থে তারা চিলিকে অস্থিতিশীল করেছে। অর্থাৎ, স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য তাদের সংসদীয় গণতন্ত্র ধ্বংস করতে হয়েছিল। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাদের নীতির সমালোচক কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে

তারা একের পর এক অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকে। এমন একটি রাষ্ট্রের উদাহরণ হলো ইরান। তার বিরুদ্ধে সবসময় ইরাক ও আফগানিস্তানকে অস্থিতিশীল করার অভিযোগ আনা হয়। অপরদিকে তাদের অন্যায় দাবি হচ্ছে যে, তারা আগ্রাসন চালিয়ে ও ধ্বংস করে এসব দেশ স্থিতিশীল করছে।[৫১] সুতরাং, বিশ্ব রাজনীতির ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করছে মার্কিন সমরবাদ এবং দেশে দেশে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টির জন্য তারাই মূলত দায়ী। সোভিয়েত পতনের পর তাদের এই আগ্রাসী মনোভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব রাজনৈতিক বাস্তববাদের তৃতীয় মূলনীতিও মার্কিন সমরবাদের পরিপন্থী।

রাজনৈতিক বাস্তবাদের চতুর্থ মূলনীতি মনে করে, রাষ্ট্রনায়কের উচিত তার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু নৈতিকতা অনুসরণ করা। সর্বোচ্চ নৈতিকতাবোধই পারে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উভয় পর্যায়েই রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডকে সার্বিক নৈতিক মূলনীতি অনুসরণে যাচাই করা উচিত।[৫২]

সাম্প্রতিককালে মানবতা প্রতিষ্ঠার নাম করে সিরিয়া ও লিবিয়ায় যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ পশ্চিমা শক্তিগুলো চালাচ্ছে তাকে সার্বিক নৈতিক মূলনীতির অধীনে এনে কখনোই ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না। ন্যায়যুদ্ধ তত্ত্ব অনুসারে, যুদ্ধকে শুধুমাত্র চূড়ান্ত দুটি সাধারণ শর্তের অধীনে ন্যায়সঙ্গত বলা যেতে পারে। প্রথমত, এর পেছনে একটি ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকতে হবে, যাকে বলা হয় Jus ad bellum। দ্বিতীয়ত, ন্যায়সঙ্গত পন্থায় এর সমাধান টানতে হবে, যাকে বলা যায় Jus in bello। এ থেকে বোঝা যায়, যুদ্ধকে নৈতিকভাবে সমর্থন পেতে হলে এর দুটো ভিত্তি থাকা প্রয়োজন। প্রথমত, কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে যুদ্ধে যাওয়া হচ্ছে এটি বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধটি যেভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে তা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য কি না।[৫৩] ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান, ইরাক যেকোনো একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে যদি আমরা এ দুটি শর্তের অধীনে এনে ব্যাখ্যা করি দেখা যাবে, কোনো যুদ্ধের পেছনেই ন্যায়সঙ্গত কোনো উদ্দেশ্য ছিল না এবং কোনো যুদ্ধই ন্যায়সঙ্গত উপায়ে সংঘটিত হয়নি। প্রতিটি যুদ্ধেই যুদ্ধ নীতিবিদ্যার মৌলিক নীতি অমান্য করে সাধারণ নিরীহ জনগণকে নিপীড়নের শিকার করা হয়েছে এবং বিদেশী কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষা ও জনগণের হাত থেকে সম্পদ বিদেশীদের হাতে হস্তান্তরের জন্যই এসব যুদ্ধ ঘটেছে। প্রতিটি যুদ্ধের পরিণতিই এ বাস্তবতার স্বাক্ষর বহন করে। এভাবে রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনৈতিক আচরণও সার্বিক

নৈতিকতার পরিপন্থী। যেমন, জর্জ ডব্লিউ বুশ ইরাক যুদ্ধের পর নারী-পুরুষকে মুক্ত করে আসার ঘোষণা দিলেও বাস্তবে আবু গারীবসহ বিভিন্ন কারাগারে তাদের পরিচালিত নির্যাতনে নির্মমভাবে নারী-পুরুষের মৌল মানবিক মর্যাদা বিপর্যস্ত হয়। একইভাবে, সিনিয়র বুশ প্রথম উপসাগরীয় সংকটকালে ঔদ্ধত্যভরে ঘোষণা করেছিলেন, যুদ্ধের সমর্থনে কংগ্রেস থেকে একটি ভোটও যদি না পাওয়া যায়, তাহলেও তিনি সৈন্য পাঠাবেন।[৫৪]

রাজনৈতিক বাস্তববাদের পঞ্চম মূলনীতি অনুসারে, কোনো একটি বিশেষ জাতির নৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা অবশ্য পরিত্যাজ্য। রাজনৈতিক বাস্তববাদ বিশ্বাস করে যে, ক্ষমতাশালী দেশগুলো এমন কিছু সামান্য নিয়মের দ্বারা কোনো বিষয় উপস্থাপন করতে চায় যাকে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী হয়ে থাকে।

ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট অফ আমেরিকার নেতা প্রয়াত মাইকেল হ্যারিংটন মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'আমরা হচ্ছি অতি উৎসাহী দেশপ্রেমিক' এবং 'আমরা অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে ভালোবাসি' আর 'আমাদের ক্ষমতা রয়েছে।'[৫৫] এ তিনটি বাক্যের মাধ্যমেই তিনি বোঝাতে পেরেছিলেন, ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্যই মার্কিনিরা নিজেদের দেশপ্রেমের মডেল বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চায়। যেমন, ওসামা বিন লাদেনকে যথাযথ আইনানুগ প্রক্রিয়ায় না এনে সম্পূর্ণ বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তাদের অভিমত হলো: 'ন্যায়বিচার সম্পন্ন হয়েছে'। লাদেন হত্যাকাণ্ডের অভিজ্ঞতা সংবলিত তথ্য নিয়ে লেখা গ্রন্থ *নো ইজি ডে*-তে লেখক মার্ক ওয়েন আমেরিকান তরুণদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য লিখেছেন: তারা যেন নেভি সিলের সদস্য হয়ে আমেরিকাকে শত্রুদের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখেন, আমেরিকা আক্রান্ত হলে আক্রমণকারী শত্রুকে জল-স্থল-অন্তরিক্ষ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে হত্যা করেন।[৫৬] দেশপ্রেমের আবরণে প্রকাশিত এ হত্যাকাণ্ডের রাজনৈতিক সংস্কৃতি মার্কিনিদের প্রচারিত স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের তত্ত্বকে ফাঁকাবুলিতে পর্যবসিত করে।

রাজনৈতিক বাস্তববাদের ষষ্ঠ মূলনীতিতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বশাসন প্রতিষ্ঠার দিকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী ও নীতিবিদদের স্বাধীনতার বিষয়টিকে নিশ্চিত করা

প্রয়োজন। রাজনৈতিক বাস্তববাদের মতাদর্শানুযায়ী, একজন অর্থনীতিবিদের এ প্রশ্নের উত্তরানুসন্ধান করার অধিকার থাকতে হবে যে, কোনো বিশেষ সরকারী নীতিমালা সমাজ ও তার কোনো বিশেষ অংশের সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কি ধরনের প্রভাব ফেলবে। একইভাবে একজন আইনজীবী বিশ্লেষণ করে দেখাতে পারেন, কোনো বিশেষ নীতিমালা আইনের শাসন অনুসরণ করছে কি না। অপরদিকে, একজন নীতিবিদ নীতিমালাটি নৈতিক মূলনীতি অনসুরণ করছে কি না তা বিশ্লেষণ করে দেখাতে পারেন।[৫৭]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ষষ্ঠ মূলনীতিটির বিপরীত বৈশিষ্ট্যটিই কার্যকর। ফিলিপাইনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরোধিতা করা এবং সমাজতান্ত্রিক ও শ্রমিক নেতাদের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোয় খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ রিচার্ড এলি, এডওয়ার্ড বেমিস, জেমস এ্যালেন স্মিথ, হেনরি ওয়েড রজার্স, থরস্টেইন ভেবলেন, ও.ই.এ.রস ও স্কট নিয়ারিংকে চাকুরিচ্যুত হতে হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে র‌্যাডিকাল বা আমূল পরিবর্তনমুখী চিন্তাভাবনার অনুসারী শিক্ষকদের বরখাস্ত করার হার বেড়ে যায়। এ সময়ে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মূরে বাটলার শিক্ষকদের যুদ্ধের সমলোচনা করতে নিষেধ করেন। এরপর চল্লিশের দশকের শেষভাগ থেকে ১৯৫০-এর দশকের প্রথম ভাগে ম্যাকার্থিজমের প্রভাবে কমিউনিস্ট মতবাদের অনুসারী বা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন বলে অভিযোগ তুলে শত শত মানুষকে কর্মচ্যুত, আটক, নিগ্রহ, নিপীড়ন, অত্যাচার বা মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এফবিআইয়ের কাছে কোনো বিশেষ ব্যক্তির নাম বলতে অস্বীকার করায় সমাজবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ডায়মন্ডকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ দেয়া হয়নি। শিক্ষাঙ্গন সংক্রান্ত এক গবেষণায় পল লাজারফেল্ড ও ওয়েগনার থিলেনস জুনিয়র উল্লেখ করেন যে, সেই সময় (ম্যাকারথির নেতৃত্বাধীন দমন-পীড়নের ঘটনার সময়) সকল স্তরের শিক্ষকের মধ্যে বিশ্বস্ততা প্রমাণের প্রয়োজনবোধ সঞ্চারিত হয়েছিল। প্রচলিত আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রায় যেকোনো ধরনের সমলোচনা মার্কিন শাসকদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক করত যে, সমালোচনাকারীর মনের মধ্যে হয়তো কমিউনিস্ট প্রবণতা লুকিয়ে রয়েছে। বিশ্বস্ততার শপথে সই করতে অস্বীকারকারী সকল শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়।[৫৮]

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ছাত্ররা ব্যাপক বিক্ষোভ ও অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করলে ছাত্রকর্মীদের গ্রেপ্তার, পুলিশ দিয়ে পেটানো, জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে যুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। কেন্ট স্টেট ও জ্যাকসন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ওপর গুলি চালানো ও তাদের হত্যা করা হয়। এ

সময়ে র‍্যাডিকাল রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠা শিক্ষকরা চাকরি হারান। ক্যাম্পাসে সংঘর্ষকালে অনেক শিক্ষক প্রচণ্ড পুলিশী প্রহারের শিকার হন। পুরো সত্তর ও আশির দশকজুড়েও এই নিপীড়ন অব্যাহত থাকে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কমিউনিস্ট এ্যাঞ্জেলা ডেভিসকে বহিষ্কার করে। মার্কিন ফেমিনিস্ট সমাজতত্ত্ববিদ মার্লিন ডিক্সনকে তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য প্রথমে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। বিখ্যাত মেলভিল স্কলার, স্ট্যানফোর্ডের স্থায়ী সহযোগী অধ্যাপক, এগারোটি বই ও একশটি নিবন্ধের লেখক তুখোড় শিক্ষক ব্রুস ফ্রাঙ্কলিনকে ছাঁটাই করা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ছাত্র বিক্ষোভে উসকানি দেয়া। পরবর্তীতে তাঁকে কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয় চাকরির প্রস্তাব দিলেও বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড অফ রিজেন্টস তা বাতিল করে দেয়। কেনেথ ডলবিয়ারকে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে রক্ষণশীল মূলধারাপন্থী, বিপ্লবী, নারী এবং কৃষ্ণাঙ্গ প্রভৃতি মানুষ ও মতের সমন্বয়ে সত্যিকারার্থে একটি বহুত্ববাদী সংস্কৃতির দিক-নির্দেশনা দেয়ার অপরাধে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। অনুরূপভাবে, মৌলিক পণ্ডিত জেসি লেমিশ মূলধারার ইতিহাসচর্চার গুপ্ত ভাবাদর্শগত অনুমানগুলোর একটি সমালোচনা লিখেছিলেন বলে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বহিষ্কার করে। তাঁর বিভাগীয় প্রধান এই বহিষ্কারের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন: "আপনার রাজনৈতিক বিশ্বাস আপনার পাণ্ডিত্যের ওপর প্রভাব ফেলেছে"। এছাড়াও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসবিদ ও নামকরা যুদ্ধবিরোধী কর্মী স্টাগটন লিন্ডকে ছাঁটাই করে। সমাজতত্ত্ববিদ পল নিডেনকে রাজনৈতিক কারণে পিটসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাঁটাই করা হয় আইনকে ধনী ও ক্ষমতাশালীদের হাতিয়ার বলে ব্যাখ্যা করায়। ১৯৮৭ সালে সহকর্মীদের ব্যাপক সমর্থন থাকলেও নিউ ইংল্যান্ড স্কুল অফ ল-এর চারজন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়। এছাড়াও যুদ্ধবিরোধী তৎপরতায় অংশ নেয়ার অপরাধে ১৯৭২ সালে ভারমন্ট বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র, পুরো বিভাগ ও ফ্যাকাল্টি সিনেট কাউন্সিল অফ ডিনস, প্রভোস্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের সমর্থন সত্ত্বেও বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ মাইকেল প্যারেন্টির চাকরি নবায়ন করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা তাঁর যুদ্ধবিরোধী তৎপরতাকে অপেশাদার আচরণ বলে অভিহিত করে।[৫৯]

অপ্রচলিত পথে চলার কারণে গোটা বিভাগ এবং কখনো সমগ্র স্কুল বা কলেজকে উচ্ছেদ করার নজিরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে। যেমন, অধিকাংশ শিক্ষক মিলে অপরাধ এবং আইন প্রয়োগের শ্রেণী বিশ্লেষণ দাঁড় করার কারণে বার্কলির অপরাধতত্ত্ব বিভাগটিকেই বিলোপ করা হয়। যেসব শিক্ষক অপরাধতত্ত্বের ব্যাখ্যায় গোঁড়া ছিলেন, তাঁদের অন্য বিভাগে চাকরি দেয়া হয়েছিল আর চাকরিচ্যুত করা

হয়েছিল সেই শিক্ষকদের যাদের চিন্তাভাবনা র‍্যাডিকাল। ছাত্রদের দাবিতে ১৯৭০ সালে বাফেলোর স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্কে একটি পরীক্ষামূলক সামাজিক বিজ্ঞান কলেজ খোলা হয়। কলেজটির ৩০ জন শিক্ষকের দুই-তৃতীয়াংশই র‍্যাডিকাল মনোভাবসম্পন্ন হওয়ায় কয়েক বছরের মধ্যেই কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসকদের কোপানলে পড়ে। শিক্ষকদের অনেক কোর্সে মার্কসবাদী বইপত্র ব্যবহার করা হতো এবং নৈশকালে ক্লাস করতে আসা শ্রমিকসহ প্রায় হাজার খানেক ছাত্র এসব কোর্সে অংশ নিতো। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ক্রমবর্ধমানভাবে যুক্ত একটি সফল মার্কসবাদী শিক্ষা কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত মেনে নেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ায় কলেজটি ১৯৭৬ সালে বন্ধ হয়ে যায়।[৬০]

গবেষণা অনুদান ও বৃত্তি দেবার ক্ষেত্রেও পুঁজিবাদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পণ্ডিতদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। যেমন, *দি পাওয়ার এলিট* বইটি লেখার পর সি.রাইট মিলসের জন্য ফাউন্ডেশন থেকে তহবিল হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়। পেশাগত সংগঠনের কোনো পদে ভিন্নমতাবলম্বীদের খুব কমই নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া সম্মানজনক বিভিন্ন বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণের ব্যাপারে এবং প্রভাবশালী পেশাগত জার্নালের সম্পাদকীয় পরিষদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও তাঁদের নিয়মিতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়। অপরদিকে, অর্থনৈতিক কৃচ্ছতার ব্যাপারে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনগুলোর দৃঢ় ঘোষণা সত্ত্বেও তারা মাত্র এক রাতের উপস্থিতির জন্য রক্ষণশীল চিন্তাবিদ উইলিয়াম বাক্লি বা জর্জ উইল, যুদ্ধাপরাধী হেনরি কিসিঞ্জার বা আলেকজান্ডার হেইগ এবং সাজাপ্রাপ্ত ওয়াটার গেট অপরাধী জি. গর্ডন লিডিকে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বিপুল অর্থের সম্মানী প্রদান করে।[৬১]

মুক্তচিন্তার প্রতিবন্ধক মার্কিন রাষ্ট্রব্যবস্থা সবসময়ই প্রগতিশীল ও ন্যায়ভিত্তিক চিন্তাকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা চালিয়েছে। এভাবে ১৯৭২ সালে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যুদ্ধবিরোধী ও পুঁজিবাদবিরোধী রসায়নবিদ জন লামবার্ডির চাকরি স্থায়ী করতে অস্বীকার করেছিল তাঁর রক্ষণশীল ও ভিয়েতনাম যুদ্ধের ঘোর সমর্থক বিভাগীয় প্রধান।[৬২] এ ধারার সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে ২০০৬ সালে টুইন টাওয়ার হামলাকে অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা বলে দাবি করা ৭৫ জন শিক্ষককে চাকরিচ্যুত কিংবা জোরপূর্বক ছুটিতে পাঠানো।

হস্তক্ষেপের নীতিতত্ত্ব

হস্তক্ষেপ শব্দটি বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপের নির্দেশক, এজন্য কোনো সরল নৈতিক মূলনীতি দিয়েই একে ব্যাখ্যা করা যায় না। এক্ষেত্রে নীতি বিশ্লেষকদের জন্য আন্তর্জাতিক আইনগুলো খুব কমই সহায়ক হয়ে থাকে। কারণ হস্তক্ষেপের দুটো মূলনীতির মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান । এ দুটো নীতি হচ্ছেঃ আত্মরক্ষার অধিকার ও স্বশাসনের অধিকার। সকল জাতি হস্তক্ষেপকে বেআইনী বলে জানে। কিন্তু তারা এ প্রশ্নে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছায়নি যে, কোন ধরনের হস্তক্ষেপ বেআইনী। এ প্রসঙ্গে অনেকেই জাতিসংঘের ২ (৪) অনুচ্ছেদের অধ্যাদেশটিকে চূড়ান্ত মনে করেন। এখানে বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষ ও সরাসরি আগ্রাসনের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ ও ফলপ্রসূ প্রমাণ থাকা প্রয়োজন।[৬৩]

এ মূলনীতিটির আলোকে সাম্প্রতিক সিরিয়ায় হস্তক্ষেপের বিষয়টিকে যাচাই করা যেতে পারে। সিরিয়া হামলার পরিকল্পনাকে বৈধতা দিতে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি দামেস্কের কাছে বিদ্রোহীদের শক্ত ঘাঁটিতে রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহারে হাজার লোকের মৃত্যুর অভিযোগ তুলেছে। প্রত্যুত্তরে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার-আল-আসাদ বলেন, জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকদের দামেস্কে এনে তাদের হোটেলের ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে রাসায়নিক অস্ত্রে মানুষ হত্যা করে নিজের ক্ষতি আমি কেন করবো? এ প্রসঙ্গে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আলেকজান্দর লুকাশেভিচও প্রশ্ন তুলেছেন: ঘটনা ঘটবার কয়েক ঘন্টা আগেই কী করে রাসায়নিক হামলার অভিযোগ ও তথ্য-প্রমাণাদি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে যায়?[৬৪] অপরদিকে, চিকিৎসকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন মেডিসিন সান ফ্রন্টিয়ার্স (এমএসএফ) জানায়, বিদ্রোহীরা তাদের ওপর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ করার পর ঐদিন দামেস্কে তিনটি হাসপাতালে নিউরোটক্সিক লক্ষণযুক্ত রোগীরা আসে। তবে তারা রাসায়নিক অস্ত্রের শিকার কি না তা বৈজ্ঞানিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এদিকে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, সিরিয়ায় সরকারবিরোধী যোদ্ধারাই ওই রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের কাছে প্রমাণ আছে। একইভাবে সিরিয়া সরকারও দাবি করেছে, দামেস্কের কাছে ঐ রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছেন বিদ্রোহী যোদ্ধারা।[৬৫] সিরিয়ায় অবস্থানরত জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক কার্লা ডে পন্টে ও প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্কের বক্তব্য থেকেও তাঁদের মতের সমর্থন মেলে। কার্লা ডে পন্টে জানিয়েছেন শক্ত ও জোর সন্দেহ যে, বিদ্রোহীরাই এ কাজ করেছে।[৬৬] *দ্য ইনডিপেন্ডেন্টে* প্রকাশিত এক প্রবন্ধে রবার্ট ফিস্ক লিখেছেন: 'ইরাকে আমরা হামলা শুরু করেছিলাম নির্জলা মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে। সেসব মিথ্যা কথা রটিয়েছিল একদল প্রতারক ধোঁকাবাজ, জালিয়াত। আজকে একই ধরনের মিথ্যা রটিয়ে আবারও এক যুদ্ধ বাধাতে চলেছে ইউটিউব।

তাই বলে এর মানে এটা নয় যে, ইউটিউবে প্রচারিত বেসামরিক সিরীয় লোকজনের গ্যাস প্রয়োগে মৃত্যুর ছবিগুলো বানোয়াট। অর্থটা এই যে, এসব ছবির বিপরীত বাস্তবতা ফুটে ওঠে এমন যেকোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ চাপা দেওয়া হচ্ছে। যেমন, লেবাননের হিজবুল্লাহ্‌র যে যোদ্ধারা সিরিয়ার আসাদ সরকারের পক্ষে দামেস্কে যুদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যকার তিনজনও দৃশ্যত এই গ্যাসের বিষক্রিয়ায় একই দিনে অসুস্থ হয়েছেন, সম্ভবত টানেলগুলোর ভেতরে। বলা হচ্ছে, তাঁরা এখন বৈরুতের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সুতরাং এই প্রশ্ন উঠে আসে যে, সিরিয়ার সরকারই যদি গ্যাস প্রয়োগ করে থাকে, তাহলে হিজবুল্লাহ্‌র সদস্যরা এই গ্যাসে আক্রান্ত হন কী করে?[৬৭] পশ্চিমাদের দাবির অযৌক্তিকতা সম্পর্কে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এপি ও রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল-এর সঙ্গে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেন, 'সিরিয়ার সামরিক বাহিনী যখন বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহীদের পরাজিত করছে, তখন তাদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ হাস্যকর। তিনি বলেন, সিরিয়ার সামরিক বাহিনীই রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে এমন তথ্য-প্রমাণ থাকলে তা অবশ্যই নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপন করতে হবে।'[৬৮] কোনো প্রকার নিরপেক্ষ সূত্রের তদন্ত ছাড়াই প্রত্যক্ষ প্রমাণবিহীন অজুহাতে সিরিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি পশ্চিমাদের অশ্রদ্ধা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের মনোবৃত্তিকেই প্রকাশ করে।

তারপরেও তাঁরা এই আইনেরই দোহাই দিয়ে আক্রমণকে যুক্তিসিদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা আইনের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে হস্তক্ষেপকে বৈধতা দিতে তৎপর। এদের একজন ব্রিটিশ মানবাধিকার আইনজীবী এবং লেখক জেওফ্রি রবার্টসন। তিনি তাঁর *হিউম্যানিটি ঃ এ স্ট্রাগল ফর গ্লোবাল জাস্টিস* গ্রন্থে লিখেছেন, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ থেকে কাউকে নিরস্ত করতে বা তার জন্য কাউকে শাস্তি দিতে কখনোই নিরাপত্তা কাউন্সিলের অনুমোদনসূচক প্রস্তাবের দরকার হয়নি। এ ধরনের বুদ্ধিজীবীরা ২০০৫ সালে প্রণীত 'রেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট' (সুরক্ষার দায়িত্ব) আদর্শটিকে তাঁদের যুক্তিপ্রয়োগের স্বার্থে ব্যবহার করে থাকেন। এতে বলা হয়েছে, "গণতন্ত্র, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং 'এথনিক ক্লিন্সিং' বা জাতিগত নির্মূলকরণ— এ চার ধরনের অপরাধ মাস এট্রোসিটি ক্রাইম বা ব্যাপক নৃশংস অপরাধ। এসব পরিস্থিতি থেকে নাগরিকদের সুরক্ষা দেয়া সব রাষ্ট্রের দায়িত্ব।" কিন্তু রাষ্ট্র তাতে ব্যর্থ হলে আন্তর্জাতিক সমাজ তা নীরবে দেখতে পারে না, তাদেরও দায়িত্ব আছে। সুরক্ষার দায়িত্ব বা 'আর২পি'র অজুহাত তুলে যাঁরা সিরিয়ায় হস্তক্ষেপকে বৈধতা দিচ্ছেন তাঁদের

যুক্তি হলো, যদি সিরিয়া সরকার তার জণগণের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে থাকে, তবে তারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসমূহের দায়িত্ব হচ্ছে সুস্পষ্ট আইনের বিধান না থাকলেও সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করা, যা জাতিসংঘের সদস্যরা অনুমোদন করেছেন তার আওতায় ব্যবস্থা নেয়া। কিন্তু এ ধরনের পরিস্থিতি বিবেচনা করে আর২পি করা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে অনেকের মনেই সংশয় রয়েছে। ২০০০-এর প্রথম দশকের গোড়ায় এ ধারণার অন্যতম প্রবক্তা জাতিসংঘে কানাডার দূত পল হাইনবেকার সম্প্রতি বলেছেন, সিরিয়া পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদনের কোনো সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি মনে করেন না। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, জাতিসংঘের আদর্শ অনুসারে আর২পি কেবল তখনই ব্যবহার করা যাবে, যখন যে হুমকির বিরুদ্ধে শক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যবহৃত শক্তিকে হতে হবে তার আনুপাতিক। অর্থাৎ, তার এই হুমকির বিরুদ্ধে সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে এবং যেন তার ভালোর চেয়ে খারাপ করার আশঙ্কা না থাকে। আর সিরিয়ার ক্ষেত্রে কেউই খারাপের চেয়ে ভালোর গ্যারান্টি দিতে পারবেন না।[৬৯]

সিরিয়ার বিরুদ্ধে সম্প্রতি যে অভিযোগ আনা হচ্ছে তা আমাদের ইরাকের কথা মনে করিয়ে দেয়। রাসায়নিক অস্ত্র থাকার অজুহাতেই ইরাকে সামরিক হস্তক্ষেপ চালানো হয়, যুদ্ধের পরে এ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বে তাই এর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভ সংঘটিত হচ্ছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হোয়াইট হাউসের সামনে বিক্ষুব্ধ জনতাকে ‘সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত’, ‘ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়াঃ সাম্রাজ্যের জন্য অন্তহীন যুদ্ধ’ প্রভৃতি প্ল্যাকার্ড বহন করে বিক্ষোভ করতে দেখা যায়। প্রতি দশ জনে ছয়জন মার্কিনিই সিরিয়া অভিযানের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে। যে যুক্তরাষ্ট্র নিজ দেশের আইন ভেঙ্গে গণহত্যাকারী পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে অস্ত্র সরবরাহ করে শক্তিশালী করেছে, নিজেই ভিয়েতনাম, ইরাক, আফগানিস্তানে অজস্র যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত হয়েছে, ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরাইলের রাসায়নিক গণহত্যা ও ভূমিদখলে প্রত্যক্ষ সমর্থন জোগাচ্ছে, রোহিঙ্গা নিধনের জন্য মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে উল্টো আরও কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষার জন্য সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করছে, সে আজকে সিরিয়া আগ্রাসনকে বৈধতা দিতে আর২পির দোহাই দিচ্ছে। আমাদের আরো মনে রাখা দরকার যে, আর২টুপিতে বেশ কয়েকটি রক্ষাকবচের উল্লেখ রয়েছেঃ চলমান হত্যাযজ্ঞ বা নৃশংস ঘটনার শক্তিশালী প্রমাণ থাকতে হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় কূটনীতি ও অবরোধের মতো শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ অবশ্যই থাকতে হবে। বিদেশি বাহিনীকে ব্যবহারের লক্ষ্য হতে

হবে অরাজকতার অবসান ঘটানো এবং বেসামরিক জনগণকে রক্ষা করা। আবার সর্বোচ্চ বৈধতা পাওয়ার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন থাকা উচিত। তবে সিরিয়ায় এবারের সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক সামরিক হস্তক্ষেপে এ পর্যন্ত সর্বসম্মতির লক্ষণ নেই। কারণ নিরাপত্তা পরিষদের এক বা একাধিক স্থায়ী সদস্য এই পদক্ষেপের বিরোধী।[৭০] তাছাড়া ভিয়েতনাম, ইরাক, আফগানিস্তান যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমাদের বলে দেয়, এসব যুদ্ধে নিরীহ বেসামরিক জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং, আর২পির আদর্শ মেনে বেসামরিক জনগণকে রক্ষা করে যুদ্ধ করা মার্কিন বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হওয়ার কথা নয়।

জে.ই. হেয়ার ও ক্যারি.বি.জয়েন্ট তাদের *Ethics and International Affairs* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, বলপূর্বক হস্তক্ষেপকে কেবল তখনই বৈধতা দেয়া যায়, যখন তা ন্যায়যুদ্ধ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করবে। এসব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

১) এ হস্তক্ষেপ হবে বিরুদ্ধ পক্ষের হস্তক্ষেপের প্রতিক্রিয়ামাত্র ।

২) অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সংহতি রক্ষার জন্য এ হস্তক্ষেপ হতে পারে একটি প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ।

৩) এ হস্তক্ষেপকে হতে হবে একটি ভারসাম্যমূলক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার উপায়, অস্থিতিশীল অবস্থার স্রষ্টা নয়।

৪) সাফল্যের একটি যৌক্তিক সম্ভাবনা থাকতে হবে।

৫) মৌলিক সমস্যাবলির মানবিক ও গঠনমূলক সমাধানের জন্য এ হস্তক্ষেপ হতে পারে একটি সর্বশেষ হাতিয়ার।

৬) আনুপাতিকভাবে এর পরিণতি এটি অর্জনের উপায় থেকে অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

৭) কোনো মৌলিক নৈতিক মূলনীতি লংঘন করা যাবে না। যেমন, হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকা প্রয়োজন।[৭১]

ন্যায়যুদ্ধ তত্ত্বে উপর্যুক্ত নীতিসমূহ অনুসরণের কথা বলা হয়। প্রথম নীতির আলোকে যদি আমরা ভিয়েতনাম, ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া বা সিরিয়া আগ্রাসনকে বিবেচনা করি, তাহলে দেখবো যে, এসব দেশের সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আগ্রাসী ভূমিকা নেয়া হয়নি যার প্রেক্ষিতে আক্রমণকে বৈধতা

দেয়া যেতে পারে। সম্প্রতি সিরিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে আনীত রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগটিকে যদি যুক্তির নিরীখে দেখা হয় তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে, সরকার বাহিনী বিদ্রোহীদের তুলনায় শক্ত অবস্থানে। এমতাবস্থায় তার জন্য রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার মোটেও বিচক্ষণতার পরিচায়ক নয়। অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থানে থাকা ও বহিঃশত্রুদের মদদপুষ্ট বিদ্রোহী বাহিনী রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে দু'ধরনের উপযোগিতা পাবে। প্রথমত, সরকার বাহিনীকেও পর্যুদস্ত করা যাবে। দ্বিতীয়ত, এর দায়ভার সরকারের কাঁধে চাপিয়ে তাদের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল বিদেশি প্রভুদেরও দেশে আনার পথ সহজ হবে। এজন্য অনেকেই মনে করছেন, বিদ্রোহীদের প্রত্যক্ষভাবে সমর্থনদানকারী রাষ্ট্র ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সহায়তায় এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। কারণ ইসরাইলের ইনোন পরিকল্পনা* বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা এখন সিরিয়া। সুতরাং মার্কিন সমরবাদী ও তার মিত্রশক্তিগোষ্ঠী কখনো আত্মরক্ষার জন্য কারও ওপর হামলা চালায় না, বরং কোনো ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই তাদের মদদপুষ্ট কোনো গোষ্ঠীর সহায়তায় আগ্রাসন পরিচালনা করে যা প্রথম মূলনীতির সুস্পষ্ট বিরোধিতা করে।

দ্বিতীয় নীতিতে, অভ্যন্তরীণ সংহতি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। মার্কিন সমরবাদ সংহতির পরিবর্তে সবসময় বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করেছে। যেমন, আরিস্তিদের শাসনাধীন স্থিতিশীল হাইতি মার্কিন হস্তক্ষেপে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তাদের পছন্দনীয় শাসক রাউল সিড্রাসের আমলে অভ্যন্তরীণ সংহতি বিনষ্ট হয়ে যায়। সম্প্রতি মিসরে মার্কিন হস্তক্ষেপে গণতান্ত্রিক সরকারের উৎখাত ঘটানো হয় এবং মার্কিন মদদপুষ্ট সেনাবাহিনী গণতন্ত্রপন্থীদের নির্বিচারে হত্যা করে সহিংস পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এ ধরনের হস্তক্ষেপে কখনোই অভ্যন্তরীণ সংহতি রক্ষা হয় না, বরং তাকে ধ্বংস করা হয়।

তৃতীয় নীতিতে, হস্তক্ষেপের ইতিবাচক ফলপ্রসূতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এজন্য প্রয়োজন স্বতস্ফুর্ত জনসমর্থন। মিসর ও তিউনেসিয়ায় দীর্ঘদিনের দুই স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ ছিল

* ১৯৮২ সালে প্রণীত ইনোন পরিকল্পনা অনুসারে, আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে জাতিগত-গোত্রগত-সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করে মার্কিন-ইসরায়েলের কাঙ্ক্ষিত ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ইনোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দুটো লক্ষ্যমাত্রা আছে। প্রথমত, ইসরায়েলকে টিকে থাকার জন্য একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করা। দ্বিতীয়ত, পুরো অঞ্চলকে নৃতাত্ত্বিক ও সম্প্রদায়গত পার্থক্যের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত করা। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইসরায়েলের সামরিক ও গোয়েন্দা বিভাগের বড় অংশ বৃহত্তর ইসরায়েলের ধারণায় বিশ্বাসী। ইহুদীবাদের প্রতিষ্ঠাতা থিওডর হার্জেল তাঁর গ্রন্থে মিসর থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত ইসরায়েলের সীমানা হবে বলে উল্লেখ করেছিলেন। ইহুদী তাত্ত্বিক রাব্বি ফিশকম্যান তাঁর গ্রন্থে সিরিয়া ও লেবাননের একটি অংশকে ইসরায়েলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

একেবারেই স্বতস্ফুর্ত। এ ধরনের বিদেশি হস্তক্ষেপমুক্ত গণআন্দোলনের ফলাফল সাধারণত গঠনমূলক হয়ে থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপে লিবিয়া ও সিরিয়ায় যে অস্ত্রধারী তরুণদলের আবির্ভাব ঘটে তা মোটেই জনগণের ভাবনাপ্রসূত নয়। এক্ষেত্রে এর পরিণতি গঠনমূলক না হয়ে বরং ধ্বংসমূলক এক অস্থিতাবস্থার জন্ম দিয়েছে। পশ্চিমারা যখন উপলব্ধি করে, লিবিয়া ও সিরিয়ায় কোনো স্বত:স্ফুর্ত গণআন্দোলন সম্ভব নয়, তখন তারা আল-কায়েদাসহ বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীকে ভারী মারণাস্ত্র ও সাঁজোয়া যান-বাহনে পূর্ণ করে এক ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। অতএব, ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য ও সম্পদ দখলের নেশায় পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী সামরিক হস্তক্ষেপ কোনো ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে না।

চতুর্থ নীতিতে, হস্তক্ষেপের যৌক্তিক সাফল্যের দিকটিতে জোর দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি *পেন্টাগন পেপার্স* নামে প্রকাশিত মার্কিনিদের গোপন নথিতে ১৯৫৫-১৯৭৫ সালে সংঘটিত ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যর্থতার নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। সোভিয়েত সাম্যবাদকে রুখতে মার্কিনিদের এ কৌশলগত যুদ্ধে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে। এসব বিষয়কে জনগণের কাছ থেকে আড়াল করার জন্য মার্কিন সরকার একের পর এক মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে এমনকি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জনসন কংগ্রেসের কাছেও মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। তাই মার্কিন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যর্থতা থেকে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে আরও সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সংঘটিত ইরাক যুদ্ধের অর্থহীনতাও এখন ইঙ্গ-মার্কিন নাগরিকদের কাছে সুস্পষ্ট। বিবিসির দেয়া সংবাদ থেকে জানা যায়, যুক্তরাজ্যের এসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক এক জরিপের তথ্য অনুযায়ী, দেশটির মাত্র ২ শতাংশ ইরাক যুদ্ধকে সফল মনে করে । আর মার্কিনদের মধ্যে এই হার মাত্র ৮ শতাংশ । লন্ডনে অবস্থিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের বিশেষজ্ঞ টবি ডজ বলেন, জনমনে এ ধারণা হয়েছে যে, তাদের দেশ মিথ্যা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ইরাক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। আর সেই যুদ্ধ ইরাককে আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় নিয়ে যেতে পারেনি। কাজেই আবার একই ধরনের যুদ্ধে জড়ানোর পক্ষে কী যুক্তি রয়েছে ?[৭২] এসব অসফল যুদ্ধের অভিজ্ঞতা জনমনেও যুদ্ধবিরোধী প্রবণতা সৃষ্টি করেছে যার প্রভাব সাম্প্রতিক জরিপগুলোতে লক্ষণীয়। রয়টার্সের এক জরিপে দেখা গেছে, ৬০ শতাংশ মার্কিন সিরিয়ায় আক্রমণের বিপক্ষে, আগ্রাসন চায় মাত্র ৯ শতাংশ।[৭৩] ইরাক-আফগান-পাকিস্তানে অভিযানের ব্যর্থতা ঘোচাতে মার্কিন সমরবাদ এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে ঝুঁকছে। মিয়ানমারে জাতিগত সংঘর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ার

সাম্প্রতিক সহিংসতা এরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিশ্লেষকরা মনে করছে। অপরদিকে, উত্তর আফ্রিকাকে ঘিরে রয়েছে আরেক পরিকল্পনা এবং মধ্যপ্রাচ্য ঘিরে ইসরাইলের ইনোন পরিকল্পনা। সাম্রাজ্যের নেশায় মত্ত এ উগ্র সমরবাদ কখনোই সাফল্যের নির্ধারক হতে পারে না, বরং তা বিশ্ব পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তুলেছে।

পঞ্চম নীতিতে মৌলিক সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বশেষ হাতিয়ার হিসেবে হস্তক্ষেপকে বৈধ করার ন্যায্যতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে মৌলিক সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে তা আরও বাড়িয়ে দেয়া হয় কিংবা কৃত্রিমভাবে মানবিক সংকট সৃষ্টি করা হয়। ইরাক আগ্রাসনের পর ইরাকের মতো একটি ধনী দেশের জনসাধারণ দরিদ্র হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকে। মার্কিনিদের ব্যবহৃত রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের কল্যাণে আজও সেখানে বিকলাঙ্গ শিশু জন্মায়। লিবিয়া ও সিরিয়াও একই পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। ষষ্ঠ নীতিতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপায়ের চেয়ে পরিণতি ভালো হওয়াকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কিন্তু গুটিকয়েক কোম্পানির মুনাফার স্বার্থে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী সমরে সার্বিকভাবে খারাপ পরিণতি সৃষ্টি হয়। এতে আগ্রাসী রাষ্ট্র ও আগ্রাসনের শিকার উভয় রাষ্ট্রেরই জনগণের জীবন-যাত্রার মান নেমে যায়। কারণ যুদ্ধের ব্যয়-নির্বাহ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের জনগণের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানো হয়। ফলশ্রুতিতে সার্বিকভাবে অর্থনীতির ওপর চাপ পড়ে। সেই চাপের ভারও জনগণকেই বহন করতে হয় চাকরি হারিয়ে কিংবা রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা পরিত্যাগ করে। এসবের বিনিময়ে কেবল কতিপয় ধনী কোম্পানির রমরমা ব্যবসার পথ সুগম হয়।

সুতরাং, সাম্রাজ্যবাদী সমরবাদ মাত্রাগতভাবে এক ধরনের ভারসাম্যহীন অবস্থার উদগাতা। শেষ নীতিতে মৌলিক নৈতিক অধিকার রক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিগত দশকগুলোতে সংঘটিত সাম্রাজ্যবাদী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমরবাদের হত্যাযজ্ঞের দীর্ঘ তালিকা দেয়া হলেই তাদের হস্তক্ষেপের অসারতা প্রমাণিত হবে।

ন্যায়যুদ্ধ তত্ত্ব ও বিপ্লবাত্মক যুদ্ধ

ন্যায়যুদ্ধ তত্ত্ব মূলত বৈষম্যের নীতি ও আনুপাতিক নীতি–এ দুটো মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বৈষম্যের নীতি যেকোনো নিরীহ বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে হত্যাকাণ্ডের বিরোধিতা করে। এক্ষেত্রে জনগণকে নিরীহ

ও অনিরীহ– দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে নিরীহ মানুষকে যুদ্ধের আওতা থেকে বাদ দেয়া হয়। আনুপাতিক নীতিতে একটি আনুপাতিক রাজনৈতিক ও সামরিক সমাধানের সুপারিশ করা হয়। ন্যায়যুদ্ধ যুদ্ধের আপাত ক্ষতির মধ্য দিয়ে চূড়ান্তভাবে ভালো কিছু অর্জন করতে চায়। অর্থাৎ, কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণে চূড়ান্তভাবে মন্দের অপসারণ ঘটিয়ে সর্বাত্মক শুভ অর্জন করাই আনুপাতিক নীতির মূলকথা। যেমন, রাষ্ট্রের উচ্চতর কোনো স্বার্থরক্ষায় রাজনৈতিকভাবে যুদ্ধকে সমর্থন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যে সামারিকপন্থা অবলম্বন করা হবে তাকে আনুপাতিকভাবে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিসরেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে। সুতরাং, ন্যায়যুদ্ধ তত্ত্ব কোনো নীতিগত যুক্তিসিদ্ধ কারণে যুদ্ধকে সমর্থন করে এবং প্রগতি ও ন্যায় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধকে অব্যাহত রাখতে চায়।

আমরা আগেই যুদ্ধের লেনিনীয় বিশ্লেষণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, এ ধরনের ন্যায়সঙ্গত লক্ষ্যে গণমানুষের মুক্তির জন্য পথ খোঁজা হয় কোনো দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কিংবা শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর অধিকার রক্ষার যুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধগুলোই সংঘটিত হয় একটি দেশের সাধারণ মানুষের সম্পদ বিদেশী লুণ্ঠনকারীদের দখলদারিত্বে আনার জন্য। এক্ষেত্রে যুদ্ধের লক্ষ্য আদৌ ন্যায়সঙ্গত নয়। আবার নিরীহ জনগোষ্ঠীর সম্পদ কেড়ে নেয়ার জন্য যে যুদ্ধ তাতে কখনোই নিরীহ মানুষকে আক্রমণের আওতা থেকে বাদ দেয়া হয় না। বরং নিরীহ মানুষই হয়ে ওঠে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। এ প্রসঙ্গে ভিয়েতনাম যুদ্ধের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। এ যুদ্ধে শিশুদেরকেও আক্রমণের আওতা থেকে বাদ দেয়া হয়নি। মার্কিনিরা স্থানীয় বিদ্রোহী বাহিনী গঠন করে বেসামরিক জনগোষ্ঠীর ওপর নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চালায়। মার্কিন মেরিন বাহিনীর কমান্ডার জন কুইগলের অনুভূতিকথন থেকে জানা যায়, তিনি যখন তাঁর মেরিন কোর ইউনিটকে বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতেন তখন সৈন্যরা প্রায়শই যুদ্ধযাত্রার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতো। তখন তিনি সেনাদের বোঝানোর চেষ্টা করতেন, ভিয়েতনামের উপকূলে ওই অঞ্চলের মহাদেশীয় সোপানে তেল আছে, ভিয়েতনামের বিপুল জনসংখ্যা মার্কিন পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ বাজার এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে দূরপ্রাচ্য পর্যন্ত সমুদ্রপথ ভিয়েতনাম নিয়ন্ত্রণ করে।[৭৪] এ থেকেই বোঝা যায়, তেলসম্পদ লুণ্ঠন, বাজার দখল ও সমুদ্রপথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য যে যুদ্ধ পরিচালিত হয় তার উদ্দেশ্য আদৌ ন্যায়সঙ্গত নয়। সুতরাং ন্যায়যুদ্ধ তত্ত্ব কখনোই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত মনে করে না।

কেই নিলসেন* তাঁর *Violence and Terrorism : Its Uses and Abuses* গ্রন্থে বিপ্লবাত্মক যুদ্ধের ধারণা প্রদান করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি দু'ধরনের বিপ্লবাত্মক সহিংসতার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। প্রথমত, একটি নতুন ও উন্নত সমাজকাঠামো সৃষ্টির জন্য প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল্যোৎপাটনের জন্য সহিংসতা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, একটি নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থার মধ্যে আইনসিদ্ধভাবে কোনো পরিবর্তন আনার জন্য অনেকসময় সহিংসতা চালানো হয়।[৭৫] প্রথম বৈশিষ্ট্যটির দৃষ্টান্ত হিসেবে কিউবা বিপ্লবের কথা বলা যায়। এতে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে দেশটি মানব উন্নয়নে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে এবং পুরনো বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে একটি নতুন সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি বাংলাদেশে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে তুলনীয়। এক্ষেত্রে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা অটুট রেখে একনায়কতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে সাংবিধানিকভাবে একটি নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত প্রগতির দিকে যাত্রা লক্ষণীয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যুদ্ধে উপর্যুক্ত কোনো বৈশিষ্ট্যেরই সাক্ষাৎ মেলে না। উপরন্তু প্রগতির পরিবর্তে অধঃগমনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিপ্লবাত্মক যুদ্ধের প্রথম শর্তাধীনে যদি আমরা ইরাক যুদ্ধকে বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে দেখা যাবে এতে প্রচলিত সমাজকাঠামোর পরিবর্তন তো হয়ইনি, বরং যুদ্ধের মাধ্যমে বৈদেশিক দখলদারিত্বের পাশাপাশি তাদের আজ্ঞাবহ যে সরকারের আবির্ভাব ঘটে তার হাতে দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থার চূড়ান্ত অবনতি ঘটে। ফলে ধনী একটি দেশ নিমেষেই দারিদ্র্যকবলিত হয়ে পড়ে। এ ধরনের পরিণামকে কখনোই ইতিবাচক বলা যায় না। অপরদিকে, দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে যদি সাম্প্রতিক মিশরের সামরিক অভ্যুত্থানকে যাচাই করা হয়, তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে, মার্কিন মদদপুষ্ট এ অভ্যুত্থানটি কোনো আইনসিদ্ধ পরিবর্তন নয়। এ অভ্যুত্থানের ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও নিপীড়নের মধ্য দিয়ে মানবাধিকার পরিস্থিতির চূড়ান্ত অধ:পতন ঘটে। তাই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কখনোই বিপ্লবাত্মক যুদ্ধ নয়। ইরাক ও মিশরের মতো অগণিত দেশে তাদের পরিচালিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমরবাদে অর্থনৈতিক ও মানবিক

---

* বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তাবিদ। তিনি বর্তমানে ক্যালগ্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। এর আগে তিনি এ্যামহার্স্ট কলেজ, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রুকলিন কলেজ, নিউইয়র্কের সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রাজুয়েট সেন্টার' ও অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে : *Equality and Liberty : A Defense of Radical Egalitarianism* (1985), *Marxism and the Moral Point of View* (1988), *After the Demise of the Tradition : Rorty, Critical Theory, the Fate of Philosophy* (1991) প্রভৃতি।

পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতি ঘটেছে। এসব নেতিবাচক পরিণতি সবসময়ই প্রগতির পরিপন্থী এবং বিপ্লবাত্মক যুদ্ধের প্রকৃতিবিরোধী।

উপর্যুক্ত নীতিতত্ত্বগুলোর আলোকে সার্বিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে, কোনো তত্ত্বই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে নীতিসিদ্ধ করছে না। আজকের যুগের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধগুলো মানবিক অধিকার ও গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে পরিচালিত সম্পদ ও বাজার দখলের নিষ্ঠুর সহিংসতা। যেকোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে আক্রমণকে অযৌক্তিকভাবে বৈধ করে তুলে দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করা, তার সম্পদ কুক্ষিগত করা এবং দেশটিকে তাদের বিনিয়োগক্ষেত্রে পরিণত করাই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তারা চালায় নির্মম দমন, নিপীড়ন ও নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ। তাই কোনো নৈতিক মতবাদই সাম্রাজ্যবাদের এ অন্যায্য মনোভাবকে যুক্তিসিদ্ধ বলে প্রতিপন্ন করে না। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সর্বাবস্থায় অন্যায় যুদ্ধ। কিছুসংখ্যক কর্পোরেশনের হাতে সারা বিশ্বের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে লড়াই তা সফল হওয়াও কঠিন। ভিয়েতনাম, ইরাক ও আফগান যুদ্ধের ব্যর্থতা তাই প্রমাণ করে। কিন্তু সম্পদ দখলের বিকৃত মনোভাব নীতি-নৈতিকতা ও যুক্তির ধার ধারে না। এ কারণে একের পর এক ব্যর্থতার পরেও ক্ষমতার নেশায় উন্মুখ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো মরিয়া হয়ে সমরবাদী পথেই তাদের অন্যায্য লক্ষ্যগুলোর বাস্তবায়ন ঘটাতে চাইছে। আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদ আরও বেশী নিষ্ঠুর ও সহিংস হয়ে উঠেছে। ফলে বিশ্বপরিস্থিতি ক্রমশ জটিল ও ঘোলাটে হয়ে উঠছে এবং আরও একটি বিশ্বযুদ্ধের পথ প্রশস্ত করছে।

তথ্যসূত্র

১. George Modelski, æThe Theory of Long Cycles and U.S. Strategic Policy", in Robert Harkavy & Kolodziej. (eds.), *American Security Policy and Policy Making*, United States of America : D.C. Health and Company, 1980, p.4.

২. V.I.Lenin, æSocialism and War", in *Collected Works*, Moscow: Progress Publishers, 1915, Vol. 21.

৩. V.I. Lenin, æA Caricature of Marxism", in *Collected Works*, London: Lawrence and Wishart, Vol. 23, 1960, p. 33.

৪. Willi Dickhut, *War and Peace and the Socialist Revolution*, Germany: Drukerei Neur Weg GmbH, 2002, pp. 10-11.

৫. *Ibid*, pp. 11-12.

৬. *Ibid*, p. 12.

৭. মাইকেল প্যারেন্টি, অনু. ওমর তারেক চৌধুরী, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৫, পৃ. ৫৩।

৮. হায়দার আকবর খান রনো, *আজকের সাম্রাজ্যবাদ*, ঢাকা: গণপ্রকাশন, ২০০৬, পৃ. ১১।

৯. Noam Chomsky, *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Domination*, New York: Henry Holt and company, LLC., 2003, p.95.

১০. *Ibid*, p. 12.

১১. মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৫৫-৫৬।

১২. Willi Dickhut, *War and Peace and the Socialist Revolution*, pp. 199-201.

১৩. *Ibid*, pp. 221-22.

১৪. *Ibid*, pp. 225-27, 224.

১৫. Roger Stern, "The Iranian Petroleum Crisis and the United States National Security", in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 104, No. 1, 2nd January, 2007, pp. 377-82.

১৬. মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৫৬-৫৭।

১৭. Christian Fuchs, æNew Imperialism: Information and Media Imperialism?", *Global Media and communication*, vol. 6(1), 2010,

pp. 53-54.

১৮. মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৯০।

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০।

২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪।

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২।

২২. *Wikipedia*, 2013.

২৩. মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ১২২, ১২৪।

২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪।

২৫. *প্রাগুক্ত*।

২৬. পিটার কাস্টার্স, "তেজস্ক্রিয় অস্ত্র ব্যবহার ও লিবিয়া যুদ্ধ", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১১, ২৩ মে, ১২।

২৭. B'Tselem, *Land Grab: Israel's Settlement in the West Bank. 13.* Online at: http://www.btselem.org/English/Publications/Summaries/ Land Grab Map. asp. [Accessed May, 2002]

২৮. Noam Chomsky, *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Domination*, p.165.

২৯. ইব্রাহীম চৌধুরী, "সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ১২৮ লাখ কোটি ডলার" *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১১, ৪ মে, ১০।

৩০. তারিক রামাদান, অনু. আহসান হাবীব, "আরব ও পাশ্চাত্যের সম্পর্কের হেমন্তকাল", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১১, ১২ মে, ১২।

৩১. মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ১২৬-২৭।

৩২ আব্দুল গাফফার চৌধুরী, "ওসামা বিন লাদেন নিহত। তিনি কি দীর্ঘজীবী হবেন?", *দৈনিক যুগান্তর*, ২০১১, ৩ মে, সম্পাদকীয় পাতা।

৩৩. Noam Chomsky, *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Domination*, p. 17.

৩৪. মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৫৩-৫৪।

৩৫. Jaya Narain, æFury, academics claim 9/11 was an inside job”, *Daily mail*, avialable from www. daily mail. co. uk. [Accessed 2006]

৩৬. Noam Chomsky, *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Domination*, pp. 79-80.

৩৭. *Ibid*, p. 153.

৩৮. *Ibid*, p.162.

৩৯. Noam Chomsky quotes from Richard Falk's æResisting the Global Domination Project,” interview with Zia Mian and Smith Kothari, *Frontline* (India) 20, no 8 (12 April, 2003) in his *Hagemony or Survivals*, 2003, p.13.

৪০ Martin Ceadel, *Thinking about Peace and War*, Oxford: Oxford University Press, 1987, pp. 102-03.

৪১. Michael Parenti, "To kill Iraq", available from www.Michael Parenti.org.com. [Accessed 2003].

৪২. Hans Morgenthau, æSix Principles of Political Realism”, in Lawrence Freedman (ed.), *War*, Great Britain : Oxford University Press, 1994, p. 162.

৪৩. মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৬৪-৫ ।

৪৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫.

৪৫. Lawrence Freedman and Efraim Karsh, æWhy Bush Went to War”, in Lawrence Freedman (ed.), 1994, p. 169.

৪৬. মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৬৩ ।

৪৭. *প্রাগুক্ত* ।

৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪ ।

৪৯. Hans Margenthau, æSix Principles of Political Realism”, in *War*, p. 165.

৫০. নোয়াম চমস্কি, “গণতন্ত্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের গলাবাজি খুব বাজে রসিকতা”, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ডেভিড বারসামিয়ান, অনু. আতাউর রহমান, সাক্ষাৎকার ২০১৩, *অন্য এক দিগন্ত*: ৬৮।

৫১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯-৭০।

৫২. Hans Morgenthau, æSix Principles of Political Realism”, in *War*, p. 166.

৫৩. Gerry Wallace, æWar, Terrorism and Ethical Consistency”, in Brenda Almond, (ed.), *Introducing Applied Ethics*, Oxford UK & Cambridge USA : Blackwell publishers, 1995, p. 306.

৫৪. মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ১৫৫।

৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১।

৫৬. মশিউল আলম, “ দেশপ্রেমের আমেরিকান মডেল”, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১২, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১২।

৫৭. Hans Morgenthau, æSix Principles of Political Realism”, in *War*, p. 167.

৫৮. মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ১৭৭-১৮০।

৫৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০-৮২।

৬০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২-৮৩।

৬১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪-৮৫।

৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭।

৬৩. J.E. Hare, & Carey B. Joynt, "Intervention", in *War*, p. 182.

৬৪. ফারুক ওয়াসিফ, “সিরিয়ায় পোস্টপেইড নোবেলজয়ীর প্রিপেইড যুদ্ধ”, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৩, ২৯ আগস্ট, ১০।

৬৫. *দৈনিক প্রথম আলো*, ‘সামরিক পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে পেন্টাগন’, ২০১৩, ২৫ আগস্ট: ০৭।

৬৬. ফারুক ওয়াসিফ, “সিরিয়ায় পোস্টপেইড নোবেলজয়ীর প্রিপেইড যুদ্ধ”, *প্রাগুক্ত*।

৬৭. রবার্ট ফিস্ক, ‘কার পক্ষে লড়ছেন ওবামা!’, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৩, ৩০ আগস্ট, ১৩।

৬৮. *দৈনিক প্রথম আলো*, "হামলার পক্ষে মার্কিন সিনেট কমিটি", ২০১৩, ৫ সেপ্টেম্বর : ০৯।

৬৯. আলী রীয়াজ, "সিরিয়ায় সম্ভাব্য মার্কিন হামলা নিয়ে নানা প্রশ্ন", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৩, ৫ সেপ্টেম্বর, ১০।

৭০. *দৈনিক প্রথম আলো*, "বিদেশি হস্তক্ষেপের বৈধতা আছে কি?", ২০১৩, ২৯ আগস্ট: ০৮।

৭১. J.E.Hare, & Carey B. Joynt, æIntervention", in *War*, 1994, p. 184.

৭২. *দৈনিক প্রথম আলো*, 'ইরাক যুদ্ধের ছায়া', ২০১৩, ৩০ আগস্ট: ০৮।

৭৩. ফারুক ওয়াসিফ, "সিরিয়ায় পোস্টপেইড নোবেলজয়ীর প্রিপেইড যুদ্ধ", *প্রাগুক্ত*।

৭৪. মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ১৪০।

৭৫. Haig Khatchadourian, æTerrorism and Morality", in Brenda Almond, (ed.), *Applied Philosophy*, London: Routledge, 1991, p. 122.

চতুর্থ অধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন

মার্কস পুঁজিবাদী উৎপাদনের সঙ্গে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার একটি সম্বন্ধ খুঁজে পেয়েছিলেন। তবে মার্কসের তত্ত্বে জাতি-রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শোষণের বিষয়টি স্থান পেলেও রাজনৈতিক-আঞ্চলিক ক্ষেত্রে এ শোষণ বিস্তৃত হওয়ার ধারণাটি ছিল না। পরবর্তীতে লেনিন তাঁর সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বে দেখান যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য থেকে একসময়ে আন্তর্জাতিক শোষণ কাঠামোর বিকাশ ঘটে। মূলত পুঁজি রপ্তানির মাধ্যমে এ শোষণ জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে। এসময়ে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনৈতিকভাবে এ বিশ্বকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়ার পাশাপাশি ভূ–খণ্ডগুলোকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত করে। এরূপ পুঁজি রপ্তানির অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা অসম অর্থনৈতিক বিকাশ। সাম্প্রতিককালে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের এরূপটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তিত বহুপাক্ষিক নব্য-উদারতাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত যাকে বিশ্বায়নের আবরণে নিরপেক্ষতার খোলস পড়ানো হয়। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তাদের এ নীতি একপাক্ষিক সমরবাদের জন্ম দেয় এবং অতিসম্প্রতি এর বাস্তবায়ন ঘটাতে তাদের প্রশাসনে নব্য-রক্ষণশীল নীতির উদয় ঘটে।

বাজারভিত্তিক পুঁজির পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়া অক্ষুণ্ন রাখতে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ এক ধরনের স্ববিরোধী যুক্তির অবতারণা করে। পরিবেশ সংরক্ষণ, শিশুশ্রম, স্যানিটারি মান, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, ডাম্পিং, মানবাধিকার, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ইত্যাদি নানা অজুহাত তুলে ও সুকৌশলে বিভিন্ন শর্তের জালে বন্দি করে উন্নত দেশের বাজারে তৃতীয় বিশ্বের পণ্য ও সেবার প্রবেশাধিকারকে বিঘ্নিত ও সংকুচিত করা হচ্ছে। অপরদিকে, আমদানি বাণিজ্যের শুল্কের হার হ্রাস, শুল্ক বিলোপ, পরিমাণগত বাধা প্রত্যাহার ও বিলোপ, প্যারা শুল্ক ও অ-শুল্ক বাধা-নিষেধ দ্রুত অপসারণ এবং আমদানি পদ্ধতি সহজীকরণের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের বাজারকে শিল্পোন্নত দেশের পণ্য ও সেবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার প্রক্রিয়াকে জোরদার করা হচ্ছে। ফলে বিশ্বায়নের বাণিজ্য উদারীকরণের সুফল একচেটিয়াভাবে উন্নত শিল্পায়িত ও নব্য-শিল্পায়িত দেশগুলো ভোগ করছে। এর ফলে শিল্পোন্নত দেশগুলোর মাঝে কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানিকারক দেশগুলোর বাণিজ্যে 'অসম বিনিময়'

ব্যবস্থা দিন দিন আরও জোরদার হচ্ছে, সেই সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের বাণিজ্য শর্তের ক্রমাবনতির ধারা যুক্ত হয়ে উন্নত বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মাথাপিছু আয় ও সম্পদ বৈষম্যকে দ্রচত বাড়িয়ে পর্বত প্রমাণ করে তুলছে।[১]

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতি

আশি ও নব্বইয়ের দশকে পুঁজিবাদ নব্য-উদারতাবাদকে তাদের মতাদর্শগত হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে যার মূলমন্ত্র ছিল ব্যক্তিমালিকানাকরণ ও সবকিছুকে পণ্যে পরিণত করা। এ নীতি সম্পদের ওপর পুঁজির অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে। এ প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপায়িত করা হয়। জনগণের অধিকার হরণ করে পুঁজির পুঞ্জিভবনের এ ধারায় প্রান্তস্থ দেশগুলোর কৃষি, শিল্প, আর্থিক বাজার সবকিছুকেই বহুজাতিক কর্পোরেশনের পুঁজির অধীনস্থ করা হয়। এর ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ভূমিহীন কৃষকদের আন্দোলন, বাঁধ নির্মাণ, বন উজাড় ও পরিবেশ অবক্ষয়বিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়। এছাড়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পাশাপাশি পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও নব্য-উদারতাবাদী রাষ্ট্রের প্রবর্তন ঘটায় জনগণের সুযোগ-সুবিধা সংকুচিত হয়ে পড়ে। নব্য-উদারতাবাদের এ আগ্রাসী তৎপরতা এখন বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে সংকট সৃষ্টি করেছে।[২] এ সংকটকে উপেক্ষা করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নব্য-রক্ষণশীল নীতির প্রবর্তন ঘটিয়েছে। এ নীতি অনুসরণ করে বলপূর্বক মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ কুক্ষিগত করে পুঁজির পুঞ্জীভবনের নতুন পথ খুঁজে নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য হলো "তেল উৎপাদকদের একচেটিয়া ক্ষমতা"[৩] এবং যেসব দেশ নিজস্ব তেল সম্পদকে জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করার উদ্যোগ নিয়েছে, তাদের সে উদ্যোগ বানচাল করা। কারণ বিশ্বের তেল সম্পদের নিয়ন্ত্রণ যার হাতে, বিশ্বের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণও তাদের হাতেই থাকে। তাই যুক্তরাষ্ট্র ২০০৩ সালে ইরাকে যুদ্ধ পরিচালনা করে। এ যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের তেল কোম্পানিগুলো করায়ত্ত করে।[৪]

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, পুঁজির পুঞ্জিভবনের জন্য কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ বলপূর্বক আগ্রাসন? লেনিন বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন যত জোরদার হয় সাম্রাজ্যবাদ ততই আগ্রাসী হয়ে ওঠে। সুতরাং, বিশ্বায়নবিরোধী ব্যাপক গণআন্দোলনই আজকের নব্য-সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষণশীল বলপ্রয়োগের নীতি গ্রহণে বাধ্য করেছে। তাহলে বিশ্বায়নবিরোধী আন্দোলনের পেছনের কারণগুলো কী? উত্তর আমেরিকান মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (NAFTA) এবং

জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ্স এ্যান্ড ট্রেডের (GATT) ১৯৯৩ সালের উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনার মাধ্যমে অতিজাতিক বা ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলোর স্বার্থ হাসিলের জন্য জাতি-রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব উপেক্ষা করার কৌশল[৫] অবলম্বন করা হয়েছিল। শিল্পোন্নত দেশগুলোর রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো, অনুন্নত দেশগুলোর খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বাধা দান, বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর একক পেটেন্ট সুবিধা, বেসরকারিকরণের মাধ্যমে জাতীয় রাষ্ট্রকে দুর্বল করে ফেলা, বিশ্বজুড়ে বেকারত্ব বৃদ্ধি, পৃথিবীব্যাপী ভোগের মাত্রায় চরম বৈষম্য বৃদ্ধি প্রভৃতি ছিল গ্যাটের মাধ্যমে বিশ্বায়নের অনিবার্য পরিণতি। এজন্য কিম মুডী[*১] (১৯৯৪) বলেছিলেন, গ্যাটের ৫০০ পাতার বিধিমালা বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বিরুদ্ধে নয়, সরকারগুলোর বিরুদ্ধেই পরিচালিত। দুর্বল দেশগুলোকে বঞ্চিত করে গ্যাট শক্তিশালী দেশগুলোকে উপকৃত করবে এবং আমাদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে রক্ষা করবে ধনীদের স্বার্থ।[৬]

তাই অনেক তাত্ত্বিকই নব্য-উদারতাবাদী বিশ্বায়নের কালকে ‘কল্যাণ রাষ্ট্রের পরবর্তী সময়’ বলে অভিহিত করেছেন। ডানকান কার[*২] তাঁর æReclaiming Equality in a Globalized World” প্রবন্ধে লিখেছেন: “কল্যাণ রাষ্ট্রের পরবর্তী পর্বে সামাজিক নীতিমালা এমনভাবে প্রণীত হয় যেন তা মুক্তবাজার অর্থনীতির জন্য অনুকূল হয়। বাজার যে অসমতা সৃষ্টি করে তা লাঘব করার পরিবর্তে কল্যাণ পরবর্তী রাষ্ট্রব্যবস্থা মুক্তবাজার অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করে অসমতার পরিস্থিতিকে আরও শোচনীয় করে তোলে। সরকার বাজার কার্যক্রমকে মুক্ত ও শক্তিশালী করার পাশাপাশি সম্পদের সমতাভিত্তিক বণ্টনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত মুনাফার স্তর বৃদ্ধিকে অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করে। এভাবে কল্যাণ পরবর্তী রাষ্ট্রের কাঠামো অসমতাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। কারণ এ রাষ্ট্রের সামাজিক কর্মসূচীর মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রতিযোগিতা। এ

---

*১ কিম মুডী একজন মার্কিন লেখক। তিনি ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক ও সামাজিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। ষাটের দশকের প্রথমার্ধে মুডী বাল্টিমোর ও মেরিল্যান্ডে “স্টুডেন্টস ফর ডেমোক্রেটিক সোসাইটি”র অর্থনৈতিক গবেষণা ও কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭৯ সাল থেকে তিনি স্বনির্ভর সমাজতান্ত্রিক সংঘসমূহ ও আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রীদের অংশ হিসেবে শ্রমের উপর বহু প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের হার্টফোর্ডশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের জেষ্ঠ্য গবেষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

*২ ডানকান কার একজন অস্ট্রেলীয় সংসদ সদস্য। তিনি অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেন এবং পেশাগত জীবনে একজন ব্যারিস্টার। পূর্বে তিনি এটর্নি জেনারেল ও কিটিং প্রশাসনের ন্যায় মন্ত্রী (১৯৯৩-৯৬) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। রাজনৈতিক জীবন শুরু করার আগে তিনি পাপুয়া নিউগিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীন ছিলেন। তিনি আইন বিষয়ক বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন।

রাষ্ট্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম একটি আয় নির্ধারণ করে এবং আয় বা সম্পদের পুনর্বণ্টনকে উৎসাহিত করে না"।[৭] সুতরাং, বিশ্বায়নের সময়কার এ রাষ্ট্রীয় কাঠামো উন্নত ও অনুন্নত উভয় রাষ্ট্রেই ধনীদের শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে যাতে ধনীরা আরও ধনী হয় এবং দরিদ্ররা আরও বেশি দরিদ্র হয়ে মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হয়। বৈশ্বিক পরিসরে এই অসমতা আরও শোচনীয় রূপ ধারণ করে।

ও'কনোর* পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের এ অন্যায্য প্রবণতা বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের দ্বৈত ও চূড়ান্তভাবে স্ববিরোধী ভূমিকা রয়েছে। পুঁজি পুঞ্জীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত সৃষ্টি করতে এটি একদিকে তার শ্রেণী চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখে, অপরদিকে সামাজিক কাঠামোর দিক থেকে এটি একটি জাতি হিসেবে নিজের সাধারণ কার্যক্রমকে আইনসিদ্ধ করতে চায় এবং সামাজিক সংহতি রক্ষা ও শ্রেণী স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এই আইনসিদ্ধ কাঠামোর অভ্যন্তরে গভীর সংকট সৃষ্টি করে।[৮] বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট অতিজাতিক পুঁজি এখন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমকে তিনভাগে বিভক্ত করেছে। যথা:

১) এটি সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সুবিধামতো সরকারি রাজস্ব ও মুদ্রা নীতি প্রবর্তন করে।

২) বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর যোগান দেয়া। যেমন, বহির্বিশ্বে বিমান ও সমুদ্র বন্দর, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, বিভিন্ন অঞ্চলে পুঁজির প্রয়োজনে শ্রমিকদের নির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জনের জন্য বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রভৃতি

৩) স্থিতিশীলতার মতো সামাজিক কাঠামো নিশ্চিত করা যাতে প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ ও আদর্শিক উপকরণগুলো টিকিয়ে রাখা যায়।[৯]

---

* জেমস ও'কনোর একজন আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদ। তিনি *ক্যাপিটালিজম, নেচার, সোশালিজম : এ জার্নাল অব সোশালিস্ট ইকোলজি* নামের একটি জার্নালের প্রধান সম্পাদক ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে : *অরজিনস্ অব সোশালিজম ইন কিউবা* (১৯৭০), *দ্য কর্পোরেশন এন্ড দ্য স্টেট : এসেজ ইন দ্য থিউরী অব ক্যাপিটালিজম এ্যান্ড ইমপিরিয়ালিজম* (১৯৭৩), *দ্য ফিসকাল ক্রাইসিস অব দ্য স্টেট* (১৯৭৩), *একুম্যুলেশন অব ক্রাইসিস* (১৯৮৪), *দ্য মিনিং অব ক্রাইসিস* (১৯৮৭), *ন্যাচারাল কসেজ : এসেজ ইন ইকোলজিক্যাল মার্কসিজম* (১৯৯৮)।

এসব কার্যক্রম পরিচালনা করে নব্য-উদারতাবাদী রাষ্ট্র তার শ্রেণী চরিত্রকে আরও সুস্পষ্ট করেছে। এহেন রাষ্ট্রীয় কাঠামো দরিদ্রদের জন্য সহায়ক কর্মসূচীগুলো প্রত্যাহার করে ধনী ব্যবসায়ীদের জন্য মূল্য সহায়তা, দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে সহায়তা, রপ্তানি উন্নয়নে সহায়তা ও ভর্তুকি, বিমা ভর্তুকি, নতুন কল-কারখানা ও উপকরণ, বিপণন সেবা, সেচ ও ভূমি পুনরুদ্ধার বা পুনর্বাসনসহ বিভিন্ন কর্মসূচীতে প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি ডলার প্রদান করে। আবার বৃহৎ ব্যবসায়ীদের ঋণের জামানত ও ঋণ মওকুফ বাবদ কয়েকশো কোটি ডলার ব্যয় করা হয়।[১০] পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো কর্পোরেশনের স্বার্থে অভ্যন্তরীণ নীতিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি বৈশ্বিক অঙ্গনেও বৈষম্যভিত্তিক বাজার নীতি প্রবর্তন করে। একারণে অনেকেই বিশ্বায়নের মাধ্যমে জাতি-রাষ্ট্রের মৃত্যু ঘটেছে বলে মনে করেন। তৃতীয় বিশ্বে শোষণ ও বৈষম্য টিকিয়ে রাখতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের মতো মার্কিন নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। একটি তৃতীয় বিশ্বের দেশের জাতীয় প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে বহুজাতিক পুঁজির স্বার্থে এসব প্রতিষ্ঠানের সুপারিশে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করা হয় যা থেকে সাধারণ জনগণ খুব সামান্যই উপকৃত হয়।

এ ভারসাম্যহীন ও বৈষম্যমূলক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বিশ্বজুড়ে দারিদ্র, অপুষ্টি, বৈশ্বিক অসমতা ও আয় বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলছে গুণোত্তর হারে। বিশ্বের প্রথম পাঁচটি ধনী দেশের সঙ্গে বিশ্বের দরিদ্রতম পাঁচটি দেশের আয়ের ব্যবধান ১৯৬০ সালে ছিল ৩০:১, কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচীর কল্যাণে ১৯৯০ সালে তা বেড়ে হয় ৬০:১ এবং গ্যাট চুক্তির কল্যাণে ১৯৯৭ সালে এ ব্যবধান হয় ৭৪:১।[১১] অসম বৈশ্বিক কাঠামো কৃত্রিমভাবে এ বৈষম্য টিকিয়ে রেখেছে। যেমন, আফ্রিকায় এখন চরম দুর্ভিক্ষ ও অনুন্নয়ন বিদ্যমান। অথচ, এ বিশ্বের অর্ধেক অব্যবহৃত কৃষিজমি আফ্রিকায় বর্তমান। যদি এখনই এর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, তাহলে আফ্রিকা হবে এ বিশ্বের বৃহত্তম খাদ্য রপ্তানিকারক। অধিক জনসংখ্যা বা খরা এখানে কোনো সমস্যা নয়, সমস্যাটি হচ্ছে মনুষ্যসৃষ্ট।[১২] বৈশ্বিক অর্থনৈতিক নীতিমালা এজন্য দায়ী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ওপর খাদ্যের সহজপ্রাপ্যতা নির্ভর করে। দরিদ্র দেশগুলোতে বহু মানুষের আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ চলে যায় খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে। দ্রূত শিল্পায়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানপ্রাপ্ত শ্রমিকরা খাদ্যের জন্য বেশি খরচ করে। তাদের এই চাহিদা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে খাদ্যমূল্য বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে দরিদ্র

কৃষকরা খাদ্যের জন্য তাদের ন্যূনতম চাহিদাটুকুও মেটাতে ব্যর্থ হয়। এসময়ে খাদ্যের পর্যাপ্ত যোগান থাকলেও ক্রয়ক্ষমতার অভাবে তারা বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম খাদ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।[১৩] বিশ্বের খাদ্য অর্থনীতিটি বিশ্লেষণ করলে এ সত্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এ ধরনের একটি খাদ্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিকশিত হয়ে ওঠে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে পুঁজিবাদী স্বার্থ রক্ষায় খাদ্য সাহায্যের একটি কৌশল অবলম্বন করে। এ দেশগুলোকে দ্রুত শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট নতুন শ্রমিকদের জন্য এ খাদ্যপণ্য সস্তা ছিল। আর এ খাদ্যসাহায্য নীতি মূলত প্রবর্তিত হয়েছিল মার্কিন কৃষকদের অতি-উৎপাদনকে বাজারে পৌঁছে দেয়ার জন্য। এভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ অগ্রনী একেকটি রাষ্ট্রকে তারা তাদের খাদ্য সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে[১৪] এবং পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে অসম বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

পশ্চিমা বিশ্বের এ খাদ্য রাজনীতি আজও তৃতীয় বিশ্বকে চরম খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগাচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের কৃষি ভর্তুকির দাবিটি আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফোলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, "উন্নত ও বিকাশমান উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যকার বিরোধে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ হারিয়ে যাচ্ছে।"[১৫] সাধারণভাবে উন্নত দেশের অধিকাংশ নাগরিক বিশ্বাস করে যে, বহির্বিশ্বের চরম দারিদ্র পরিস্থিতির জন্য বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো দায়ী। তারা সাধারণত দুর্বল কিছু নৈতিক দাবির অধীনে এনে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ব্যাখ্যা দেয়। প্রভাবশালী দেশগুলোর বহু নাগরিকই এ যুক্তিতে বিশ্বাস করে যে, চরম দারিদ্র ও অসমতা দূর করার জন্য বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সংস্কার কোনো ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করবে না। তারা মনে করে, এ ধরনের অগ্রগতি অর্জনের জন্য দরিদ্র দেশগুলোর নিজেদের উদ্যোগী হতে হবে। তাদের সরকার ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর তাদের জনগণের চাহিদা পূরণের দায়িত্ব বর্তায়। এসব দেশের নেতা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ওপর কোনোকিছু চাপিয়ে দেয়া আমাদের জন্য নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। উপরন্তু, দরিদ্র দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকরা নিজেদের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের কথিত আমাদের সাম্রাজ্যবাদ বা নব্য-উপনিবেশবাদকে দায়ী করবে।

তাদের দুর্নীতিপরায়ণ শাসকরা আমাদের অর্থ সাহায্যের অধিকাংশই নিজেরা আত্মসাৎ করছে, যদিও বিশ্বব্যাংকের উচ্চ দারিদ্র সীমার হিসাব মতে, আমাদের আয়ের ১.১৮ শতাংশ বিশ্বের সকল মানুষের আয় বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্নীতির প্রক্রিয়া থাকায় বিশ্বের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্রীভূতভাবে এ পরিমাণ সাহায্য দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।[১৬]

আপাতদৃষ্টিতে উপর্যুক্ত যুক্তিকে আকর্ষণীয় মনে হলেও এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা সহজেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে দারিদ্র দূরীকরণে 'সহযোগিতামূলক নীতি'র পরিবর্তে অ-হস্তক্ষেপবাদী নীতি গ্রহণের সুপারিশ করা হচ্ছে। এর পেছনে দায়ী করা হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের শাসকদের দুর্নীতি ও তাদের অভ্যন্তরীণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে। এ অবস্থাটি একটি সাদৃশ্যানুমানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন, এক দেশের মানুষ ডুবে মারা যাচ্ছে দেখেও অন্য দেশের মানুষ উদ্ধার কাজে এগিয়ে আসছে না। কারণ তাদের আশংকা উদ্ধার কাজে অংশ নিলে উল্টো আরও তাকেই ডুবিয়ে মারার দোষ দেয়া হবে। কারণ তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্রের জন্য প্রায়শ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদকেই দায়ী করা হয়।তাদের অভিজ্ঞতামূলক যুক্তি আমরা বাস্তব ঘটনার আলোকেই বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। তৃতীয় বিশ্বে স্বৈরতন্ত্র, দুর্নীতি, সহিংস বা অসংবিধানিক পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তন, গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কেন্দ্রস্থ শক্তিগুলো দ্বারা উৎসাহ পেয়ে থাকে ও এ ধরনের কার্যকলাপ অব্যাহত রাখার জন্য তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে থাকে। সুতরাং, এসব ঘটনার পেছনে তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় ঘটনাবলী কারণিকভাবে সম্পৃক্ত হলেও কেন্দ্রস্থ শক্তিগুলো এর কারণিকতা ও নৈতিক দায়বদ্ধতা এড়াতে পারে না। কারণ আন্তর্জাতিকভাবে পারস্পরিক এই নির্ভরশীলতা দুর্বল জাতিগুলোর অর্থনীতিকে খারাপের দিকে নিয়ে গেছে। এসব দেশের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতিমালা প্রণয়নে সেদেশের দরিদ্রতম সমাজকে সংশ্লিষ্ট না করেই যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাধ্যমে গৃহীত হয়। এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ফটকাবাজির সঙ্গে সম্পৃক্ত দ্রব্য ও মুদ্রা বাজারের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। বর্তমান বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থা সরকারগুলোর মধ্যে এক ধরনের জটিল চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কের সূচনা করেছে। এক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের উপর অবশ্যমান্য ক্ষমতা প্রয়োগ ও বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন চাপিয়ে দেয়ার সুবিধা ভোগ করে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তারা যে চুক্তিতে উপনীত হয় তাতে ধনী দেশগুলোর সরকার, কর্পোরেশন ও জনগণের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটে। এসব চুক্তি উন্নয়নশীল

বিশ্বের যথার্থ প্রতিনিধি ছাড়া দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্বাক্ষরিত হয় যারা দারিদ্র নিরসনে বদ্ধপরিকর নয়। উপরন্তু, এসব চুক্তি ধনী দেশগুলোর জন্য মঙ্গল বয়ে আনলেও বিশ্ব দারিদ্রের জন্য মোটেও কল্যাণকর নয়। একারণে উরুগুয়ে রাউন্ডের পরবর্তী ইতিহাস ব্যাপক প্রতিবাদমুখর।[১৭] সুতরাং, তাদের প্রদত্ত যুক্তি বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্যে ভরপুর।

বাস্তবিকপক্ষে, ক্ষুধা থেকে যে চরম দারিদ্রের জন্ম তাকে ব্যাপকভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হচ্ছে। একটি দেশে দারিদ্র বিদ্যমান, কারণ এর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্য থেকে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার সুযোগ নেই। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলো সম্পদের অপ্রতুলতা এবং অসম বন্টনের শিকার। কিন্তু বৈশ্বিক পরিসরে উৎপাদনে কোনো সমস্যা নেই, সমস্যা বন্টনে। এ বিশ্বে সকল মানুষের পর্যাপ্ত খাদ্য চাহিদা মেটানোর মতো খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে। সুতরাং, খাদ্যাভাবে মানুষ ক্ষুধার্ত থাকছে না, খাদ্যের ব্যয়ভার মেটানোর সামর্থ্য তাদের নেই। অপরদিকে, দুর্ভিক্ষেও বিত্তশালীদের জন্য খাদ্য থাকে। সুতরাং দারিদ্র ও ক্ষুধার সমস্যার সমাধানের জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত বৈশ্বিক কাঠামো প্রয়োজন। কারণ দারিদ্র এমন একটি সমস্যা যা বিশেষভাবে কোনো দেশের নয়, দেশগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যকার কাঠামো থেকে এর উদ্ভব। বিশেষ করে শিল্পায়িত উত্তরের দেশগুলোর সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দক্ষিণের দেশগুলোর অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের মাঝে এ সমস্যাটি নিহিত রয়েছে। তাই দারিদ্রের ধারণাটি এখন একটি প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়। রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার শোষণমূলক সম্পর্কের যে ক্ষমতাবিন্যাস, তাই বিশ্বদারিদ্রের বিচারমূলক বিশ্লেষণের কেন্দ্রীয় উপাত্তটি সরবরাহ করে।[১৮] এজন্য রবিন জেনকিন্স* লিখেছিলেন, ‘আধুনিক যুগে একটি যুক্তি প্রধান বলে বিবেচিত হয় আর তা হচ্ছে কেন কিছু রাষ্ট্র ধনী আর অন্যগুলো দরিদ্র, কেন ধনী রাষ্ট্রগুলো আরও ধনী হচ্ছে আর দরিদ্র দেশগুলো দরিদ্রই থেকে যায়। কারণ এ বিশ্বব্যবস্থা অন্তর্নিহিতভাবে শোষণমূলক।’[১৯] এই শোষণমূলক বিশ্বব্যবস্থা প্রকৃতিপ্রদত্ত, অনিবার্য কিংবা অপরিবর্তনীয় নয়। এটি মানবীয় কার্যক্রম ও নির্বাচনের মাধ্যমে অবশ্যই অনুসন্ধানযোগ্য, ব্যবহারিক ও নৈতিক উভয়দিক থেকেই একে চ্যালেঞ্জ হিসেবে মোকাবেলা করা যায়।

---

* রবিন জেনকিন্স তাঁর *এক্সপ্লয়েটেশন* গ্রন্থে বৈশ্বিক ক্ষমতা কাঠামোর ত্রুটিপূর্ণ বিন্যাস ও জাতিসমূহের অসমতার দিকটি সুস্পষ্ট করেন।

বেনেট[*১] সমস্যাটিকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেন:

"যদি মানুষের দারিদ্র ও ক্ষুধা খুব স্থিতিশীল হয় তাদের কারণগুলো অবশ্যই প্রতিষ্ঠান, নীতিমালা ও আদর্শের মাধ্যমেই খুঁজে পাওয়া যাবে যা ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানকে বাড়িয়ে দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মানুষ ক্ষুধার কারণে মৃত্যুবরণ করে, কারণ তারা দরিদ্র, কারণ প্রাপ্তিসাধ্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করার সামর্থ্য তাদের নেই। প্রাথমিক সম্পদ সংগ্রহে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ তাদের নেই। সংক্ষেপে, তারা একটি অন্যায্য ব্যবস্থায় নিতান্তই ক্ষমতাহীন।"[২০]

এই দারিদ্র আজকের দিনে কোটি কোটি মানুষকে তাদের ন্যূনতম প্রাত্যহিক চাহিদা পূরণে বাধা দেয়। এ পৃথিবীতে প্রতি পাঁচজনের একজন মানুষকে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অত্যন্ত কষ্টভোগ করতে হয় যা নৈতিকভাবে অত্যন্ত নিষ্ঠুর। এটা এক ধরনের বাজে অর্থনীতির নিদর্শন। মূল্যবান উন্নয়নমূলক সম্পদের ভয়াবহ অপচয়ের মাধ্যমে এ অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। এ বৈষম্যমূলক অর্থ ব্যবস্থা জন্ম দিচ্ছে চরম বৈপরীত্য। একদিকে উত্তরের দেশের মানুষ অপব্যয়, অপচয়ে লিপ্ত, অন্যদিকে দক্ষিণের দেশের মানুষ বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম খাদ্য, বস্ত্র সংগ্রহে ব্যর্থ হচ্ছে। অসম বাজার ব্যবস্থা ও শোষণমূলক বাজার নীতি যে বৈষম্যের উদগাতা, তাকে ঢাকতে গিয়ে তারা আবার নানা রকম লোক দেখানো দান ও সেবা কর্মসূচীর আয়োজন করে। মূলত বাজার সৃষ্টির জন্য গৃহীত এসব কর্মসূচী অত্যন্ত অপ্রতুল ও সীমিত। কোটি মানুষকে বঞ্চিত করে একশো মানুষকে সাহায্য দানের এসব কার্যক্রম প্রকৃতপক্ষে শোষণ, বঞ্চনা, ব্যবধান ও বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখার কৌশলমাত্র, অন্যায্য অর্থব্যবস্থাকে নীতিসিদ্ধ করার অপপ্রয়াস। এজন্যই চাই মৌলিক পরিবর্তন। তাই সুসান জর্জ[*২] যথার্থই বলেছেন, 'ক্ষুধার মোকাবেলা করার প্রাসঙ্গিক কার্যকারিতা হচ্ছে.... ন্যায়,

---

*১ জন বেনেট ও সুসান জর্জ তাঁদের *দ্য হাঙ্গার মেশিন : দ্য পলিটিক্স অফ ফুড* গ্রন্থে দেখান যে, প্রতি তিনদিনে একটি হিরোশিমা বোমা মারা হলে যত সংখ্যক মানুষ মারা যেত ঠিক সেই সংখ্যক মানুষ প্রতি বৎসর অপুষ্টিতে মারা যাচ্ছে। তাঁদের গবেষণায় দেখা গেছে, শিল্পায়িত দেশগুলোর প্রণীত বহুসংখ্যক নীতিমালা ও তৃতীয় বিশ্বের এলিট শ্রেণীর ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিশ্বজুড়ে ক্ষুধা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এক্ষেত্রে জন বেনেট সুদান, বাংলাদেশ, নিকারাগুয়া ও ব্রাজিলের উপর তাঁর কেইস স্টাডিগুলো বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেন।

*২ সুসান জর্জ তাঁর জন বেনেটের সঙ্গে যৌথভাবে লিখিত গ্রন্থ *দ্য হাঙ্গার মেশিন : দ্য পলিটিক্স অফ ফুড*-এ এক ধরনের বিকল্প পন্থায় উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত করে সুষম বণ্টনব্যবস্থা প্রবর্তনের ইতিবাচক ধারণা প্রদান করেন। তাঁরা মনে করেন, এ বিশ্বে মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটানোর মতো পর্যাপ্ত খাদ্য আছে। আমরা কি করে সে খাদ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেবো তা নির্ভর করছে উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার উপর।

কারণ দানকার্য বড়জোর একটি সাময়িক উপায়মাত্র, এটি কখনো একটি অন্যায় কাঠামো পরিবর্তন করতে পারে না। অন্যায় ও অসমতা কাঠামোগত এবং তাদের রয়েছে মূলগত কাঠামো।'[২১]

পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন যে অন্যায্য অর্থব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ অপসারণ ছাড়া কখনো এ বিশ্বে সমতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। গুটিকয়েক মানুষের বিলাসিতা বাড়িয়ে সীমাহীন করার জন্য 'কৃত্রিমভাবে যে দারিদ্র' সৃষ্টি করা হচ্ছে তার মুলোৎপাটন ছাড়া এ বিশ্বে ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। দারিদ্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও ধনীকে আরও ধনী করে তোলার যে আইনগত কাঠামো নির্মাণ আজকের দিনের পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের প্রাণকেন্দ্র তার অবসানের জন্য সারা বিশ্বের মানুষ এখন সোচ্চার অবস্থান নিয়েছে। সাম্প্রতিক ডব্লিউটিওর বালি সম্মেলনেও এ বাস্তবতারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে। গণমানুষের আন্দোলন ও তৃতীয় বিশ্বের ক্ষোভ মোকাবেলা করাই এখন বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

রাজনৈতিক বিশ্বায়ন ও গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র পরোক্ষভাবে তার অর্থনৈতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত পতনের পর একক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে অপরাপর রাষ্ট্রগুলোর কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করে থাকে। তাদের হস্তক্ষেপে আনুগত্য পোষণে অস্বীকারকারী রাষ্ট্রগুলোতে গণতন্ত্রহীনতার অভিযোগ করা হয়। তাই একবিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের রাজনৈতিক হাতিয়ার হচ্ছে 'গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া' বা গণতন্ত্র বিতরণের অজুহাত। বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে সুশীল সমাজ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অতিজাতিকীকরণ একটি অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়েছে। তাই গণতন্ত্র প্রবর্তন এখন মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই 'গণতন্ত্র প্রবর্তন'-এর ধারণাটি বিশ্বায়নের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কেননা অতিজাতিক পুঁজি তার স্বার্থে অতিজাতিক এলিটদের আধিপত্য চায়। এভাবে বৈশ্বিক অর্থনীতির সুবিধার্থে একটি বৈশ্বিক রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে।

তৃতীয় বিশ্বে 'গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া'কে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপুলায়তনের প্রচারণামূলক গবেষণাকর্ম গড়ে উঠেছে। কিন্তু এসব গবেষণাকর্মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া স্থান পায়। অথচ এই গণতন্ত্র প্রবর্তনের অধিকাংশ রচনাই আসে মার্কিন নীতিপ্রণেতাদের প্রণীত নীতিমালা থেকে। তাদের নীতিমালায় কোনো পরিবর্তন আসলে এসব 'গণতন্ত্র প্রবর্তন' এর গবেষণাগুলো পর্যালোচনার ভিত্তিতে পুনরায় প্রকাশিত হয়। এসব গবেষণার অধিকাংশ নীতিকথায় ভরপুর এবং অন্তর্নিহিত পূর্বধারণায় পরিব্যাপ্ত। মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যই এসব গবেষণার সঙ্গে মূল্যবোধকে যুক্ত করা হয়। কারণ মূল্যবোধনিরপেক্ষ সমাজবিজ্ঞানীকে ঘিরে বিতর্কের অবকাশ রয়ে যায়। কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত পূর্বধারণাগুলো নিতান্তই অগ্রহণযোগ্য থাকে। যেমন, স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে তাদের প্রবর্তিত নীতির সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তীকালীন নীতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।[২২] স্নায়ুযুদ্ধের পরে নব্য-উদারতাবাদী পুঁজিবাদ বাস্তবায়ন সহজ হয়ে পড়ে। তাই এ সময়কার নীতিমালা অপেক্ষাকৃত নমনীয় হয়ে ওঠে। সাধারণত নির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বন করে ব্যবহারিক প্রয়োজনে কোনো বিশেষ সন্ধিক্ষণে বা সংকটকালে এসব নীতিমালা প্রণীত হয়। সুতরাং, নৈতিক অবধারণসমূহ এসব গবেষণার খোলসমাত্র, সুচতুর নীতিমালা বাস্তবায়নের বাহ্যিক আবরণ।

পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার প্রান্তস্থ ও অর্ধ-প্রান্তস্থ অঞ্চলগুলোতে 'গণতন্ত্র প্রবর্তন' প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রস্থ দেশগুলোর পছন্দমতো রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসকরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। গণতন্ত্রের নামে যুক্তরাষ্ট্র এখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে মৌলিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনে বাধা দিয়ে আসছে। নব্য-উদারতাবাদী পরিকল্পনা অনুযায়ী, অধিকাংশ দেশে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। লুণ্ঠনকারী দুটি দলের পালাক্রমে টাকা বানানোর প্রতিযোগিতার মধ্যে এ গণতন্ত্রের বাস্তবতা নিহিত। এজন্য স্নায়ুযুদ্ধের পরে এ গণতন্ত্র প্রবর্তন ও টিকিয়ে রাখা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সহজ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের বৃহৎ পররাষ্ট্রনীতির অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেশে বহিস্থ ও অন্তস্থভাবে গণতন্ত্রের জন্য গণআন্দোলন ও গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে থাকে। তাদের এই হস্তক্ষেপ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, কূটনৈতিক ও আদর্শগত মডেলে বাহ্যিক রূপ লাভ করে। এসব কর্মসূচী ও তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যেমন মার্কিন প্রভাব থাকে, তেমনি এর ফলাফলও

কাজে লাগে মার্কিন স্বার্থপূরণে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন 'স্বনির্ভর চলক' ও রাজনৈতিক বিশ্বায়ন 'নির্ভরশীল চলক'[২৩] এর ভূমিকায় অবতীর্ণ।

নব্বইয়ের দশকে সাবেক সোভিয়েত ব্লক ও দক্ষিণ আফ্রিকার গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়াকে সাধারণীকরণের ভিত্তিতে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র নতুন রূপ লাভ করে। ১৯৯৩ সালে নিকারাগুয়ার নির্বাচনে মার্কিন হস্তক্ষেপ বিশ্বব্যাপী মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের জন্য 'একটি রোল মডেল' হয়ে ওঠে। সান্দানিস্তা বিপ্লবকে দুর্বল করার জন্য এই নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। নিকারাগুয়ানদের সাহায্য দান ও যুদ্ধ বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এ নির্বাচনে পুঁজিবাদপন্থী ইউএনও জোটকে ক্ষমতায় বসায়। এল সালভাদরে ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জালিয়াতি, ভীতি প্রদর্শন ও সহিংসতার মধ্য দিয়ে মার্কিন সমর্থিত কট্টর দক্ষিণপন্থী সরকার দল আরেনাকে বিজয়ী করা হয়। সাজানো এ নির্বাচনে নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময় কমপক্ষে ৩৩ জন বিরোধী দলীয় সদস্যকে খুন করা হয়। এত জালিয়াতি ও ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও মার্কিন নেতৃবৃন্দ ও গণমাধ্যম এল সালভাদরকে 'গণতন্ত্র' হিসেবে ঘোষণা করে। মার্কিন আগ্রাসনের পরে ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে, মার্কোস শাসনাধীনে ফিলিপাইনে, মার্কিন আক্রমণের পরে গ্রানাডাতে এবং এমন অনেক দেশে একই ধরনের লোক দেখানো নির্বাচন হয়েছে।[২৪]

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আবার কোনো দেশের নির্বাচনী ফলাফলে সন্তুষ্ট হতে না পারলে গণতন্ত্র নস্যাৎ করে সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে কুণ্ঠিত হয় না। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে হাইতি। সেদেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আরিস্তিদকে ক্ষমতাচ্যুত করে মার্কিন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে হাজার হাজার আরিস্তিদ সমর্থককে হত্যা ও ব্যাপক হারে নির্যাতন চালানো হয়। ১৯৯৪ সালে ক্লিনটন প্রশাসন হাইতিতে গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠা ও আঁরিস্তিদকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার কথিত উদ্দেশ্যে হাইতিতে মার্কিন সেনা অভিযান চালিয়ে সরাসরি দেশটি দখল করে নেয়। পুনরায় আঁরিস্তিদকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা হলেও বিশ্বব্যাংকের অনেকগুলো শর্ত তাঁকে মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। এসব শর্তের মধ্যে ছিল রাষ্ট্রপতির বেশকিছু ক্ষমতা হাইতির রক্ষণশীল দল নিয়ন্ত্রিত আইনসভার কাছে হস্তান্তর, ব্যাপক হারে সরকারি খাতের বিরাষ্ট্রীয়করণ, সরকারি খাতে কর্মসংস্থান অর্ধেক হ্রাস, হাইতিতে বিনিয়োগকারী মার্কিন কর্পোরেশনগুলোর জন্য বিধিমালা শিথিল,

রপ্তানিকারক ও ব্যক্তি মালিকানাধীন কর্পোরেশনগুলোর জন্য ভর্তুকি বৃদ্ধি ও আমদানি শুল্ক হ্রাস। বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিরা অবশ্য স্বীকার করেছিলেন, এসব পদক্ষেপ হাইতির দরিদ্রদের আঘাত করলেও বিনিয়োগকারীরা লাভবান হবেন।[২৫]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তিত গণতন্ত্র পুঁজিকেন্দ্রিক। পুঁজিবাদবিরোধী জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ নেয়ায় প্রথমে আরিস্তিদকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। পরবর্তীতে জনসমর্থনের কারণে তাঁকে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা হলেও কর্পোরেট পুঁজির দাসত্ব মানতে বাধ্য করা হয়। এ কারণেই মার্কিন সরকার পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক নীতিমালা মেনে চলা কোনো পুঁজিবাদবিরোধী সরকারকে বন্ধু ভাবতে পারেনি, উল্টো তাদের সঙ্গে বৈরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন, হুগো চাভেজের সরকার ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পরও মার্কিন হুমকি ও নিন্দার মুখে ছিল। এভাবে হুগো চাভেজের ভেনিজুয়েলার মতো বহু দেশ মার্কিন নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে যাবে– এ আশংকায় যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে অস্থিতিশীলতা ও রাজনৈতিক সহিংসতা সৃষ্টি করে রেখেছে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই ও সিআইএ বিশ্বজুড়ে পুলিশি ভূমিকা নিয়ে থাকে। দেশে ও বিদেশে তাদের কোনো জবাবদিহিতা না থাকায় তারা সক্রিয় ভিন্নমতাবলম্বী ও প্রতিবাদীদের ওপর নজরদারিসহ ক্রমান্বয়ে নানাবিধ অসাংবিধানিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে। ১৯৮৯ সালে প্রাক্তন সিনেটর জর্জ ম্যাকগভর্ন সিআইএ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন:

"প্রায় শুরু থেকেই সিআইএ শুধু গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়াও নির্বাচনে জালিয়াতি, বিদেশে শ্রমিক ইউনিয়ন নিয়ে কারসাজি, আধা সামরিক অপারেশন চালানো, সরকার উচ্ছেদ করা, অন্য দেশের কর্মকর্তাদের হত্যা করা, নাৎসিদের রক্ষা করা ও কংগ্রেসের কাছে মিথ্যা বলার মতো গোপন কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল।"[২৬]

বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিস্তার ঘটিয়ে বৈশ্বিক পরিসরে বৈষম্যমূলক সমাজ গঠন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে এ ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমূলক পররাষ্ট্রনীতি তৈরি করতে হয়। আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় পুঁজির পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়া জাতিসমূহের এবং বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর অসম বিকাশের মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়ে ওঠে। বিশ্ব ইতিহাসের গতিধারা

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বৈশ্বিক পরিসরে উৎপাদন, পুঁজির চলাচল ও উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎকরণের কাজগুলো হয়েছে সবসময় কেন্দ্রস্থ দেশগুলোর স্বার্থে। বলপূর্বক উদ্বৃত্ত আত্মসাতের (সম্পদ আত্মসাতের) প্রক্রিয়াটি ঘটে থাকে কিছু সামাজিক গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মাধ্যমে। এই গোষ্ঠীটি তাদের আত্মসাৎকৃত উদ্বৃত্ত সম্পদ এক দেশ বা অঞ্চল থেকে অন্য দেশ বা অঞ্চলে স্থানান্তরিত করে থাকে। একটি শক্তিশালী বিশ্ব অর্থনীতির জন্য প্রান্তস্থ অঞ্চলগুলো থেকে কেন্দ্রস্থ অঞ্চলগুলোতে এ স্থানান্তর ঘটে থাকে। সম্পদের নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক সংঘাত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে তা ছড়িয়ে পড়ে। একটি নির্দিষ্ট গতিধারা তৈরি করে জাতীয় পর্যায়ে পুঁজি চলাচল ও উদ্বৃত্ত আত্মসাতের প্রক্রিয়াটি ঘটে থাকে।[২৭] এ লক্ষ্য অর্জনেই যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে, বলপূর্বক নিজেদের পছন্দনীয় কোনো গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসায়, জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করে ও কোনো সরকার তাদের আজ্ঞাবহ থেকে কাজ না করলে তাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা হয়। যেমন, চিলির সমতাবাদী জননেতা আলেন্দেকে ক্ষমতাচ্যুত করে তারা স্বৈরশাসক পিনোশেকে ক্ষমতায় বসায়। এভাবে বহুদেশে তারা তাদের পছন্দমতো ক্ষমতার পালাবদল ঘটায়। তাদের নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীটি নিজ দেশে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার সুবিধা মোতাবেক বৈষম্যমূলক সমাজ কাঠামো সৃষ্টি করে রাখে, বিনিময়ে তাদের দাতা প্রভুদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় উৎকোচ গ্রহণ করে থাকেন, বৈশ্বিক অঙ্গনে যা ‘ বৈদেশিক সাহায্য’ নামে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে মাইকেল প্যারেন্টি মন্তব্য করেছেন:

“ধনী দেশের দরিদ্ররা যখন গরিব দেশের ধনীদেরকে অর্থ দেয়, তখন সেটা হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্য। সম্পদের এই হাত বদল ঘটে শ্রেণী এবং জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে। এর ফলে আয়ের ঊর্ধ্বমুখী পুনর্বণ্টন ঘটে।”[২৮]

বিশ্বব্যাপী শ্রেণী বৈষম্যমূলক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা ও গ্রহীতা রাষ্ট্রকে নির্ভরশীলতার চক্রে আবদ্ধ করে রাখা এসব বৈদেশিক সাহায্যের মূল উদ্দেশ্য। এসব সাহায্যের একটি বড় অংশ চলে যায় মার্কিন বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগের জন্য ভর্তুকি হিসেবে। আর উল্লেখযোগ্য অংশ যায় দুর্নীতিবাজ মুৎসুদ্দি শাসকদের পকেটে। স্থানীয় বাজারের জন্য শস্য উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র কৃষকদের বঞ্চিত করে বৃহৎ কৃষি ব্যবসার জন্য অর্থকরী শস্য

রপ্তানিকারকদের ভর্তুকি দিতে এসব সাহায্যের একাংশ ব্যয় হয়। অধিকাংশ বৈদেশিক বিনিয়োগের মতোই বৈদেশিক সাহায্যের চূড়ান্ত ফলাফল হচ্ছে সামান্য কিছু লোকের হাতে বিপুল সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং অধিকাংশ মানুষের জন্য দারিদ্র বৃদ্ধি পাওয়া। কোনো শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই বড় অংকের কোনো অর্থ শ্রেণী-নিরপেক্ষভাবে বিতরণ করা সম্ভব নয়। এ অর্থ হয় ধনী, নয় দরিদ্রদের হাতে যায়, অধিকাংশ সময়ই তা যায় ধনীদের কাছে। উপরন্তু, এ সাহায্য রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের একটা বড় হাতিয়ার। যদি কোনো গরীব দেশ প্রকৃত সংস্কারের মাধ্যমে ক্ষমতার বিন্যাস ও সম্পদ বণ্টনব্যবস্থা পরিবর্তন করার দু:সাহস দেখায়, তখন এই সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। আর শ্রেণী পক্ষপাতে দুষ্ট বৈদেশিক সাহায্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের প্রকল্পগুলো অত্যাচারী দক্ষিণপন্থী শাসকগোষ্ঠীকে জোরদার করে এবং বড় ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকারীদের ভর্তুকি যোগায়। আবার এসব প্রকল্প যায় গরিবদের স্বার্থের বিপক্ষে। অথচ এসব প্রকল্পে ব্যয়কৃত শত শত কোটি ডলারের বেশির ভাগই আসে আমেরিকার করদাতাদের কাছ থেকে।[২৯]

শুধুমাত্র বিত্তবান ও ক্ষমতাশালীদের কল্যাণে ব্যবহৃত এ আন্তর্জাতিক ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া দরিদ্র দেশগুলোর দুর্নীতি ও দারিদ্র সমস্যায় তিন ধরনের নেতিবাচক ফলাফল সৃষ্টি করে। প্রথমত, এ ঋণের টাকা ফেরত দেয়ার দায়িত্ব বর্তায় এসব দেশের অত্যাচারী শাসকের ওপর, যে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং সহিংসতা ও দমন নীতির মাধ্যমে তা টিকিয়ে রেখেছে। এসব শাসক ইচ্ছে হলেই এককভাবে অধিক অর্থ ঋণ নিতে পারে, আর পুরো দেশের জন্য এ অর্থ ফেরত দেয়া বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক ঋণচক্রের বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত গোষ্ঠীগুলো এসব শাসকের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখে এবং গণসমর্থিত স্থানীয় বিরোধী দলকে দমিয়ে রাখে। দ্বিতীয়ত, যে উপায়েই সরকারি ক্ষমতা অর্জিত হোক না কেন, আন্তর্জাতিক ঋণদাতা প্রভুরা দমনমূলক কার্যক্রম ও গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি জোরালো করতে বদ্ধপরিকর। তাই যে শাসক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বলপ্রয়োগকে অধিক প্রাধান্য দেয়, তারা ঋণদাতা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর আনুকূল্য লাভ করে। তৃতীয়ত, যদি কোনো একনায়ক বশ্যতা স্বীকারে অপারগতা প্রকাশ করে, তবে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়, সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক দাতাপ্রভুরা সেদেশের ওপর আরো বেশি ঋণের বোঝা চাপায়। এটি নতুন গণতান্ত্রিক সরকারকে কাঠামোগত সংস্কার গ্রহণে বাধা দিয়ে থাকে। ফলে সরকারটি সাফল্য ও

স্থিতিশীলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়।[৩০] আজকাল বিশ্বায়নের কল্যাণে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য নানা চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করে। ১৯৯৪ সালে গ্যাটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উন্নত দেশগুলোর সুবিধালাভের দূরভিসন্ধি সফল হলে যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোর ওপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এ প্রেক্ষাপটে মার্কিন সরকার তাদের সুবিধামতো বাণিজ্য ও বিনিয়োগের আইনগত মানদণ্ড তৈরি করে জোরপূর্বক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর ওপর তা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। সম্প্রতি বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাক্ষরিত টিকফা চুক্তিটি এ বিশ্বের প্রধান পরাশক্তিটির বৈশ্বিক ক্ষমতা সুরক্ষার একটি কৌশলগত একতরফা চুক্তি। এর মধ্য দিয়ে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অধিকার আদায়ে অন্যতম সোচ্চার কণ্ঠ বাংলাদেশের দরকষাকষির ক্ষমতা অনেকাংশেই খর্ব করে দেয়া হলো।

বাংলাদেশের মতো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এরূপ দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে নাইজেরিয়া, ঘানা, এ্যাঙ্গোলা, রুয়ান্ডা, বাহরাইন, মিসর, কুয়েত, ওমান, সৌদি আরব, আফগানিস্তান, নেপাল, পাকিস্তান, মিয়ানমার, শ্রীলংকা। এ চুক্তি স্বাক্ষরের কল্যাণেই পাকিস্তানে এখন নিয়মিত মার্কিন ড্রোন হামলা চলছে। এসব দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অর্থনৈতিক দাসত্বের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও সামরিক দাসত্বের পথও উন্মুক্ত করে। নির্বাচনের আগে সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের সরকারগুলো পরাশক্তিকে সন্তুষ্ট করতে জাতীয় স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ নিতে উদ্যত হয়। এসব চুক্তি এমন রাজনৈতিক আনুগত্যেরই স্বাক্ষর বহন করে। বিশ্বায়ন সৃষ্ট এ রাজনৈতিক অসাম্য অধিক শক্তিধরকে দুর্বলের প্রতি প্রভুত্ব বিস্তারের আইনগত ক্ষমতা প্রদান করে। তবে এ ধরনের অসমতার জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সরকারের নির্বুদ্ধিতাও অনেকাংশে দায়ী। দরিদ্র দেশগুলো নিজ দেশের সম্পদের সদ্ব্যবহার না করে বিদেশি কোম্পানী বা রাষ্ট্রের হাতে নিজ দেশের রাজনৈতিক-অর্থনীতির কর্তৃত্ব তুলে দেয়। উন্নত দেশগুলো এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে বঞ্চিত করার অশুভ কৌশল গ্রহণ করে। তৃতীয় বিশ্বের এ উন্নয়ন ঘাটতির জন্য সেদেশের জনগণকে দায়ী করা যায় না, দায়ী করতে হবে সমষ্টিগত বৈশ্বিক কাঠামো এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের মধ্যকার বহুমুখী সম্পর্ককে। এ পর্যায়ে দুর্বল দেশটি যখন নিজের কল্যাণবিধানে অক্ষম হয় কিংবা কল্যাণ বা উন্নয়নক্ষেত্রে নিষ্ঠুর অসমতা দূরীকরণে অসমর্থ হয়, তখন দায়ভার বর্তায় ত্রূটিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থার ওপর। অপরকে বঞ্চিত করে নিষ্ঠুর অসমতা সৃষ্টি করা একটি সমষ্টিগত ব্যর্থতা।

এখন যে রাষ্ট্রটি নিষ্ঠুর রাজনৈতিক অসমতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারছে না, তার ক্ষেত্রে বণ্টনমূলক ন্যায়তত্ত্বের অন্যতম যুক্তি 'আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রতি মর্যাদা দান' অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ যুক্তিটিতে রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এ যুক্তিতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি অত্যন্ত জোরালোভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ মতানুসারে, কোনো রাষ্ট্র কিংবা এর কোনো নাগরিকের অন্য কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অন্যায়। ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, এ যুক্তি একদিকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় এবং অপরদিকে, ব্যক্তিগত স্বনিয়ন্ত্রণের ধারণাটিকে রাজনৈতিক স্ব-নিয়ন্ত্রণের ওপর আরোপ করে এবং আন্তর্জাতিক বহুত্ববাদ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মূল্যবোধকে গৌণ করে দেখে।[৩১] আজকের দিনের বিশ্বায়ন কিভাবে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রকাশ করছে তার যথার্থ দৃষ্টান্ত বর্তমান সিরিয়া। সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন সরকারকে হটানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভারী অস্ত্রসজ্জিত এক বিদ্রোহী গ্রুপ তৈরি করে। এ বিদ্রোহীরা আবার পশ্চিমা ও আরব বিশ্বের কয়েকটি প্রভাবশালী দেশের সমর্থন পেয়ে জেনেভা শান্তি সম্মেলনে যোগদানের অন্যতম শর্ত হিসেবে সিরীয় প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবি জানায়। এমনকি বিদ্রোহী নামধারী এসব চরমপন্থী সন্ত্রাসী সংগঠন এ শান্তি আলোচনাকে প্রত্যাখ্যান করে তাতে অংশগ্রহণেচ্ছুদের হুমকি প্রদান করেছে।

বিশ্বায়নকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে এখন প্রতিনিয়তই পশ্চিমা দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আদেশ-নির্দেশ প্রদান করে। প্রায়শ মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ নীতিতে হুকুমদারি করতে দেখা যায়। এ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর বিশ্বায়নের ছদ্মাবরণে এ হস্তক্ষেপ সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। আজকের এ বিশ্বায়নের যুগে রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বৈশ্বিক পরিসরে গৃহীত হয়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত এখন ব্যাপকভাবে ক্ষমতাধর আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন ও আমলাতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই সবাই বৈশ্বিক সামাজিক সম্পর্কের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। এজন্য ন্যায়ের ধারণাটিও এখন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের গণ্ডি পেরিয়ে বৈশ্বিক পরিসরে বিস্তৃত হয়েছে। বিশ্বসমাজ এখন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, তাই সমষ্টিগত সমস্যাগুলোর কীভাবে ন্যায়সঙ্গত সমাধান করা যায়? এ বিষয়গুলোও এখন আলোচনায় স্থান পাচ্ছে। আগে ঔপনিবেশিক

Dhaka University Institutional Repository

শাসকগোষ্ঠী জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে তৃতীয় বিশ্বের ভূমি দখল করে নিতো। এখনও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো দখল করে নিচ্ছে কৃষকের কৃষিজমি, কৃষক হয়ে পড়ছে ভূমিহীন। বাজার অর্থনীতির প্রভাবে খাদ্য হয়ে উঠছে পণ্য। বাজারের বাণিজ্যিক তৎপরতা মানুষের খাদ্য গ্রহণের অধিকার লঙ্ঘন করেছে। ফলে বিশ্বজুড়ে এক ধরনের নিষ্ঠুর অসমতা সৃষ্টি করছে বাজারমুখী বিশ্বব্যবস্থা। এ অন্যায্যতা দূর করতে প্রয়োজন একটি সমতাবাদী বৈশ্বিক নীতি।

একটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর অসহযোগিতামূলক মনোভাব থেকে বৈশ্বিক অসমতা সৃষ্টি হয়। নিজেদের সুবিধার্থে তারা অধিকাংশ মানুষকে নিদারুন কষ্টের দিকে ঠেলে দেয়। এজন্য শিল্প কারখানাগুলো সস্তা শ্রমের দেশ বেছে নেয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে শ্রম শোষণ করে উদ্বৃত্ত মূল্য সুবিধা শতগুণ বেশী ভোগ করা যায়। এই গুটিকয়েক মানুষের অধিক মাত্রায় উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাতের আকাঙ্ক্ষা এ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জীবনকে দারিদ্রকবলিত করে তোলে। বিশ্বায়ন এ অসমতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে কিংবা অসমতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে সহযোগিতা করে বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ করে। বিশ্বব্যাপী দাতা সংস্থাগুলোর কর্মতৎপরতা এ ধরনের কার্যক্রমের বস্তুগত ভিত্তি নির্মাণ করছে। যেমন, হাইতির সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের চুক্তির পরে সেখানে দারিদ্র পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। এ সময়ে চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৮১ শতাংশে পৌঁছায়। সম্প্রতি মিসরে মুরসি সরকারকে আইএমএফের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য করা হলে সেখানকার দারিদ্র ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে জনঅসন্তোষ বেড়ে গিয়ে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং, এসব দাতা সংস্থার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্য-কলাপের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী দারিদ্র। এ থেকেই কাঠামোগত সংস্কারের নৈতিক দাবিটি আসে।

বিশ্বায়নের ক্রমবিস্তার দরিদ্র জাতিগুলোর ওপর পশ্চিমা দেশগুলোর আধিপত্যের পথ প্রশস্ত করছে। তাই বিশ্বায়নের ধারণার সঙ্গে এখন বলপ্রয়োগের ধারণাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ছে। বিশ্বায়ন বিশ্বজুড়ে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক– এ দ্বিবিধ রাজনৈতিক অসমতা সৃষ্টি করছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ায় এ ধরনের অসমতার জন্ম হয়। রাজনৈতিকভাবে ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করলে এ অসমতা দূর হতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রাজনৈতিক সমাজে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একটি আইনসিদ্ধ অধিকার।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং, সকল রাজনৈতিক সমাজের সমান অধিকার নিশ্চিত করা একটি নৈতিক দাবি। কিন্তু শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক সমাজ দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আসছে। এ কারণে জাতিসংঘে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ পরিষদের মতামতকে উপেক্ষা করে সবসময় শক্তিমান নিরাপত্তা পরিষদের গুটিকয় রাষ্ট্রের কর্তৃত্বই টিকিয়ে রাখা হচ্ছে। এই নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তকেও কখনো একক পরাশক্তি বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতার এই নিষ্ঠুর অসম বৈশ্বিক কাঠামো এখন তৃতীয় বিশ্বের জন্য বিশ্বায়নকে মোকাবেলা করার সবচেয়ে বড় নৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সামরিক বিশ্বায়ন ও হস্তক্ষেপের বৈধতা

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে মানবেতিহাসে এক ধরনের কৌশলগত পরিবর্তন সূচিত হয়। এ সময়ে নব্য-রক্ষণশীলতাবাদের প্রভাবে এক ধরনের বলপূর্বক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটে। এ প্রবণতা থেকে জন্ম নেয়া উত্তেজনা এখন বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক সহিংসতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যুক্তরাষ্ট্র এক ধরনের হস্তক্ষেপবাদী মূলনীতি গ্রহণ করলেও তাকে ‘গণতন্ত্র সুরক্ষা’র মতো অপেক্ষাকৃত নমনীয় বাহ্যিক নীতির মাধ্যমে প্রকাশ করা হতো। কিন্তু শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরে পুঁজিবাদ আরও একটি মহামন্দার মুখোমুখি হলে বলপ্রয়োগের নীতিকে তারা একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়। তাই নতুন শতাব্দীতে এসে পুঁজিবাদ নতুন রূপ পরিগ্রহ করায় তার সামরিক বিশ্বায়নের মৌলিক কাঠামোটিকে আরও শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। একবিংশ শতাব্দীর প্রত্যক্ষ সমরবাদী নীতি সামরিক বিশ্বায়নকে আরও নগ্ন ও প্রকাশ্য করে তোলে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসান তাদের এ যুদ্ধংদেহী প্রবণতাকে অনেকাংশে সহজ করে তোলে। ফলে ক্ষমতা ও আধিপত্যের এ বৈশ্বিক কাঠামোটি এ সময়ে আরও সুসংহত হয়।

পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় আধিপত্য হচ্ছে জাতি বা গোষ্ঠীগুলোর সৃষ্ট এমন এক কাঠামো যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অতিজাতিক ফর্মুলায় তাদের নিয়ন্ত্রণকে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রান্তস্থ দেশগুলোতে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় তা দুটো উপায়ে সম্পন্ন হতে পারে। প্রথমত, প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের মতো হস্তক্ষেপ ও দখলদারিত্ব। একবিংশ শতাব্দীর ইরাক, আফগানিস্তান ও লিবিয়া যুদ্ধ এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়ত, সিআইএ’র মাধ্যমে কোনো দেশে সামরিক একনায়কতন্ত্র

প্রতিষ্ঠা করা। সাম্প্রতিক মিসরে এ ধরনের হস্তক্ষেপ ঘটে। এ আঙ্গিকে একটি দেশের শ্রেণী ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোর অধীনে নিয়ে আসা হয়। অতিজাতিক এলিটদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে যুক্তরাষ্ট্র এমন বিশ্বব্যবস্থার প্রবর্তন করে যাতে তৃতীয় বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সুরক্ষামূলক নতুন রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এসব দেশে বিপ্লবাত্মক ও জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোর উত্থান ঘটানো হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্রিপাক্ষিক সমঝোতার ভিত্তিতে বৈদেশিক সম্পর্কের কাঠামো প্রস্তুত করে। অতিজাতিক এলিটদের রাজনৈতিক সংঘ স্থাপন করে তারা আবার বিশ্বময় নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে একটি ব্যবস্থাপক শ্রেণী গঠন করে যারা নিজ নিজ দেশে অতিজাতিক এলিটদের স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করে। এই ব্যবস্থাপক শ্রেণী বৈশ্বিক শ্রেণী কাঠামো টিকিয়ে রাখতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এ ত্রিপাক্ষিক সমঝোতা দক্ষিণের দেশগুলোতে উত্তরের পুঁজি, দ্রব্য, প্রযুক্তির অবাধ প্রবেশ নিশ্চিত করে এবং নতুন উৎপাদন কাঠামোর সহায়ক নতুন শ্রম-বিভাজন সৃষ্টি করে থাকে। প্রথমদিকে এসব কর্মসূচিকে গঠনতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন বলে আখ্যায়িত করা হতো। পরবর্তীতে আশির দশকে এর সঙ্গে সামরিকায়ন প্রকল্পের সংযোগ ঘটে এবং বিশ্বজুড়ে মার্কিন বাহিনীর পুনর্বিস্তার ঘটে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোতে নতুন একটি বিশ্বব্যবস্থা গঠন ও এ বিশ্বের অধিকাংশ জাতির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যের কর্মসূচি দুটি প্রধান উপকরণে পরিণত হয়। এ ধরনের প্রচলিত সামরিক হস্তক্ষেপগুলো আবার বিরুদ্ধ প্রবণতাসম্পন্ন নতুন ধারার জন্ম দেয়। এরূপ একটি বিকাশমান নতুন ধারণা হচ্ছে 'নিচু মাত্রার যুদ্ধ'। এই নতুন মতবাদটি সংঘাতের একটি রাজনৈতিক মাত্রার প্রতি প্রাথমিক গুরুত্বারোপ করে। এর সঙ্গে আবার অর্থনৈতিক কর্মসূচি, কূটনৈতিক পদক্ষেপ এবং মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ধারণাটি যুক্ত হয়।[৩২] এ ধরনের নিচু মাত্রার যুদ্ধ কৌশল গ্রহণ করার প্রধান কারণ হচ্ছে: নিচু মাত্রার যুদ্ধ চালালে সর্বাত্মক যুদ্ধ জনসাধারণের চোখে পড়ে না। সরাসরি মার্কিন সৈন্য ব্যবহারের প্রয়োজন থাকে না। মার্কিন সৈন্যদের মৃত্যুর সংখ্যাও কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। নিচু মাত্রার যুদ্ধ হচ্ছে বদলি যুদ্ধ। এ যুদ্ধে

মার্কিন মদতপুষ্ট সরকারের বাহিনী দিয়ে যুদ্ধ চালানো হয়। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারের এসব বাহিনী কার্যত ভাড়াটে বাহিনী।[৩৩]

বিভিন্ন দেশে সামরিক তৎপরতা চালানোর অপর এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে সিআইএ। সিআইএ বিভিন্ন দেশে অসংখ্য গুপ্ত অপারেশন চালিয়ে অগণিত সরকার উৎখাত করেছে। এছাড়া দেশে দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এবং লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের প্রাণহানির কারণ এই সিআইএ। গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং আধা সামরিক প্রচারণার অন্তরালে সিআইএ'র প্রধান কাজ হচ্ছে রাজনৈতিক অপারেশনে মদদ দেয়া। এ লক্ষ্য অর্জনে তারা বিভিন্ন দেশে তাদের সমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও ব্যক্তিবর্গকে অর্থের যোগান ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে। রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর জোট তৈরির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনসহ মিডিয়া, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সংগঠনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সিআইএ'র এ ধরনের কার্য-কলাপ আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে সবসময় গোপন রাখা হতো। সত্তরের দশক থেকে সিআইএ'র গুপ্ত তৎপরতা মানুষের সামনে প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯৭৪-৭৫ সালে কংগ্রেসের অনুসন্ধানে সিআইএর দেশে-বিদেশে পরিচালিত অপরাধমূলক গুপ্ত তৎপরতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।[৩৪]

১৯৮২ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র ভ্যাটিক্যানের সাথে এক যৌথ গোপন কার্যক্রম শুরু করে। এসব কার্যক্রমের অধিকাংশই সিআইএ এবং এএফএল-সিআইও*-র মাধ্যমে গৃহীত হতো। ১৯৯২ সালে টাইম ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বিভিন্ন দেশের নিষিদ্ধ সংগঠনগুলোর অর্থের যোগান আসে সিআইএর তহবিল থেকে।[৩৫] ১৯৮২ সালে প্রেসিডেন্ট রিগ্যান National Security Decision Directive (NSDD) নামে তাদের কথিত একটি গণতন্ত্রায়ন প্রকল্পে স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিতে ওয়াশিংটন-ভ্যাটিকান যৌথ কর্মসূচির মতোই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিক অপারেশনের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সাবেক সোভিয়েত ব্লককে অস্থিতিশীল করার জন্য। অতিজাতিক এলিটদের স্বার্থরক্ষার জন্য মূলত এ ধরনের কর্মসূচি নেয়া হয়। এর ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব

---

* আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবার-কংগ্রেস অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশনস্ (ইউএস)

হয়েছিল। এক্ষেত্রে সিআইএ গোপন অর্থের যোগান দিয়ে গণতন্ত্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোকে নীতিগত সমর্থন প্রদানের পাশাপাশি প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দান করে সাম্যবাদী শাসনের অবসান ঘটাতে সমর্থ হয়।[৩৬] অপরদিকে, হাঙ্গেরি, পূর্ব জার্মানী, এস্তোনিয়া, রোমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লাভাকিয়া ও বুলগেরিয়ায় মুক্ত কংগ্রেস ফাউন্ডেশন এবং সেন্টার ফর ডেমোক্রেসির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে অস্ত্র ও উপকরণাদি সরবরাহ, যোগাযোগ স্থাপন ও অনুশীলন কর্মসূচি চালু করা হয়।[৩৭] তাদের এসব সফল ষড়যন্ত্র পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটায়। সবচেয়ে বর্বরোচিতভাবে রুমানিয়ায় শাসন ক্ষমতার পতন ঘটানো হয় এবং প্রেসিডেন্ট চসেস্কুকে ফায়ারিং স্কোয়াডে নির্মমভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো বিশ্ব পুঁজিবাদের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ এসব দেশে বিপুলায়তনের রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। তারা দক্ষিণ আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসসহ পৃথিবীজুড়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশসমূহ ও আন্দোলনকে সমর্থন যোগায়। উপরন্তু, সোভিয়েত ইউনিয়নের পারমাণবিক ক্ষমতা মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের বিস্তৃতি ও মাত্রাকে সংযত রাখতে বাধ্য করে।[৩৮]

যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকে নীতিসিদ্ধ করতে গিয়ে প্রায়ই যুক্তি দিয়ে থাকে যে, যথোপযুক্ত ক্ষমতা প্রদর্শন নয়, বরং এক ধরনের দায়িত্বশীলতা থেকে যুক্তরাষ্ট্র এ হস্তক্ষেপ পরিচালনা করে। যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মতাত্ত্বিকরাও বলে থাকেন, আমাদের বিশাল ক্ষমতা রয়েছে, আমাদেরকে এটি দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পল রামসি[*] বলেন, বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে এই ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। ক্ষমতার ফলপ্রসূ ব্যবহারের চেয়েও আবার বিশ্বময় সুশৃঙ্খল ও ন্যায়সঙ্গতভাবে এর প্রয়োগ ঘটানো জরুরী। কিন্তু আমরা এ ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের পরিবর্তে অপব্যবহারই করেছি বেশি। শুধুমাত্র আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দৃষ্টান্তই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। রাজনৈতিক বা সামরিক হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে আমরা দু:খজনকভাবে রাজনৈতিক সমাধানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে ক্ষমতা ব্যবহার করছি। রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতার দিকটি আমাদের কাছে সবসময় উপেক্ষিত হয়েছে। রামসির মতে, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র অনৈতিকতা ও হস্তক্ষেপমূলক কার্যকলাপের ফলপ্রসূতার প্রতিই আকৃষ্ট হয়, তার বিবেকও

---

[*] পল রামসি (১৯১৩-১৯৮৮) বিংশ শতাব্দীর একজন মার্কিন খ্রিষ্টনীতিবিদ। তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

অনৈতিকতা ও অ-হস্তক্ষেপমূলক কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলপ্রসূতা উপলব্ধি করতে সক্ষম। এ বিশ্বকে অবশ্যই কিছু বিশেষ নীতিমালা অনুসরণ করে চলতে হবে।[৩৯] কিন্তু আমরা এ একমেরু বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রকে দেখছি গুয়ানতানামোর মতো কারাগার খুলে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বন্দী নির্যাতনের নানাবিধ মানবাধিকার লঙ্ঘনমূলক তৎপরতা চালাতে। বিভিন্ন দেশে সামরিক হস্তক্ষেপ চালিয়ে নিরীহ মানুষ হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ — এমনকি মৃতদেহ নিয়ে রসিকতাসহ ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতদানের মতো ঘটনাও অজস্র। এছাড়াও লিবিয়া ও ইরাক যুদ্ধে আন্তর্জাতিক নীতিমালা লঙ্ঘন করে ব্যবহার করা হয়েছে রাসায়নিক অস্ত্র। সম্প্রতি লন্ডনভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও নিউইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন এইচআরডব্লিউ পাকিস্তান ও ইয়েমেনে সংঘটিত ১২টি ড্রোন হামলা সম্পর্কে তদন্ত চালিয়েছে। তাদের তদন্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এসব ড্রোন হামলায় বেআইনি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। নিরীহ নিরাপরাধ বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, একক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা এ বিশ্বের কোনো নীতিমালাই অনুসরণ করতে রাজী নয়। অপরদিকে, রামসি রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া পরিচালিত হস্তক্ষেপের যে বিরোধিতা করেছেন তা-ও পুরোপুরি সত্য। সম্প্রতি পাকিস্তানের তেহ্‌রিক-ই-তালেবানের (টিটিপি) জঙ্গিরা যখন সরকারের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে নমনীয় হচ্ছিল, তখন ড্রোন হামলা চালিয়ে টিটিপি নেতা হাকিমুল্লাহ মেহসুদকে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় নেতা ইমরান খান এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আলোচনা ভণ্ডুল করার জন্যই মেহসুদকে হত্যা করা হয়েছে। মূলত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে লড়াই জিইয়ে রাখাই মার্কিনিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আফগানিস্তানে নির্বিঘ্নে তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে রাখতে চায় যাতে পাকিস্তানীরা আফগানিস্তানে গিয়ে লড়াই করতে না পারে। এভাবে রাজনৈতিক মীমাংসার পরিবর্তে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সবসময় অবৈধ সামরিক হস্তক্ষেপকে তাদের নির্বাচিত পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাই এ বিশ্বায়নের যুগে জাতি-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মর্যাদাকে তুচ্ছ করে একটি রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রের ওপরও তাদের অবৈধ সামরিক হস্তক্ষেপ চলছে।

একবিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো নতুনভাবে একের পর এক যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার পরেও সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না নেয়ার জন্য জাতিসংঘের সমালোচনা করে। রাশিয়ার মধ্যস্থতায় শান্তিপূর্ণ সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি হলেও যুক্তরাষ্ট্র তাকে

উপেক্ষা করে উল্টো আরও রাশিয়াকে চাপ প্রদান করছে সিরিয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘে কঠোর প্রস্তাব আনার। অন্য দেশ কর্তৃক এ ধরনের রাজনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপ বিশ্ব ইতিহাসের ঘটনাবলী ও কার্যক্রমের সঙ্গে দু:খজনকভাবে জড়িয়ে আছে। তাই অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের বলে, যদি একটি অ-হস্তক্ষেপমূলক নীতি গ্রহণ করতে হয়, তাহলে সাম্রাজ্যের দিক থেকে ক্ষমতাধর ও দায়িত্বশীল জাতির নেতাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। যদি এ বিশ্বের আঞ্চলিক লোক প্রশাসনগুলোকে যথাযথভাবে তাদের অধিকার ও কর্তব্য পালন করতে দেয়া হয়, তাহলে জাতি-রাষ্ট্রগুলোর হস্তক্ষেপের অধিকার ও কর্তব্যকে নৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে তিরোহিত করা যেত। এক্ষেত্রে জাতি-রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামোগত দুর্বলতা দূর করে হস্তক্ষেপ এড়ানো যেতে পারে। বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থার অধীনে বিশ্ব রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যদি কোনো যুক্তিসম্মত নীতিমালা অনুসরণ করে চলতো, তবে একটি জাতির ক্ষমতা ও কর্তব্যের যথোপযুক্ত ব্যবহারের জন্য হস্তক্ষেপের মূলনীতি বাস্তবায়নের প্রয়োজন পড়তো না।[৪০] কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, অবৈধ হস্তক্ষেপকে বৈধতা দিতে আন্তর্জাতিক মোড়লরা প্রায়ই ভ্রান্তিমূলক যুক্তি ব্যবহার করে কিংবা আন্তর্জাতিক আইনকে বিভ্রান্তিকর বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহার করে। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধকে বৈধতা দিতে সাবেক বুশ প্রশাসন একের পর এক মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাকে যুক্তিসিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। সম্প্রতি সিরিয়া আক্রমণকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে বিশ্বনেতা ও তাত্ত্বিকরা 'আন্তর্জাতিক সুরক্ষামূলক আইন'কে ভুলভাবে ও অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি দিয়ে নীতিসিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও ২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধে যে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল গোপন নথি প্রকাশের পর এ যুদ্ধশেষে পরিদৃশ্যমান বাস্তবতা দেখে তার অন্যায্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

হস্তক্ষেপকে সম্ভাব্য বৈধতাদানের চূড়ান্ত কোনো ভিত্তি থাকা প্রয়োজন। এ ধরনের যৌক্তিক ভিত্তি রাষ্ট্রনায়ককে বলে দেবে হস্তক্ষেপের কোনো বিকল্প আছে কি না কিংবা কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে অ-হস্তক্ষেপমূলক পদক্ষেপ নেয়া যায়। যখন একটি হস্তক্ষেপ রাজনৈতিকভাবে বিচক্ষণ ও সঠিক হয় তখন একে সাধারণত 'ন্যায়যুদ্ধ হস্তক্ষেপ' বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রনায়ককে রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে হস্তক্ষেপ করা বা না করার সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু বিশ্বসম্প্রদায় এখনও পর্যন্ত ন্যায়ের প্রশ্নে সর্বসম্মত হতে পারেনি।[৪১] সিরিয়া প্রসঙ্গই ধরা যাক। রাশিয়া বলছে, বৈধ সরকারকে সহযোগিতা করা আইনসিদ্ধ। অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য

ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো বিদ্রোহীদের অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য প্রদানসহ নানাভাবে রাজনৈতিক ও নীতিগত সমর্থন দিয়ে আসছে। তাদের ঐকমত্যের অভাবে জেনেভা শান্তি সম্মেলন বার বার ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে এইচ.রিচার্ড নিবার* বলেছেন, আমাদের কোনো 'সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি' নেই, আমাদের শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু 'দৃষ্টিভঙ্গি আছে যা সার্বিক'। এ বক্তব্যটিকে আমরা আত্মগত আপেক্ষিকতাবাদ বলতে পারি না। রামসি বলেন, এর দ্বারা এটি বোঝাচ্ছে না যে, আমরা এক ধরনের অবাস্তব সর্বজনীন ন্যায়ের জন্য বহির্বিশ্বে নিজেদের বিসর্জন দেবো অথবা বাস্তব ন্যায় সম্পর্কে আমাদের কোনো স্থির ধারণা নেই এবং আমরা শুধুমাত্র বাস্তব সম্প্রদায়গুলোর মধ্যকার সদ্ভাব ও বিরোধ সম্পর্কে 'সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি' গঠন করতে পারি। এ থেকে বোঝা যায়, সাধারণ ন্যায়ের ধারণাকে আমরা রাজনৈতিক নির্বাচন ও কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবসম্মত ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারি। এর মধ্য দিয়ে সাধারণ ভালো'র 'বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি' গঠিত হয়। তাই আগ্রাসনের বৈধতাদানের দিকটি 'জাতীয় সাধারণ ভালো' ও 'আন্তর্জাতিক সাধারণ ভালো'র ধারণা দিয়ে যাচাই করা যেতে পারে। এই 'ভালো'গুলো সবসময় একরকম হয় না। এজন্য একজন রাষ্ট্রনায়ককে রাজনৈতিকভাবে তার নৈতিক বাধ্যবাধকতা নির্ণয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাধারণ ভালোর মানদণ্ড অনুসরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে একজন রাষ্ট্রনায়কের যদি 'আন্তর্জাতিক সাধারণ ভালো' সম্পর্কে সংকীর্ণ ধারণা থাকে এবং নিজের জাতির জন্য সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ ভালোটি নির্বাচন করতে সে ব্যর্থ হয়, সে অবশ্যই এ বিশ্বকে বিপদের মধ্যে ফেলে দেবে। তাহলে বলতে হবে, সে অতি সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত এবং 'আন্তর্জাতিক সাধারণ ভালো'র পক্ষে যতটুকু কাজ করার সম্ভাবনা ছিল সে এই দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি ব্যর্থ। পরিণামে সে তার নিজের জাতির 'সাধারণ ভালো'র জন্য কাজ করতে ব্যর্থ হয় এবং ভবিষ্যতেও জাতি তার কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করতে পারে না।[৪২]

রিগ্যান প্রশাসনের সময়কালে বহির্বিশ্বে হস্তক্ষেপের যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তার ফলশ্রুতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট সরকারের পতন হয়। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সংকুচিত হয়ে আসে। এসব দেশে মুদ্রাস্ফীতি, দারিদ্র, অনাহার, ব্যাধি, দুর্নীতি, জাতিগত সংঘাত, সন্ত্রাস, সহিংস অপরাধ[৪৩] ক্রমাগত বেড়ে চলে। রিগ্যান প্রশাসনের এ পরোক্ষ সমরবাদী নীতির কুফলের পাশাপাশি তার

* রিচার্ড নিবার (১৮৯৪-১৯৬২) বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খ্রিস্ট নীতিবিদ। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে *Christ and Culture* (1951) ও *The Responsible Soul* (1962) বহুল প্রচলিত।

প্রত্যক্ষ সমরবাদের কুফল ভোগ করেছে গ্রানাডা ও নিকারাগুয়ার মতো দেশগুলো। গ্রানাডার 'নিউ জুয়েল মুভমেন্ট' এর অধীনে অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা, বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবাপ্রদান ও খাদ্য বিতরণ, দরিদ্রদের বসতভিটা সংস্কারের মতো যেসব সমতাবাদী কর্মসূচী নেয়া হয়েছিল মার্কিন আগ্রাসনের পরে তা বাতিল হয়ে যায়। এর অনিবার্য ফলাফল ছিল দারিদ্র ও বেকারত্ব। ১৯৮৫ সালে নিকারাগুয়া সরকারের কার্যক্রমকে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতির জন্য হুমকি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়। নিকারাগুয়ার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে নমনীয় আক্রমণ পরিচালনার ঘোষণা দিলেও সেসময়ে মার্কিন বাহিনীর নৃশংসতা ও হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা মানবাধিকার সংস্থাগুলোর রিপোর্টে উঠে এসেছে। নিরীহ জনগণের ওপর সেখানে মার্কিনিদের বিমান হামলা চলে। আপাতদৃষ্টিতে এ ধরনের অমানবিক হস্তক্ষেপকে সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের রক্ষক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা জাতীয় স্বার্থেও কোনো ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে না। এভাবে বিদেশে সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে জনগণের সার্বভৌমত্ব পদদলিত হয় আর গুটিকয়েক কর্পোরেশনের পুঁজির পুঞ্জীভবনের পথ প্রশস্ত হয়।

রিগ্যান প্রশাসনের হাত ধরে যে রক্ষণশীল সমরবাদের সূচনা দ্বিতীয় বুশের হাতে তার পূর্ণতাসাধন ঘটে। এ উগ্র সমরবাদ ইরাক ও আফগানিস্তানে বিপুল প্রাণহানি, মানবিক বিপর্যয়, দারিদ্র, অনাহার, আশ্রয়হীনতা সৃষ্টি ও ফিলিস্তিনে নির্যাতন ও শোষণের মাত্রা বৃদ্ধিসহ বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রবণতা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। তাদের কথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয় তা মার্কিন সরকারের বাজেট ঘাটতিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যায়। আজও এর খেসারত দিতে হচ্ছে মার্কিন জনগণকে। অর্থ বরাদ্দের অভাবে বেশকিছু সরকারি সেবাখাত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ২০১৩ সালের শেষের দিক থেকে আট লাখ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সেইসঙ্গে জাতীয় পার্ক, পরিবেশ রক্ষা বিষয়ক সংস্থা, মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (নাসা)সহ সরকারের বেশকিছু সংস্থার বেশির ভাগ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। তবে সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও নিরাপত্তা বিষয়ক সংস্থাগুলোর ওপর এর কোনো প্রভাব পড়বে না। শ্রেণীস্বার্থে নিবেদিত এহেন সমরবাদী উগ্রতাকে কোনো নৈতিক মানদণ্ডে ফেলেই গ্রহণযোগ্যতা দেয়া যায় না। 'জাতীয় সাধারণ ভালো' ও 'আন্তর্জাতিক সাধারণ ভালো'র প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী এ ধরনের রাষ্ট্রনীতি শুধুমাত্র গুটিকয়েক বিত্তবান মানুষের আত্মস্বার্থবাদী শ্রেণী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।

পরিবেশগত বিশ্বায়ন ও অস্তিত্বের সংকট

বিশ্বায়ন পরিবেশগত ন্যায়ের সমস্যাটি সৃষ্টি করেছে। বৈশ্বিক মোড়লদের সম্পদ ও কাঁচামালের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করতে এবং তৃতীয় বিশ্বের ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার চাপ মেটাতে পরিবেশগত ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। ম্যাসন* (২০০০) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, পরিবেশগত বিপদ মানবীয় কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। এ ধরনের ঝুঁকিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) ভারসাম্যহীন উন্নয়নের জন্য সৃষ্ট 'আধুনিক বিপদ'। প্রথম ধরনের ঝুঁকিটি সৃষ্টি হয়েছে দারিদ্র ও দ্রূত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে। আর আধুনিক বিপদটি সৃষ্টি করেছে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন ও নগরায়ন।[৪৪]

পরিবেশগত সমস্যাগুলো শিল্পায়নের উৎপাদন ও ভোগের প্রকৃতি এবং বাজার অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাজার অর্থনীতির সম্পদের চাহিদা মেটানোর পদ্ধতি মূলত যান্ত্রিক। তাই ইঞ্জিন বা মেশিন থেকে অনাবশ্যক বাষ্পাদির নির্গমন ও রাসায়নিকভাবে বিষক্রিয়া তৈরি করা বাজার অর্থনীতির উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন। এ উৎপাদন পদ্ধতি বায়ু ও রাসায়নিক দূষণ এবং প্রচুর বর্জ্য সৃষ্টি করে। এতে জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়। বিশ্বায়নের সুবাদে উৎপাদনের যে অতিজাতিক কাঠামোর সূত্রপাত ঘটেছে তা উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তুলেছে। একদিকে, উন্নত দেশগুলো তাদের কারখানা সস্তা শ্রমের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে স্থানান্তর করে তাদের পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হচ্ছে। অপরদিকে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সুনির্দিষ্ট কোনো সুরক্ষামূলক আইন না থাকায় উন্নত দেশগুলো তাদের শিল্পবর্জ্য ফেলে আসছে এ দেশগুলোতে। বৈশ্বিক শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার এ পরিবেশগত বিশ্বায়ন তৃতীয় বিশ্বের জন্য সৃষ্টি করছে অস্তিত্বের সংকট।

বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতামূলক চরিত্র বিশ্বব্যাপী পুঁজি পুঞ্জীভবনের প্রক্রিয়াকে আরও সচল করেছে। আর এ পুঞ্জীভবনকে সচল রাখতে গিয়ে সারা বিশ্বজুড়ে কাঁচামালের উৎসগুলো দখলে আনতে হয়। এ কাজের জন্য উপযুক্ত মনে করা হয় সেসব দেশকে যাদের শ্রম ও পরিবেশ

---

* কীথ টি. ম্যাসন সিনিয়র এক্সপেরিমেন্টাল অফিসার হিসেবে কীল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন। এছাড়া তিনি ভূগোল, মানব ভূগোল ও জৈবিক ভূগোল বিষয়ে শিক্ষকতা করেছেন।

সুরক্ষামূলক আইন দুর্বল। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন এমন একটি আদর্শনিষ্ঠ প্রক্রিয়া যেখানে সব ধরনের মূল্যবোধকে পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র ‘বাণিজ্যিক মূল্যবোধ’কে গুরুত্ব দেয়া হয়।[৪৫] বৈশ্বিক ক্ষমতার পরিসরে এক ধরনের বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে এ ‘বাণিজ্যিক মূল্য’ রক্ষা করা হয়। এক্ষেত্রে ক্ষমতাবান বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো সার্বভৌম সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা গঠনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এভাবে জাতীয় সার্বভৌমত্বকে বিসর্জন দেয়া বিশ্বায়নের একটি সুপরিচিত ও বিতর্কিত বৈশিষ্ট্য। এখন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর ক্রমবর্ধমান প্রভাব গণতান্ত্রিক অনুশীলনের মৌলিক উপাদানে পরিণত হয়েছে যা সামাজিক ও পরিবেশগত দিকগুলোকে প্রভাবিত করছে।[৪৬]

নব্য-উদারতাবাদী বিশ্বব্যবস্থার ত্রুটি ঢাকতে গিয়ে ধনী দেশগুলো এখন ‘জলবায়ু পরিবর্তন’ শব্দটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। এজন্য বড় শিল্পোন্নত দেশগুলো পরিবেশ বিপর্যয় বা বৈশ্বিক উপকরণ নিয়ে আলোচনায় আগ্রহ দেখালেও দায়িত্ব পালনে রাজী নয়। তাই জলবায়ু বিপর্যয়কে পুঁজি করেও তারা দিব্যি মুনাফা লুটে চলেছেন। নদীতে বাণিজ্যিকভাবে বাঁধ নির্মাণ করে তাকে অবরুদ্ধ করে ফেলে নদীর এ অবস্থার জন্য আবার তারা জলবায়ু পরিবর্তনকেই দায়ী করছেন। বন-জঙ্গল বিনাশ করে যে কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই কারখানার কার্বন নি:সরণকে বাদ দিয়ে তারা বন ধ্বংসের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করছেন। বহুজাতিক কর্পোরেশনের রাসায়নিক বিষের বাজারের স্বার্থে প্রাণ হারাচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের স্থানীয় মৎস সম্পদ। এমনকি পশ্চিমা দেশগুলো তাদের দূষণযুক্ত বর্জ্য সমৃদ্ধ জাহাজ এদেশে রপ্তানি করে দিচ্ছে। কারণ তাদের দেশে এই বর্জ্য নিক্ষেপ নিষিদ্ধ। আবার রি+২০ সম্মেলনে ধনী দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের ওপর সবুজ অর্থনীতির নামে পরিবেশ বিধ্বংসী প্রস্তাব চাপাতে চেয়েছে। এভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম ও পরিবেশ সুরক্ষার নামে পশ্চিমা বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে নানা পরিবেশ ধ্বংসকারী প্রেসক্রিপশন, শুধুমাত্র নিজেদের নির্লজ্জ বাণিজ্যিক স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়োজনে।

বাজার অর্থনীতি অসম বণ্টনব্যবস্থার উদগাতা। বাজারের অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে সম্পদের অসম বণ্টন দেখা দেয়। বেকারম্যান[*] মনে করেন, অনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ব্যবসা-

[*] উইলফ্রেড বেকারম্যান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যালিওল কলেজের ইমেরিটাস গবেষক এবং লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের অর্থনীতির অনারারি ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছেন।

প্রতিষ্ঠানগুলোকে ত্রূটিপূর্ণ বণ্টনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সহায়তা করে। আর অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটায় ন-অর্থনৈতিক কিছু বাহ্যিক উপাদান। অর্থনীতি বহির্ভূত এসব উপাদান প্রবৃদ্ধি অর্জনের সঠিক প্রক্রিয়াটি বাতলে দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে পরিবেশগত সুরক্ষার বিষয়টি আরও কঠিন হয়ে পড়ে।[৪৭] এক্ষেত্রে পরিবেশগত অবক্ষয়ের সাধারণ প্রতিকার হতে পারে সরকারি আইনের আংশিক সংস্কার ঘটিয়ে নতুন বিধিমালা প্রবর্তন। কিন্তু জাতীয় বিধিমালা ও আন্তর্জাতিক বিধিমালার মধ্যে প্রায়শ এক ধরনের টানাপোড়েন বিরাজ করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জাতীয় রাজস্ব নীতিমালায় সাধারণভাবে দেশীয় চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু আন্তর্জাতিক নীতিমালায় বাণিজ্যের স্থিতিশীলতা রক্ষায় 'সুরক্ষাবাদ'কে সবসময় উপেক্ষা করা হয়। কারণ একে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির পথে বাধা মনে করা হয়। আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, গ্যাট ও নতুন বিশ্বে প্রবর্তিত উন্নয়ন তহবিলগুলোতে একটি জাতীয় নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক নীতিমালাকে অধিক অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। যদিও তারা ঘোষণা দেয়, এসব বিধিমালা তৃতীয় বিশ্বের বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে। কিন্তু এ প্রবেশাধিকার কেবল আমদানিনির্ভর উপাত্ত হিসেবে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির গতিধারাকে সচল রাখার প্রয়োজনে। অথচ বৈশ্বিকভাবে প্রচারণা চালানা হয় যে, বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা ছাড়া তৃতীয় বিশ্বে দারিদ্র পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে। আবার এ দারিদ্র জন্ম দেবে পরিবেশগত অবক্ষয়ের। কেননা, ক্ষুধার্ত মানুষ ভূমির ওপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করবে এবং ভূমি ও জ্বালানির জন্য বনভূমি উজাড় করে ফেলবে। আর এ আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অর্থনৈতিক প্রস্তাবের প্রবর্তন করতে হবে।[৪৮]

বৈশ্বিক মোড়লদের প্রস্তাবিত এসব ফর্মুলা সবসময়ই স্ববিরোধিতা ও অন্যায্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। বাস্তবিকপক্ষে, ধনী দেশগুলোই কৃষিপণ্য বা তা থেকে উৎপন্ন খাদ্যসামগ্রীর একচেটিয়াকরণে আগ্রহী। মার্কিন কৃষি ব্যবসায়ী ফার্মগুলোর আগ্রাসনের ফলে পৃথিবীর কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে। এর পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও শুরু করেছে কৃষিপণ্য নিয়ে ফাটকা ব্যবসা। এর পরিণতিতে সৃষ্টি হচ্ছে কৃত্রিম খাদ্যসংকট। তাদের প্রবর্তিত যান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতি তৃতীয় বিশ্বের স্থানীয় পরিবেশবান্ধব কৃষি পদ্ধতিকে নির্মূল করে ভূমিক্ষয়, বননিধন ও জীবমণ্ডলের ধ্বংসসাধনের মতো সমস্যা সৃষ্টি করে। আধুনিক শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়া এখন নিজেই শোষণ ও ধ্বংসের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা না করে তার যথেচ্ছ

ব্যবহার ও পরিবেশ দূষণের মাধ্যমে পরিবেশগত ভারসাম্য বিনাশ করে পুনরুদ্ধারের অযোগ্য করে তোলাই এ উৎপাদন প্রক্রিয়ার মূল বৈশিষ্ট্য। এভাবে এ উৎপাদন প্রক্রিয়া ক্রমশ একটি ধ্বংসমূলক ও আত্মনিধনমূলক প্রবণতার জন্ম দেয়। বিশ্বায়নের কল্যাণে এখন আন্তর্জাতিক বিধিমালা প্রণয়ন করে এ নিধন প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা হচ্ছে তা-ও আবার পরিবেশ সুরক্ষামূলক আইনের নামে। যেমন, কিওটো প্রটোকলে উল্লেখ আছে, সমস্ত জীবাশ্ম জ্বালানি নি:শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার অব্যাহত থাকবে এবং প্রকৃতির সমস্ত জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত সম্পদ শেষ হলে প্রকৃতিতে কার্বন সঞ্চারণের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া চলমান রাখা হবে যা এ বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম পূর্বশর্তরূপে বিদ্যমান।[৪৯] ভূমিক্ষয় এবং বননিধনের মতো পরিবেশ বিপর্যয়ের সমস্যাগুলো মূলত তৈরি হয় উন্নত দেশগুলোর অতিভোগের কারণে। বিশেষ করে মার্কিন একচেটিয়া কৃষি ফার্মগুলোর একচেটিয়া রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও যান্ত্রিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বে যে উৎপাদন পদ্ধতি চালু হয়েছে, তাই এ বিশ্বে পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রধান নিয়ামক হয়ে উঠেছে। এভাবে কৃষির মতো তৃতীয় বিশ্বের ওপর উন্নত বিশ্বের চাপিয়ে দেয়া শিল্পায়নও এখন তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে।

বিশ্বায়নের মোড়কে পুঁজির আত্ম-বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সময়ে বিচ্ছিন্নতার সমস্যাটি আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। প্রকৃতি, উৎপাদিত দ্রব্য ও অপরাপর মানুষ থেকে তার বিচ্ছিন্নতা আরও গভীরতর হয়েছে। আবার ধনীদের তুলনায় দরিদ্ররা সবসময় অধিকতর পরিবেশগত ঝুঁকির শিকার হয়। বিশ্বময় তাই ধনী দেশগুলোর তুলনায় দরিদ্র দেশগুলো অনেক বেশি এ ঝুঁকির মোকাবেলা করছে। এমনকি পার্শ্ববর্তী শক্তিমান রাষ্ট্রটি অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জাতিটিকে বিপর্যয়কর পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। বাংলাদেশের রামপালে ভারতের কোম্পানি এনটিপিসির বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সাম্প্রতিক কর্মসূচি এ ধরনের শোষণ ও বৈষম্যের একটি চরমতম রূপ। রামপাল প্রকল্পে এনপিটিসি মাত্র ১৫ শতাংশ বিনিয়োগে সমান (৫০%) অংশীদারিত্ব পাচ্ছে। কিন্তু পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বিপর্যয়ের বোঝা টানবে মূলত বাংলাদেশ। অথচ এই ভারতের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের 'তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত গাইড লাইন আগস্ট ২০১০' অনুসারে কোনো সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং জীব বৈচিত্র্যসম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের ২৫ কিলোমিটারের মধ্যে তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ নিষিদ্ধ।[৫০] সুতরাং নিজ দেশের আইন ভঙ্গ করে ভারতীয় কোম্পানি

বাংলাদেশে রামপাল প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। এভাবে বিশ্বায়নের যুগে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা জন্ম দিচ্ছে ব্যাপক মানবিক বিপর্যয়।

শক্তিমানদের মুনাফার স্বার্থে যে বিপর্যয় তার শিকার হয় সাধারণভাবে দরিদ্র মানুষেরা। কারণ পরিবেশ দূষণের ক্ষতির ভার তাদেরকেই বহন করতে হয়, হারাতে হয় বসত-ভিটা ও জীবিকা নির্বাহের উপায় ও বরণ করে নিতে হয় আরও দারিদ্র। এমনকি দূষণের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগেরও প্রধান শিকারে পরিণত হয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী। দূষণের সরাসরি কুফল হিসেবে পাওয়া ঝুঁকির বিপদও তাদের বয়ে বেড়াতে হয়। কখনো বংশানুক্রমিকভাবে তাদের সন্তানদের ওপরও স্বাস্থ্যগত দুর্ভোগ বহন করতে হয়। এসবই হচ্ছে শ্রেণীর অসম পুরাতন অভিব্যক্তির পুনরাবির্ভাব। কিন্তু, দু:খজনকভাবে পরিবেশ সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতেও এই শ্রেণী বৈষম্যের প্রতিফলন ঘটে। ধনী দেশগুলো সেখানে ক্ষতির তুলনায় অধিক লাভের যুক্তি দিয়ে সহজেই কোনো চুক্তি স্বাক্ষর এড়িয়ে যায়। প্রায়ই তারা শক্ত আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে বেরিয়ে দুর্বল চুক্তি করতে বলে। আবার জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে যে খাদ্য সংকটের আশঙ্কা রয়েছে তার সমাধান নিয়েও তারা নতুন ব্যবসার প্রবর্তন ঘটাচ্ছে যার নির্মম শিকারে পরিণত হচ্ছে দরিদ্র দেশগুলো।

বিশ্বায়নের শোষণমূলক কাঠামো অর্থনীতির ভিত্তিতে যে সবল ও দুর্বলের বিভাজন টেনেছে তাতে অনুন্নত দেশগুলো তার নিজ দেশের প্রকৃতির ওপরও নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। অতিজাতিক এলিট, উন্নত দেশগুলোর সরকার এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর আত্মস্বার্থের কাছে বিলীন হয়ে যাচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের প্রাণ সংরক্ষণের অধিকার, সৃষ্টি হচ্ছে অস্তিত্বের সংকট। বিশ্বায়নের মোড়কে অতিজাতিক কর্পোরেট ব্যবস্থা শ্রেণী স্বার্থের যে সংঘাত সৃষ্টি করছে তার প্রভাব এখন আর জাতীয় পরিসরে সীমিত থাকছে না, ক্রমাগত বৈশ্বিক পরিসরে বিস্তৃত হচ্ছে। কেননা একটি অতিজাতিক কর্পোরেশন যখন বহু দেশে ছড়িয়ে থাকা তাদের শত শত কারখানা, খনি ও মিল থেকে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ নি:সরণ করে জীবন ও পরিবেশের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে, তখন তা কেবল নির্দিষ্ট কোনো দেশের সমস্যা থাকে না। এ সমস্যা তখন এ বিশ্বের সকলের সমস্যায় রূপায়িত হয়। অতিজাতিক কর্পোরেশনগুলোর মুনাফা বাড়ানোর স্বার্থে সাম্প্রতিককালে উচ্চ মাত্রায় রাসায়নিক পদার্থের দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবহার পরোক্ষভাবে এ গ্রহের সকলকে আক্রান্ত করছে।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং, এ শোষণ আর সংকট এখন কেবল শ্রমজীবী শ্রেণীর নয়, এ সংকট এখন সমগ্র মানবজাতির।

সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন ও মানসিক দাসত্ব

সাম্রাজ্যবাদ তার অর্থনৈতিক স্বার্থেই সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের নীতি গ্রহণ করে। বিশ্বায়ন যে গ্লোবাল ভিলেজের ধারণাটি এনেছে সংস্কৃতির মোড়কে মিডিয়া ও প্রযুক্তির কল্যাণে তাকে ছড়িয়ে দেয়া এখন আরও সহজ হয়ে পড়েছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া এখন যোগাযোগের নেটওয়ার্কের গতি বৃদ্ধি করেছে এবং শোষণমূলক সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিকে বৈশ্বিক পর্যায়ে বিকশিত করেছে। বিশ্বায়িত মিডিয়ার কল্যাণে সাম্রাজ্যবাদ সহজেই আজকের দিনে তার পছন্দমতো শত্রুচ তৈরি করে বিশ্বব্যাপী মানবমনে সে শত্রুচ সম্পর্কে ভীতি বা ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে। আশির দশকে ও নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সাম্যবাদ সম্পর্কে নানা কাল্পনিক ভীতিকর তত্ত্ব ও তথ্য হাজির করে জনমনে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব সৃষ্টিতে অগ্রগণ্য ভূমিকা রেখেছে পশ্চিমা তথা মার্কিন মিডিয়া। স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পরে সাম্প্রতিক বিশ্বে তাদের কথিত ইসলামী জঙ্গিবাদ সে শূন্যস্থান দখল করেছে। পশ্চিমা অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যে পুষ্ট আল-কায়েদাসহ অন্যান্য জঙ্গি সংগঠন ও তাদের নেতাদের সম্পর্কে আকর্ষণীয় ও ম্যানিপুলেটেড তথ্য সরবরাহ করে এখন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা তাদের 'সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধ'কে অনন্তকাল টিকিয়ে রাখতে চায়। বলাই বাহুল্য যে, এ যুদ্ধ আদৌ সন্ত্রাসবাদবিরোধী নয়, বরং সন্ত্রাসবাদী সাম্রাজ্য দখলের যুদ্ধ।

স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রচারিত বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় মার্কিন সিরিজ ম্যাকগাইভারে ভিলেন চরিত্রে অধিকাংশ সময়েই সোভিয়েতদের দেখানো হতো। এ সিরিজের নায়ক চরিত্র ছিল মার্কিন এক গোয়েন্দা যিনি সারা বিশ্বের নিপীড়িত ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে উদ্ধারে সদাতৎপর। এর বিভিন্ন পর্বে দেখানো হয়েছে, ম্যাকগাইভার সোভিয়েত নির্যাতনের শিকার আফগানদের রক্ষা করছে কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে ভিন্নমতাবলম্বীদের জেলখানা থেকে উদ্ধার করে আসছে। সম্পূর্ণ এক মেরু একটি বিশ্ব গড়ার সবরকম সাংস্কৃতিক উপাদান ম্যাকগাইভারে সন্নিবেশিত ছিল। এ সিরিজে মার্কিনীদের উপস্থাপন করা হয়েছে মানবদরদী ও বিশ্বময় নির্যাতিত অসহায় মানুষের বন্ধু হিসেবে। অপরদিকে, রাশিয়ান, জার্মান বা চীনাদের দেখানো হয়েছে অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর হিসেবে। এভাবে

সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন মানবমনে মার্কিন দাসত্বের বীজ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। একইভাবে, দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধের সময়ে স্টার স্পোর্টসে প্রচারিত জনপ্রিয় রেসলিং শো ডব্লিউডব্লিউএফ (ওয়ার্ল্ড রেসলিং ফেডারেশন)-এ নাটিকার আকারে বিনোদনমূলক রেসলিং দেখানো হতো, তাতেও যুদ্ধংদেহী সাম্রাজ্যবাদকে দেয়া হতো নগ্ন সমর্থন। ফরাসীরা ইরাক যুদ্ধে অংশ না নেয়ায় সেসময়ে ফরাসীদের উপস্থাপন করা হতো ভীরু ও কাপুরুষ হিসেবে। মার্কিন মিত্রদের 'ভালো মানুষ' হিসেবে উপস্থাপন করা হতো। শত্রুচ রাষ্ট্রগুলোর রেসলারদের অমানবিক ও পরাজিত হিসেবে প্রদর্শন করা হতো। অপরদিকে, মার্কিন শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি সবসময় সেখানে প্রাধান্য পেত। পাশাপাশি মারমুখী প্রবণতাকে পরোক্ষভাবে সমর্থন জানানো হতো। ইরাক যুদ্ধের সময়ে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইনকে নিয়ে বিদ্রূপাত্মক নাটিকা দেখানো হয়েছে। এখনও এ ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে ইরাকে মার্কিন মহানুভবতার বানোয়াট গল্পের ওপর নির্মিত মার্কিন চলচ্চিত্র *দ্য হার্ট লকার* ও ইরানবিদ্বেষী চলচ্চিত্র *দ্য আর্গো*কে সর্বোচ্চ পুরস্কার 'অস্কারে' ভূষিত করা হয়। সেইসঙ্গে ভিন্নমতকে রুখে দিতে মাইকেল ম্যূরের *ফারেনহাইট* **৯/১১** কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয় যা ফ্রান্সে সর্বোচ্চ খেতাব জয় করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সমরবাদী প্রবণতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য সবসময় মিডিয়াকে ব্যবহার করেছে, এখনও ব্যবহার করে যাচ্ছে। অন্যায় যুদ্ধগুলোকে ন্যায্যতা দিতে বৈশ্বিক মিডিয়াগুলো সদাতৎপর। মিথ্যা ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করে গণতন্ত্র, মানব-মুক্তি ও স্বাধীনতার বুলি আওড়িয়ে বিশ্বের তেল-গ্যাস সম্পদ দখল ও ভূ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মিডিয়া আলগর্কি সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়ে প্রধান প্রধান টিভি নেটওয়ার্ক এ যুদ্ধকে সামরিক শিল্প কমপ্লেক্সগুলোর জন্য বিজ্ঞাপন হিসেবে কাজে লাগায়। এক্ষেত্রে স্ফীত সামরিক বাজেটের পক্ষে মিডিয়া এক প্রকার ত্রাতা হিসেবে কাজ করে।[৫১] আবার, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে সাধারণভাবে ধ্বংসযজ্ঞ দেখে বীতশ্রদ্ধ মানুষকে পুনরায় যুদ্ধাগ্রহী করে তোলার পেছনেও মিডিয়ার অবদান কম নয়। বৈশ্বিক মিডিয়া যে 'যুদ্ধ জয় বা বিজয়ের দর্শন' ছড়িয়ে দেয় তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণ অন্যায় যুদ্ধকে দেশপ্রেমের 'প্রতিভূ' ভাবতে শুরু করে। মিডিয়ার এহেন প্রচারণার কল্যাণেই প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় অতি উৎসাহী কিছু মার্কিন জনগণকে হলুদ ফিতেও বাঁধতে দেখা যায়।

মার্কিন মিডিয়া ও চলচ্চিত্রে এখন পর্যন্ত মুসলিমবিদ্বেষ অগ্রাধিকার পাচ্ছে। সংবাদ-মাধ্যমে মুসলিমদের 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দেয়া হচ্ছে, চলচ্চিত্রে তাদের ভিলেন হিসেবে দেখানো হচ্ছে। যদিও এফবিআই ডাটাবেস থেকে বের হওয়া প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৯৮০-২০০৫ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত ৬% সন্ত্রাসী ঘটনায় মুসলিমরা জড়িত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে নাজীরা যেমন সব সংকটের প্রাণকেন্দ্রে 'ইহুদী ষড়যন্ত্র'কে দায়ী করেছিল, একইভাবে আজকের সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব 'মুসলিম সংকটে'র গল্প হাজির করে যা প্রাচ্যবিদ্বেষী পশ্চিমের মনে ছাপ ফেলে। এটি এক ধরনের প্রতীকের মতো যাকে যিযেক 'মাস্টার সিগনিফায়ার' বলে অভিহিত করেছেন। মিডিয়া আবিস্কৃত মুসলিম সন্ত্রাস এখন একটি 'মাস্টার সিগনিফায়ার'। বিশ্ব মিডিয়া এই মুসলিম জুজু আবিষ্কারের পর মন্দা, বেকারত্ব, পুলিশি নিপীড়ন থেকে জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছে।[৫২] এ কাজে তারা পুরোপুরি সফল। কারণ গ্যালাপ জরিপ থেকে জানা যায়, ৫২ শতাংশ আমেরিকান মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন।[৫৩] এই বিদ্বেষ সৃষ্টি করেই একের পর এক মুসলিম অধ্যুষিত দেশে হামলা চালানো জায়েজ করা যাচ্ছে।

এই বিদ্বেষের সংস্কৃতি ছড়ানোর পাশাপাশি মিডিয়া সাম্রাজ্য মার্কিন ও পশ্চিমা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণেও কম পিছিয়ে নেই। স্বনির্ভর রাষ্ট্রগুলোকে ঔপনিবেশিকতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পশ্চিমা শক্তিগুলো ইউনেস্কোকে ব্যবহার করছে। এতে তারা বৈশ্বিক মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি একটি দেশের স্থানীয় গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণারোপে সক্ষম হয়েছে। এর মাধ্যমে নব্য-উদারতাবাদী দর্শনকে যেমন তারা বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে প্রচার করতে সমর্থ হয়েছে, তেমনি নিজেদের অভিরুচি, ফ্যাশন, ভোগের চরিত্রকে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের কাছে অনুকরণীয় হিসেবে উপস্থাপন করতে পেরেছে। বহুজাতিক কর্পোরেশনের পণ্যগুলোকে তারা 'আভিজাত্যের প্রতীক' হিসেবে প্রদর্শন করে থাকে যাতে মানবমন সহজেই পণ্যের সেবাদাসে পরিণত হয়। বিভিন্ন 'ব্র্যান্ড নেম' ব্যবহার করে পণ্যগুলোকে আকর্ষণীয় বস্তুতে পরিণত করা হয়। ফলে মিকি মাউস, কোকাকোলা, ম্যাকডোনাল্ড কালক্রমে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় বস্তুতে উন্নীত হয়েছে। মানুষের মানস জগতে দাস মনোবৃত্তি ও শ্রেণী বৈষম্যের দর্শনকে টিকিয়ে রাখতে কর্পোরেট মিডিয়া চালু করেছে 'তারকা সংস্কৃতি'। জনপ্রিয় চলচ্চিত্র, টিভি ও সংগীত ব্যক্তিত্বদের তাদের পণ্যের 'ব্র্যান্ড এ্যাম্বাসেডর' হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সমাজে তাদের উচ্চবর্গীয়ের স্থান দেওয়া হয়

ও অন্যান্যদের তাদের অনুসারী অধীনস্থের পর্যায়ে নামিয়ে আনার এক অঘোষিত শ্রেণীদর্শন কার্যকর করা হয়। এতে মানবচিত্তে গুটিকয়েক মানুষের ক্ষমতা ও আধিপত্যকে মেনে নেয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

মিডিয়ার প্রচারণা ছাড়াও গবেষণা কর্মকে প্রভাবিত করার ফর্মুলাও জানা আছে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের প্রবক্তাদের। এক্ষেত্রে মার্কিন সরকারের অর্থ সাহায্যে ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি (NED) এবং এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টসহ (USAID) বিভিন্ন সংস্থা ফোর্ড ফাউন্ডেশন ও সমগোত্রীয় সংগঠনগুলোর সঙ্গে মিলে নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব সংস্থা বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম, সমাজবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, গবেষণা ও ছাত্র বৃত্তির জন্য অর্থ যোগায়, মুক্তবাজারের সহায়ক পাঠ্যপুস্তক রচনায় অর্থ প্রদান করে। এরা তৃতীয় বিশ্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চালাতে নানাভাবে সহায়তা দেয়।[৫৪] কেননা অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের অন্যতম বস্তুগত ভিত্তি হচ্ছে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সুশীল সমাজের অতিজাতিকীকরণ। দেশে দেশে গণতন্ত্র প্রবর্তনের গবেষণার মাধ্যমে পশ্চিমা অর্থপুষ্ট সুশীল সমাজ মানুষের আচরণগত পরিবর্তন সাধনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। এর ফলে যেকোনো দেশে গণতন্ত্রের জন্য গণআন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মার্কিন হস্তক্ষেপ থাকে।

মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারী ও আধা সরকারী এজেন্সি ও ব্যুরোগুলোর নীতি নির্ধারণে ও অধ্যয়নে এবং নীতিনির্ধারক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মেলনে মার্কিন পরিকল্পনা ও নকশানুযায়ী ‘গণতন্ত্র প্রবর্তনের’ ধারণা সংযোজিত হয়। যে যুক্তরাষ্ট্র একসময়ে চিলি, নিকারাগুয়া, হাইতি, ফিলিপাইনস্, পানামা, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিভিন্ন জায়গায় একনায়কতন্ত্রকে সমর্থন জুগিয়েছে, সে-ই আজ গণতন্ত্র প্রবর্তনে ব্যস্ত। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই তাত্ত্বিক কাঠামোর অংশীদার হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনাগুলোতে ‘গণতন্ত্রায়ন’ এর ওপর রচিত প্রচারণামূলক সাহিত্যকর্মে ভরে যায় এবং ক্যাম্পাসগুলোতে ‘গণতন্ত্রায়ন’ এর ওপর কোর্সের সংখ্যা দ্রূচত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৫৫] এ ধরনের গবেষণা দেশে দেশে অসম শ্রেণী সম্পর্ক এবং বৈশ্বিক পরিসরে উত্তর-দক্ষিণের মধ্যকার নির্ভরশীলতার বৈষম্যমূলক শ্রেণী সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে একমাত্র বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত

করার ক্ষেত্রে এসব গবেষণা অগ্রদূত হিসেবে কাজ করে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে অতিজাতিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তাদের সৃষ্ট সুশীল সমাজের অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি শ্রেণী বা গ্রূপের আদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা জরুরী। এই আদর্শগত ভিত্তিই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতিতে কেন্দ্রস্থ দেশগুলোর কাঠামোগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। অতিজাতিক নিয়ন্ত্রণারোপের জন্য যে আধিপত্যের প্রয়োজন, তা আবার টিকে থাকছে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রক ও প্রান্তের অধীনস্থ উভয় গোষ্ঠীর আদর্শিকভাবে কর্পোরেটকরণের মধ্য দিয়ে। আদর্শগত এ হাতিয়ার ব্যবহার করেই আজকের দিনের আধিপত্যবাদী বৈশ্বিক সামাজিক কাঠামো গঠন করা গেছে। সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের যুগেই মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এ কাজটি সম্পন্ন হয়েছে।[৫৬]

পুঁজিবাদ তার সংকট উত্তরণের জন্য একচেটিয়াতন্ত্রের প্রবর্তন করে এবং বিশ্বময় বাজার দখলের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় ঘটায়। অর্থাৎ পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের প্রাথমিক কৌশল ছিল একচেটিয়াতন্ত্র ও ফিন্যান্স গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রবর্তন। এর সহযোগী উপাদান ছিল পুঁজি রপ্তানি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নতিসাধন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুঁজিবাদী বিশ্বায়নকে তার কৌশলগত পরিবর্তন আনতে হয়। কেননা তখন কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রবর্তন ব্যতীত তার পক্ষে সাম্যবাদের মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না। এ যুগে 'লগ্নি পুঁজির' দাপট বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সাফল্য 'অতি উৎপাদন' সৃষ্টি করে। এ অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত বাজার দখলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে বিশ্বায়ন এবার নতুন আঙ্গিকে তৃতীয় বিশ্বের বাজারে হানা দেয়। নানা প্রকার আত্মঘাতী চুক্তি চাপিয়ে পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন তার শোষণমূলক কাঠামো তৃতীয় বিশ্বকে মানতে বাধ্য করে। আশির দশকে সমাজতন্ত্র দুর্বল হয়ে আসলে পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন আবার তার পুরনো আধিপত্যবাদী নীতি গ্রহণ করে। বাজার মৌলবাদের দর্শন তখন থেকে বহুজাতিক কর্পোরেশনের স্বার্থ রক্ষার নতুন নগ্ন পন্থা অনুসরণ করে। এ কর্মে তার সহায়ক হয় বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। আজকের দিনে পুঁজি তাই লগ্নি হয়ে সবসময় ফেরত আসে না, অর্থনৈতিক সুবিধার্থে তা ফাটকা পুঁজিতে নিয়োজিত হয়। এভাবে যুগে যুগে পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন তার কৌশল পরিবর্তন করে নতুন ধরনের শোষণ কাঠামো তৈরি করছে আর যুগের পরিবর্তনে আবিষ্কার করছে নতুন নতুন শব্দ, যেমন 'মুক্ত বিশ্ব', 'মুক্ত

বাণিজ্য', 'গণতন্ত্র', 'আমদানি উদারিকরণ' প্রভৃতি। বাজার দখলের জন্য এসব শব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র

১) মইনুল ইসলাম, *পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ*, ঢাকা: সূচীপত্র, ২০০৬, পৃ. ৭৫, ৭৪।

২) David Harvey, æFrom Globlization to the New Imperialism", in Appelba and Robinson (eds), *Critical Globalization Studies*, New York : Routledge, 2005, p. 98.

৩) জন বেলামি ফস্টার, "সর্বাধিক পরিমাণে তেল উৎপাদন এবং ইন্ধন সাম্রাজ্যবাদ", অনু. ও সম্পা. ফারুক চৌধুরী, *বাজার ও বৈষম্য: মান্থলি রিভিয়ু প্রবন্ধ সংকলন*, ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৬৫।

৪) David Harvey, *New Imperialism*, Oxford: Oxford University Press, Paperback Edition, 2005, pp. 18-19.

৫) মাইকেল প্যারেন্টি, অনু. ওমর তারেক চৌধুরী, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ৪৭।

৬) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮।

৭) Duncan Kerr, æReclaiming Equality in a Globalised World", in Keith Horton and Haig Patapan, (eds.), *Globalisation and Equality*, London and New York : Routledge, 2006, p. 87.

৮) William I. Robinson quotes from James O'Conor's *The Fiscal Crisis of the State* (1973) in his *Promoting Polyarchy: Globalization, U.S. Intervention, and Hegemony*, 1998, p. 36.

৯) William I. Robinson, *Promoting Polyarchy: Globalization, U.S. Intervention, and Hegemony*, Great Britain: Athenaeum Press, 2nd ed., 1998, *Loc. cit.*

১০) মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ১৬৪ ।

১১) Thomas W. Pogge quotes from UNDP (United Nation's Development Programme)'s (1999, 3) Human Development Report 1999 in his æMoral Universalism and Global Economic Justice", in Keith Horton, and Haig Patapan (eds.), 2006, p. 56.

১২) Kai Nielsen, æGlobal Justice, Capitalism and the Third World", in Robin Attfield and Barry Wilkins (eds), *International Justice and the Third World*, London and New York: Routledge, 1992, p. 20.

১৩) *Ibid*, pp. 22-23.

১৪) *Ibid*, pp. 23-24.

১৫) *দৈনিক প্রথম আলো*, "স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থরক্ষায় সোচ্চার বাংলাদেশ", ২০১৩, ৬ ডিসেম্বর : ১৫ ।

১৬) Thomas W. Pogge, æMoral Universalism and Global Economic Justice", pp. 64-65.

১৭) *Ibid*, pp. 68-9.

১৮) Andrew Belsey, æWorld Poverty, Justice and Equality", in *International Justice and the Third World*, pp.36-7.

১৯) Andrew Belsey quotes from Robin Jenkins's *Exploitation*, 1971, pp. 42-3) in his æWorld Poverty, Justice and Equality", 1992, p. 37.

২০) Andrew Belsey quotes from Jon Bennett's *The Hunger Machine: The Politics of Food*, (1987, p. 13) in his æWorld Poverty, Justice and Equality", 1992, p. 37.

২১) Andrew Belsey quotes from Susan George's remark from Jon Benett's *The Hunger Machine: The Politics of Food*, (1987, p.1) in his æWorld Poverty, Justice and Equality", 1992, p. 37.

২২) William. I Robinson, *Promoting Polyarchy: Globalization, U.S. Intervention, and Hegemony*, pp. 4-5.

২৩) *Ibid*, p. 8.

২৪) মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ১৩৩-১৩৫।

২৫) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬-৩৭।

২৬) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬।

২৭) William I. Robinson, *Promoting Polyarchy: Globalization, U.S. Intervention, and Hegemony*, p. 19.

২৮) মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৯৩।

২৯) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮-৯।

৩০) Thomas W. Pogge, æMoral Universalism and Global Economic Justice", in *Globalisation & Equality*, pp. 67-8.

৩১) Garrett Cullity, æEquality and Globalization", in *Globalisation & Equality*, p. 12.

৩২) William I. Robinson, *Promoting Polyarchy: Globalization, U.S. Intervention, and Hegemony*, p. 80.

৩৩) মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৪৫।

৩৪) William I. Robinson, *Promoting Polyarchy: Globalization, U.S. Intervention, and Hegemony*, pp. 86-7.

৩৫) William I. Robinson quotes from Bernstein's æThe Holy Alliance" in his *Promoting Polyarcly: Globalization, US Intervention and Hegemony*, (1998, p. 322).

৩৬) *Ibid*, p. 322-3.

৩৭) *Ibid*, p. 325.

৩৮) মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৯০।

৩৯) Paul Ramsey, *The Just War: Force and Political Responsibility*, New York: Charles Seribner's Sons, 1968, p. 22-3.

৪০) *Ibid*, p. 27.

৪১) *Ibid*, pp. 27-8.

৪২) *Ibid*, pp. 28-30.

৪৩) মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ১৫৭।

৪৪) Giorel Curran, æEnvironment, equality and globalisation." in *Globalisation & Equality*, 2004, p. 147.

৪৫) Giorel Curran quotes from V Shiva's æEcological Balance in the Era of Globalization", in N. Low (ed.), *Global Ethics and Environment* in his æEnvironment, Equality and Globalization" (2004, p. 148).

৪৬) Giorel Curran, æEnvironment, Equality and Globalization", in *Globalisation and Equality*, pp. 148-9.

৪৭) Geoffrey Hunt quotes from Wilfred Beckerman's *In Defence of Economic Growth* (1974, pp. 18-20) in his æIs there a conflict between environmental protection and the development of the Third World?", in Robin Attfield and Barry Wilkins (eds.), *International Justice and the Third World*, 1992, (p. 122).

৪৮) Geoffrey Hunt, æIs there a conflict between environmental protection and the development of the Third World?", in *International Justice and the Third World*, pp. 122-3.

৪৯) Henry Shue, æLegacy of Danger : The Kyoto protocol and Future Generations", in *Globalisation and Equality*, p. 175.

৫০) আকমল হোসেন, মো. নাসের, আসাদউল্লাহ খান, গীতি আরা নাসরীন, ও অন্যান্য, "সুন্দরবনকে বাঁচতে দিন?", *সাপ্তাহিক একতা*, ২০১৩, ২৯ সেপ্টেম্বর, ০৬।

৫১) মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ১১১।

৫২) ফারুক ওয়াসিফ, "মাইনরিটি রিপোর্ট নাফিস কাহিনী", available from www. facebook.com/faruk.wasif?fref=ts. [Accessed 2012]

৫৩) ফারুক ওয়াসিফ, "বর্ণবাদী বাংলাদেশ???", available from www.facebook.com/faruk.wasif?fref=ts. [Accessed 2013]

৫৪) মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৬৭।

৫৫) William I. Robinson, *Promoting Polyarcly: Globalization, US Intervention and Hegemony*, p. 16.

৫৬) *Ibid*, p. 30-1.

পঞ্চম অধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নৈতিকতা

সভ্যতার উষালগ্নে যে শ্রেণীশোষণের* জন্ম, তাকে টিকিয়ে রাখতে তৈরি হয়েছিল আইন এবং সরকারি সশস্ত্র ক্ষমতা। সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে আজকের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোও গড়ে তুলেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সেইসঙ্গে বিধি-বিধান যা সুকৌশলে অন্যায়কে দিচ্ছে আইনি বৈধতা। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নিজেদের আর্থিক ও মতাদর্শগত স্বার্থ সংরক্ষণের আশায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো সামাজিক ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার শ্লোগান প্রচার করে থাকে। প্রধানত বহুজাতিক সংস্থার বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর অবাধ কার্যক্রম নিশ্চিত, মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ, আফ্রিকার খনিজ সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো দমন-নিপীড়নের আশ্রয় নেয়। এসব কাজে সবসময়ই রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদান করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সাম্রাজ্যবাদের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে এক আত্মস্বার্থবাদী চেতনা যাতে নির্বিচারে উপেক্ষিত হয় সাধারণ মানুষের দাবি, অধিকার ও স্বাধীনতা। বুর্জোয়া সমাজ শোষণকে বৈধতা দিয়েছে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে। এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স ইউনিভার্সিটি অব টেকনলজি'র ভাষাতত্ত্ব ও দর্শন বিভাগের অধ্যাপক নোয়াম চমস্কি সাম্রাজ্যবাদের মধ্যমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেন: "অবাধ নির্বাচন, প্রেস ফ্রিডম, সমবিচার, সুবিধার সাম্য–এসব দিয়ে আমেরিকা গণন্ত্রের ফাঁদ পেতেছে, যা কি না একটি বাতাস চুপসানো ফুটবলের মতো রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের হাতে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু আইনসভায় জনগণের মতামত উপেক্ষিত হচ্ছে।"[১] অন্যত্র তিনি মন্তব্য করেন, 'আমেরিকা অন্য দেশে গণতন্ত্র উন্নয়নের যে কথা বলে তা বিশুদ্ধ ধাপ্পা [পিওর ফ্রড]। কারণ সে নিজেই ব্যর্থ রাষ্ট্রের চেয়ে বেশী ও তার নিজের সংজ্ঞামতেই সে এক সন্ত্রাসী রাষ্ট্র।[২] একারণেই ভেনিজুয়েলার

---

* মার্কস ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে দেখিয়েছেন, রাষ্ট্রস্থিত প্রতিটি শোষণমূলক সমাজই (দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ) শোষক শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয়। তিনি রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে দু'ভাগে ভাগ করে শোষণের দ্বিবিধ চরিত্র নিরূপণ করেন। মার্কস মনে করেন, একটি শোষণমূলক রাষ্ট্রের অন্তস্থ কাজ হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের ওপর গুটিকয়েক শোষক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের অধীনস্থ করে রাখা। আর শোষণমূলক রাষ্ট্রের বহিস্থ কাজ হচ্ছে আক্রমণের মাধ্যমে বিদেশি ভূ-খণ্ড দখল করা। সাম্প্রতিককালে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি তার নিজ দেশে প্রতিষ্ঠিত শোষণমূলক কাঠামোর সম্প্রসারণমাত্র। সুতরাং, সব যুগেই শ্রেণীশোষণ ছিল শোষণমূলক রাষ্ট্রের মূলভিত্তি।

সাবেক প্রেসিডেন্ট হুগো চাভেজ ২০০৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, চমস্কির *হেজেমনি অর সারভাইভাল* বইটি পড়ুন, তাহলে বুঝতে পারবেন আমেরিকা কেন বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি।[৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নেতৃত্ব নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা অজুহাতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। এ প্রসঙ্গে প্রুশিয়ান সামরিক তাত্ত্বিক কার্ল ভন ক্লজউইজের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, যুদ্ধ হচ্ছে রাজনৈতিক বিস্তৃতির ভিন্ন একটি পন্থা। মার্কিন নীতিপ্রণেতারা নানাবিধ বহুপাক্ষিক কূটনীতির মাধ্যমে বহির্বিশ্বে তাদের রাজনৈতিক কর্মনীতির বাস্তবায়ন ঘটায়। বলাই বাহুল্য, এ ধরনের কূটনীতি নিতান্তই বলপূর্বক। কেননা এ ধরনের কূটনীতিতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সামরিক শক্তি ব্যবহার করা হয়। এ কাজে তারা বিদেশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা শক্তিকে কাজে লাগায়। যেমন, লিবিয়ায় জঙ্গি গ্রুপগুলোকে ব্যবহার করে তারা সরকারের পতন ঘটাতে সমর্থ হয়। অপরদিকে, তৃতীয় বিশ্বের মুৎসুদ্দি শাসকগোষ্ঠী পরিচালিত রাজনৈতিক দলগুলো সবসময়ই তাদের সহযোগিতা পেয়ে থাকে। সাধারণত মার্কিনিদের রাজনৈতিক ক্রিয়া-পদ্ধতি অত্যন্ত বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি সাধারণ কাঠামোর মধ্য দিয়ে কিছু কিছু বিশেষ কর্মসূচি, নীতিমালা বা কার্য-কলাপের মাধ্যমে তারা এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে থাকে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নানা দেশে বিদ্রোহী তৎপরতা বা অভ্যুত্থানে সহায়তা দেয়া, শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা, প্রভাববিস্তারকারী কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং মিথ্যা প্রচারণা চালানো। এসব কার্যকলাপকে আমরা 'লুকায়িত রাজনৈতিক সমর' (Covert Political Warfare) বলে অভিহিত করতে পারি। একারণে বহির্বিশ্বে তাদের সামরিক তৎপরতা ও সামরিক সাহায্য প্রদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। প্রতিবছরই তাদের সামরিক ঘাঁটির সংখ্যা বৃদ্ধিসহ সমরাস্ত্র বিস্তার, সমরযান বাড়ানো ও দখলকৃত ভূ-খণ্ডের পরিধি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে পেন্টাগনের দখলে রয়েছে এমন বিপুলায়তন ভূ-খণ্ড যা বিশ্বের বহু দেশের সম্মিলিত আয়তনের চেয়েও বেশি। এসব বাহ্যিক কার্যকলাপ ছাড়াও রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধনীতি যার মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিত যোগসূত্র গড়ে তোলা হয়। নানা ধরনের রাজনৈতিক, সামরিক ও মতাদর্শগত কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তাদের পছন্দমতো আচরণ, আবেগ ও দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে যা তাদের জাতীয় উদ্দেশ্য পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখে।[৪]

শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের গুটিকয়েক সুবিধাভোগী মানুষের ক্ষমতার লিপ্সা বাস্তবায়নে এতসব সুপরিকল্পিত, ব্যয়বহুল ও গণবিধ্বংসী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। রাজনৈতিক বাস্তববাদীরা এ ধরনের ক্ষমতার রাজনীতিকে 'অন্তর্নিহিতভাবে অনৈতিক' বলে অভিহিত করেছেন। কেননা সরকারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানবীয় উদ্দেশ্যসাধন করা, এর পরিবর্তে যদি সে ক্ষমতার বৃত্তকে মজবুত করতে সচেষ্ট হয়, তাহলে তার কার্যক্রমকে অবশ্যই 'স্বার্থপর' ও 'অনৈতিক' বলতে হবে। বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সবসময় বিশ্বব্যাপী তার ক্ষমতা বিস্তারের জন্য অনুকূল পরিবেশ খোঁজে। বিদেশে অর্থনৈতিক, জৈবিক ও অন্যান্য নানা উপায়ে নিজ ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তার রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি তৈরি করে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের এই রাজনৈতিক কার্যক্রম বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। তাদের এই কর্মনীতি উপযোগবাদী মূলনীতি 'সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখ'–এর পরিপন্থী। বস্তুত, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি তার অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণমাত্র। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন ৩১৩.৯ মিলিয়ন মার্কিনির ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়িয়েছে অল্প কিছুসংখ্যক এলিট শ্রেণী। এদের কারণে আজ মার্কিন রাষ্ট্রব্যবস্থা বিপর্যস্ত হতে চলেছে। সামাজিক খাতগুলো সংকুচিত করে জনগণের সুযোগ-সুবিধা বিসর্জন দিয়ে সামরিক বরাদ্দ বাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী তাদের বৃহৎ কর্পোরেশনগুলোর বাজার বৃদ্ধিই মার্কিন নীতির মূলভিত্তি ও চালিকাশক্তি। এতে মানুষের ঊর্ধ্বে মুনাফা, ব্যক্তিমর্যাদার ঊর্ধ্বে পণ্য ও বাজার, মানবপ্রাণের তুলনায় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে বড় করে দেখা হয়। সুতরাং, এখানে মনুষ্যত্বের 'স্বকীয় মূল্য'কে উপেক্ষা করে নৈতিকতার চিরন্তন মূল্যবোধকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। মার্কিনীদের পরিচালিত বিভিন্ন যুদ্ধে সংঘটিত ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা এ বাস্তবতারই স্বাক্ষর বহন করে।

বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল মার্কিন সামরিক তৎপরতার সঙ্গে ক্ষমতা ও অর্থনীতির সম্পর্ক নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছিলেন, "...সারা বিশ্বের ৬০ ভাগ সম্পদের উপর মার্কিন পুঁজিবাদের দখল ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য আমাদের এই পুরো গ্রহজুড়ে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে ৩,৩০০টি সামরিক ঘাঁটি, বিশাল নৌবহর, মিসাইল, নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র। প্রতি ঘন্টায় এর জন্য ব্যয় করা হচ্ছে ১৬ মিলিয়ন ডলার।"[৫] রাসেল বিভিন্ন খাতে মার্কিন সামরিক ব্যয়ের একটি হিসাব তুলে ধরে দেখান, এ পরিমাণ অর্থে কি কি জনকল্যাণমূলক কাজ করা যায়। অবশেষে রাসেল আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, "..... যেখানে

ক্ষুধা, যেখানে নিপীড়নমূলক শাসন, যেখানে জনগণ নির্যাতিত হচ্ছে, যেখানে অনাহারে অসুস্থতায় মানুষ মারা যাচ্ছে সেখানেই ওয়াশিংটনের যোগ পাওয়া যাবে।... মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ভালো হবার অনুরোধ জানিয়ে কোনো লাভ নেই।...."[৬] এভাবে রাসেল সামরিক তৎপরতার সঙ্গে শোষণের ওতপ্রোত সংযোগের বিষয়টি সুস্পষ্ট করে তোলেন।

অন্যায় যুদ্ধ, হত্যা ও নির্যাতন

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি যেভাবে গঠিত, তার যে কাঠামো, এর মধ্যে যেসব উপাদান সবচেয়ে গতিশীল, এসব মিলিয়ে মর্মবস্তুর দিক থেকে তা যুদ্ধমুখী। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যুদ্ধ, যুদ্ধপ্রস্তুতি বা সমরাস্ত্র খাতের অব্যাহত বিকাশ বর্তমান বিশ্ব পুঁজিবাদের কেন্দ্র এই অর্থনীতির জৈবিক অঙ্গ। প্রতিটি প্রশাসন তাই যুদ্ধবাজ, যেটি ' দেশপ্রেম', 'মুক্ত দুনিয়া', 'নিরাপত্তা', 'মানবাধিকার' ইত্যাদি নামে সক্রিয় হয় এবং সন্ত্রাস, হত্যাকাণ্ডসহ সবকিছুকেই প্রকাশ করে এসব কথার মোড়কে।[৭] আর এসব অন্যায় যুদ্ধের[*] পরিণাম হচ্ছেঃ পরিবেশ বিপর্যয়, রোগ-ব্যাধি, অপুষ্টি, দারিদ্র ও মৃত্যু। সিএনএন'এর ১৯৯৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রায় ৩,০০,০০০ ইরাকি শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। বার্ষিক মৃত্যুর হার স্বাভাবিক হারের চেয়ে ১,২৫,০০০ অতিরিক্ত মানুষ প্রতিবছর মারা যাচ্ছেন; সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন 'দরিদ্ররা, তাদের শিশু ও ছেলে-মেয়েরা, দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ও বয়স্করা।' আর এসব ঘটনার নেপথ্যে কাজ করে উপসাগরীয় যুদ্ধ পরবর্তী প্রতিহিংসাপরয়ণ জাতিসংঘ আরোপিত নিষেধাজ্ঞা যা ইরাককে খাদ্য উৎপাদন, চিকিৎসাব্যবস্থা এবং পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা পুন:নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত উপকরণাদি থেকে বঞ্চিত রেখেছিল।[৮] এ ছাড়া উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত কম্পিউটারসজ্জিত অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী ক্ষেপণাস্ত্র, শক্তিশালী বিস্ফোরক ভরা অপারমাণবিক বোমা, শক্তিশালী হেলিকপ্টার গানশীপ, তেজস্ক্রিয় পারমাণবিক বর্জ্য দিয়ে তৈরি বুলেট, ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি কুয়েত ও ইরাকের মাটি ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ইউরেনিয়ামে দূষিত করেছে, যার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্যান্সার দেখা দিয়েছিল।[৯]

---

[*] সাধারণভাবে অন্যায্য কোনো উদ্দেশ্যসাধনে (সম্পদ ও ক্ষমতা দখল, ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার) যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা ও নির্যাতন করে যার পরিসমাপ্তি ঘটে তাকে অন্যায় যুদ্ধ বলে। লেনিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে অন্যায় যুদ্ধ বলে অভিহিত করেন। কারণ সম্পদ ও ভূ-খণ্ড দখল এবং আর্থ-রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মাইকেল টি ক্ল্যায়ার[১০৩*১] লিখেছেন, ইরাকের তেলসম্পদ দখল করতে ৭০ বছর ধরে মরিয়া হয়ে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তেলের জন্য ১৯৪৫ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট পারস্য উপসাগরে প্রথম ঘাঁটি করার চিন্তা করেন। ১৯৮০ সালে জিমি কার্টারের কাছেও পারস্য উপসাগরের তেল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। ১৯৯০ সালে এই তেলের জন্য প্রেসিডেন্ট সিনিয়র জর্জ বুশ উপসাগরীয় যুদ্ধই লাগিয়ে দেন। বাবার সেই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে ইরাক দখলে নিয়ে যুদ্ধ করেছেন প্রেসিডেন্ট জুনিয়র বুশও। মূল উদ্দেশ্য সেই তেলসম্পদ। তার মানে তেলের জন্য ইরাক, ইরাকের জন্য তেল। অ্যালান গ্রিনস্প্যান[১১৩*২]জানিয়েছেন, মূলত তেলের জন্যই ইরাক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র। গ্রিনস্প্যান আরও বলেন, ক্ষমতার মোহে রিপাবলিকানরা নীতি বিসর্জন দিয়েছে।

সুতরাং, এসব তথ্য থেকে একথাই প্রমাণিত হয় তেলের জন্য সংঘটিত ইরাক যুদ্ধ পুরোপুরি একটি অন্যায় যুদ্ধ। কারণ একটি যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত হতে হলে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ করা প্রয়োজন–

প্রথমত, শান্তিপূর্ণ সকল পথ রুদ্ধ হলে শেষ উপায় হিসেবে যুদ্ধ বিবেচিত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ন্যায়যুদ্ধে নিরীহ জনগণকে আক্রান্ত করা হয় না।

তৃতীয়ত, ন্যায়যুদ্ধে বিরোধীপক্ষের ওপর প্রয়োজনাতিরিক্ত আক্রমণ সংঘটনের প্রবণতা থাকে না।

চতুর্থত, ন্যায়যুদ্ধে আক্রমণকারী দেশকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক সংগঠনের অনুমতি নেয়া বাঞ্ছনীয়।

পঞ্চমত, যুদ্ধ তখনই ন্যায়সঙ্গত হয় যখন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কোনো অঞ্চলে আগের চেয়ে ব্যাপক শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ষষ্ঠত,স্বাধীনতা বা জাতীয় মুক্তির জন্য যুদ্ধ হলে তাকে ন্যায়যুদ্ধ বলা হয়।

ইরাক যুদ্ধ উপর্যুক্ত শর্তসমূহের প্রত্যেকটিই পূরণ করতে অক্ষম। প্রথমত, কোনো প্রমাণিত তথ্য ছাড়াই গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ধুয়ো তুলে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং আজবধি এ অস্ত্রের সন্ধান মেলেনি। দ্বিতীয়ত, মধ্যপ্রচ্যে কর্মরত বৃটিশ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক তাঁর কলামে উল্লেখ করেছেন, ২০০৩ সালের

---

*১ মাইকেল. টি. ক্ল্যায়ার হাম্পশায়ার কলেজের শান্তি ও বিশ্বনিরাপত্তা বিভাগের অধ্যাপক। ইরাক যুদ্ধের পর তিনি *Blood and oil: The dangers and consequence of America's Growing* গ্রন্থটি রচনা করেন।

*২ এ্যালান গ্রিনস্প্যান যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক অর্থমন্ত্রী ও বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ। তিনি ইরাক যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে *The Age of Turbulence: Adventures in a New World* গ্রন্থটি রচনা করেন।

ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের পরবর্তী চার বছরে দেশটিতে গড়ে ছয় লাখ নাগরিক নিহত হয়েছে।[১২] অপরপক্ষে, নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বেসামরিক ইরাকিদের হত্যার ঘটনায় মার্কিন বেসরকারী নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান ব্ল্যাকওয়াটার জড়িত, এর সপক্ষে তারা বেশকিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন।[১৩] তৃতীয় শর্তটি যুক্তির বিচারে পূরণ হয় না এ কারণে যে, ইরাক যুদ্ধ যদি গণবিধ্বংসী অস্ত্রের জন্য সংঘটিত হতো, তবে শুধুমাত্র সম্ভাব্য অস্ত্রের স্থাপনা ব্যতীত অন্য কোথাও আক্রমণ করা হতো না, ফলে বারো লাখ ইরাকিকেও প্রাণ দিতে হতো না। অন্যথায়, শুধুমাত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই যদি এ যুদ্ধের কারণ হতো, তবে সাদ্দাম হোসেনের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটত। চতুর্থত, জাতিসংঘের অনুমোদন ছাড়াই এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সবশেষ শর্তের প্রত্যুত্তরে বলা যায়, ২০ জুন বিশ্ব শরণার্থী দিবসে ইউএনএইচসিআর প্রকাশিত '২০০৬ গ্লোবাল ট্রেন্ডস' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছর শরণার্থীর সংখ্যা ১৪ শতাংশ বেড়েছে, যা ২০০২ সালের পর সর্বোচ্চ। এজন্য তারা ইরাকের সংঘাতময় পরিস্থিতিকে দায়ী করেন।[১৪] রবার্ট ফিস্কের কলাম থেকে জানা যায়, সিরিয়া প্রায় ১৫ লাখ ইরাকি শরণার্থীকে আশ্রয় দিতে রাজি রয়েছে। ... অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র আশ্রয় দিতে রাজী হয়েছে মাত্র ৮০০ ইরাকিকে।[১৫] এ তথ্য থেকেই বোঝা যায়, লাখ লাখ ইরাকী জনগণ যারা যুদ্ধের পূর্বে নিজ গৃহে শান্তিতে বাস করত যুদ্ধের পর তারা হয়ে পড়েছে নিরাশ্রয় ও বাস্তুহারা। এছাড়া রেডক্রস যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বাহিনী ইরাক দখলের চার বছর পর 'সিভিলিয়ানস উইদাউট প্রোটেকশন: দ্য এভার ওরসেনিং হিউম্যানিটারিয়ান ক্রাইসিস ইন ইরাক' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাতে উল্লেখিত হয়েছে: ইরাকে সব মানুষের জীবনই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বাজারে গেলেও প্রাণ হাতে নিয়ে যেতে হয়। হাসপাতালগুলোয় চিকিৎসক, সেবিকা ও কর্মী সংকট চরমে। হত্যার হুমকি ও চিহ্নিত হওয়ার ভয়ে অনেক চিকিৎসক, সেবিকা ও রোগী হাসপাতালে যান না। পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পয়:নিষ্কাশন ও বৈদ্যুতিক অবকাঠামোর অবস্থা একেবারেই শোচনীয়। অনেক এলাকায় চরম খাদ্য সংকট চলছে এবং মানুষ অপুষ্টির শিকার হচ্ছে।[১৬]

একটি অন্যায় যুদ্ধের ফলস্বরূপ এ সীমাহীন মানবিক বিপর্যয়কে কোনোক্রমেই নৈতিক বলা যায় না। সব মানুষের জীবন যখন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে তখন 'সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখ'- উপযোগবাদী এ নীতিবাক্যটি হয়ে পড়ে অসার। অপরদিকে, ইমানুয়েল কান্ট নৈতিক আইন বা শর্তহীন আদেশ বলতে বুঝেছিলেন সে আদেশকে যা প্রতিটি বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তা নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে।

একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, কোনো বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তাই নিজের জন্য দুর্বিষহ একটি জীবন বেছে নেবে না।

মানবাধিকারের মধ্যে সর্বাধিক অগ্রগণ্য হচ্ছে বেঁচে থাকার অধিকার। অন্যান্য সব অধিকারের মতো বেঁচে থাকার অধিকারেও একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা কাজ করে আর তা হলো: নিজের জীবনের মত অপরের জীবনকেও সমানভাবে পবিত্র মনে করা। কেউ যদি অপরকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে এই নৈতিক বাধ্যবাধকতাটিকে লংঘন করে তবে শাস্তি বা পরিণাম হিসেবে সেও তার জীবনের অধিকার ত্যাগ করতে বাধ্য এবং আইনসঙ্গতভাবে এ বঞ্চনা তার প্রাপ্য।[১৭] সুতরাং, অন্যায় যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আপামর জনতার জীবন বিপন্ন করা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

অন্যায় যুদ্ধের আরেকটি নেতিবাচক দিক হচ্ছে মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়া। ইমানুয়েল কান্ট[১৮ও*১] ও জন স্টুয়াট মিল[১৯ও*২] উভয়ের নীতি দর্শনেই মানুষের উচ্চতর মর্যাদার স্বীকৃতি রয়েছে। কান্ট যে তিনটি সর্বজনীন নৈতিক সূত্র প্রদান করেন তন্মধ্যে দ্বিতীয় সূত্রটির মর্মার্থ ছিল মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদা। কান্টের ভাষায় : "এমনভাবে কাজ করো তা তোমার নিজের ক্ষেত্রেই হোক আর অন্য কারো ক্ষেত্রেই হোক–যেন মানুষ্যত্বকে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়, শুধু উপায় হিসেবে কখনোই নয়"।[২০] এ সূত্রের সাহায্যে কান্ট স্পষ্টতই বোঝাতে চাচ্ছেন, নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনো মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বা প্রাণহানি ঘটানো প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্বেরই অবমাননা। কারণ উদ্দেশ্য রাজ্যের সদস্য হিসেবে মানুষের রয়েছে স্বকীয় মূল্য যা তাকে অপরাপর প্রাণী থেকে পৃথক করে এবং বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী হিসেবে তার আত্মমর্যাদাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। এক্ষেত্রে তেল সম্পদ

---

*১ ইমানুয়েল কান্ট ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক। জ্ঞানতত্ত্বে এক ধরনের সমন্বয়বাদী চিন্তা-ভাবনা থেকে তিনি বিচারবাদ নামক তত্ত্বের ধারণা প্রদান করেন। নৈতিকতার ক্ষেত্রে কান্টের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে এক্ষেত্রে তিনি কিছু সাধারণ সূত্রের অবতারণা করেন। তাঁর বিখ্যাত কিছু নীতিবিদ্যক গ্রন্থ হচ্ছে *Fundamental Principles of Metaphysics of Morals* (1985), *Critique of Practical Reason* (1788), *The Metaphysics of Morals* (1797), *Lectures on Ethics* (1930).

*২ ঊনিশ শতকের প্রখ্যাত ব্রিটিশ চিন্তাবিদ ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। তিনি তাঁর পূর্বসূরী জেরেমি বেন্থাম ও জেমস মিলের সুখবাদী তত্ত্বকে যৌক্তিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তাঁর নৈতিক মতবাদকে 'উপযোগবাদ' নাম দেন।

আত্মসাতের উদ্দেশ্যে সংঘটিত যুদ্ধে সীমাহীন প্রাণক্ষয় এবং মানবিক পরিস্থিতি নিদারুন সংকটাপন্ন করে তোলাকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদাকে অবদমিত করার চূড়ান্ত প্রয়াস বললেও অত্যুক্তি হবে না ।

অন্যায় যুদ্ধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যে দুটি সাধারণ প্রত্যয় জড়িত তা হচ্ছে 'হত্যা' ও 'নির্যাতন'। বিভিন্ন হিসেবে দেখা যায়, ১৯৯১ সালের পর মার্কিনীদের পরিচালিত যুদ্ধ, আগ্রাসন ও অবরোধের কারণে পরবর্তী এক দশকে ইরাকে প্রায় ১৫ লক্ষ ইরাকি মারা গেছেন যার মধ্যে ৫ লাখ ৬০ হাজার ৫ বছরের নিচের শিশু।[২১] ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বহু বছর ধরে সংঘটিত বিপুল হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে প্যালেস্টাইন ক্রনিকেল পত্রিকার সম্পাদক ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত মার্কিন লেখক রামজি বারুদ মন্তব্য করেন: "ইরাকে গণহত্যাতুল্য যুদ্ধ, আফগানিস্তানে অনেক অপ্রকাশিত হত্যাকাণ্ড এবং ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের নৃশংস দখলদারির প্রতি অন্ধ সমর্থন ও অর্থায়ন সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদে ব্যাপকভাবে ইন্ধন জুগিয়েছে এবং এজন্য যুক্তরাষ্ট্রকে তার তথাকথিত 'মনপ্রাণ' জয় করার যুদ্ধে মূল্য দিতে হচ্ছে। স্পষ্ট সত্য হলো, এ ধরনের যুদ্ধে কখনো জয়ী হওয়া যায় না, যে যুদ্ধ প্রায় ১০ লাখ ইরাকিকে হত্যা করেছে এবং ৪০ লাখ ইরাকিকে তাদের নিজ দেশে করেছে গৃহহারা। যখন ইসরায়েল প্রতিদিন গাজা ও পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের হত্যা করেছে "নৈমিত্তিক" ভিত্তিতে, অথবা যখন দরিদ্র আফগান চাষীরা প্রতিনিয়ত বিন লাদেনের 'সন্ধানে' চালানো হামলায় প্রাণ হারাচ্ছে, তখন কারও মনপ্রাণই জয় করা যায় না।"[২২]

সাম্রাজ্যবাদীদের পরোক্ষ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় বহুজাতিক কোম্পানির পণ্যের মাধ্যমে। বহু বছর ধরে ওষুধ কোম্পানিগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ উদ্ভিদনাশক, কীটনাশক ও অন্যান্য ক্ষতিকর ওষুধ তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিক্রি করে আসছে। এ ধরনের ওষুধ বিক্রির সময় এগুলো যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ, তা ক্রেতা দেশকে জানানো রপ্তানিকারকদের জন্য বাধ্যতামূলক করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কার্টারের দেয়া নির্বাহী আদেশটি ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট রেগান বাতিল করে দেন। এতে বিষাক্ত রাসায়নিকের রপ্তানি বাজার নিশ্চিত হবার ফলে এসব উৎপাদন স্থায়ী হয় এবং শ্রমিকরা বিষে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অপরদিকে, তৃতীয় বিশ্ব থেকে আমদানিকৃত খাদ্য সামগ্রীর সঙ্গে এসব বিষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও স্থানান্তরিত হচ্ছে। আবার এসব খাদ্যদ্রব্য তৃতীয় বিশ্বের মানুষদেরও আক্রান্ত করে সেখানে তৈরি করছে ব্যাধি ও মৃত্যুর নিরবচ্ছিন্ন ধারা, যা চলছে বংশ পরম্পরায়।[২৩] সাম্প্রতিককালে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ কোম্পানি ফাইজার নাইজেরিয়ার কানো প্রদেশের শিশুদের ওপর কোনো অনুমতি ছাড়াই ' ট্রোভান ফ্লক্সসিন' নামে অপরীক্ষিত একটি ওষুধ প্রয়োগ করে, যার ফলস্বরূপ দু'শো শিশু মারা গেছে, দু'শ শিশু মেনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হয় ও বাকিরা নানা সমস্যায় ভুগছে।[২৪]

সমকালীন নীতিবিদ পিটার সিঙ্গার* হত্যার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে গিয়ে মন্তব্য করেন: "অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে হত্যা সর্বদাই অন্যায়। কারণ সচেতন হোক আর নাই হোক জীবনের নিজস্ব মূল্য আছে।"[২৫] সিঙ্গার আরও উল্লেখ করেন, ব্যক্তি জীবনের স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকার করার ক্ষেত্রে চারটি সম্ভাব্য যুক্তি রয়েছে। ১ম যুক্তি অনুসারে, নিহত ব্যক্তির প্রতি অন্যায় করা হয়েছে বলে হত্যা করাকে অন্যায় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কারণ হত্যা নিহত ব্যক্তিকে তার ভবিষ্যৎ সুখ থেকে বঞ্চিত করে। সত্তাটির ব্যক্তি হওয়া না হওয়া নির্বিশেষে ভবিষ্যৎ সুখী জীবনসম্পন্ন যেকোনো সত্তার ক্ষেত্রে হত্যার বিরুদ্ধে এই আপত্তিটি প্রযোজ্য হবে।[২৬] ২য় যুক্তি অনুযায়ী, যদি একটি কাজ কোনো সত্তার অগ্রাধিকারের বিপরীত হয় এবং যদি না এই অগ্রাধিকারটি বিপরীত অগ্রাধিকার দ্বারা বাতিল হয়, তাহলে কাজটি অন্যায়। সুতরাং, অন্যান্য অবস্থা পরিবর্তিত থাকলে যদি একজন ব্যক্তি বেঁচে থাকার অধিকারকে অগ্রাধিকার প্রদান করে, তাহলে তাকে হত্যা করা অন্যায়।[২৭] ৩য় যুক্তিটি হলো, জীবনের প্রতি অধিকারের অর্থ যদি হয় একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে জীবনধারণের অধিকার, তাহলে জীবনের প্রতি অধিকার থাকার প্রাসঙ্গিক কামনাটির অর্থ হয় একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে জীবনধারণের কামনা। কিন্তু যে সত্তাটি কালের ঊর্ধ্বে নিজেকে স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে চিন্তা করতে পারে শুধু সে সত্তারই এই কামনা থাকতে পারে। অর্থাৎ, শুধু ব্যক্তিই এই ধরনের চিন্তা করতে পারে বলে ব্যক্তিরই এই কামনা থাকতে পারে। সুতরাং শুধু একজন ব্যক্তিরই জীবনের প্রতি অধিকার থাকতে পারে।[২৮] সবশেষ যুক্তিতে বলা হয়, স্বনিয়ন্ত্রণের জন্য শ্রদ্ধা একটি মৌলিক নৈতিক নীতি। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন এবং আত্মসচেতন সত্তারই এ ক্ষমতাটি আছে। বিশেষ করে যে সত্তাটি মৃত্যুবরণ করা এবং জীবনধারণ করার বিষয়টি নির্বাচন করতে পারে। সুতরাং, মৃত্যু মনোনয়ন করে না এমন কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার অর্থই হচ্ছে ঐ ব্যক্তির স্বনিয়ন্ত্রণের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে ব্যর্থ হওয়া।[২৯]

---

* সমকালীন অস্ট্রেলীয় নীতিদার্শনিক পিটার সিঙ্গার তাঁর *Practical Ethics* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'হত্যা কিভাবে অন্যায়' তা বিশদভাবে আলোচনা করেন।

উপর্যুক্ত সকল যুক্তির নিরীখেই সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃক সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডকেই অনৈতিক বলে প্রমাণ করা যায়। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়ও বিবেচনায় আনা যেতে পারে। পিটার সিঙ্গার মানবেতর প্রাণীর ওপর পরিচালিত যেকোনো পরীক্ষণেরও বিরুদ্ধাচারণ করেছেন ও একে অনৈতিক বলে গণ্য করেছেন। সেখানে নাইজেরিয়ায় সংঘটিত মানবশিশু হত্যার ঘটনাটি চূড়ান্ত ন্যক্কারজনক বলা চলে। অপরদিকে, শুধুমাত্র মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে অগণিত মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়ার বিষয়টিকেও চূড়ান্ত মানবিক বিপর্যয় বলা চলে। কেননা এক্ষেত্রে মানুষকে কেবল মুনাফালাভের 'উপায়' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে যা তার মানবিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ হত্যা একটি জঘন্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু, এ অপরাধকে অগ্রাহ্য করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আজও চালিয়ে যাচ্ছে তার বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞ। সম্প্রতি 'ইহুদী মৌলবাদে'র পৃষ্ঠপোষক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ছায়াতলে থাকা ইসরাইল প্যালেস্টাইনের গাজায় আশ্রয়কেন্দ্র ও স্কুলসহ সর্বত্র চালিয়েছে তার নৃশংস হত্যাযজ্ঞ যার প্রথম ১১ দিনেই নিহত হয়েছে ৭০০রও বেশী নিরীহ ফিলিস্তিনী নাগরিক। এক মাসের অভিযানে নিহত ২ সহস্রাধিকের অধিক মানুষের ৭০ শতাংশই ছিল বেসামরিক বলে জাতিসংঘ জানিয়েছে। এ হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে জাতিসংঘে প্রদত্ত ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবিতে আনীত প্রস্তাবের বিপক্ষে প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র অবস্থান গ্রহণ করে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, হত্যাকাণ্ড সংঘটন, হত্যাকাণ্ডে মদদ প্রদান ও নির্লজ্জভাবে হত্যাকাণ্ডকে সমর্থনদান সাম্রাজ্যবাদী শোষণের একটি অবিচ্ছেদ্য দিক।

এসব হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি নির্যাতনেও পিছিয়ে নেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তারা আবিষ্কার করে চলেছে নির্যাতনের নিত্য-নতুন আধুনিক পদ্ধতি। সিআইএ'র সাবেক পরিচালক পোর্টার জে. গস ২০০৫ সালে বলেছিলেন, তাদের লোকজন বন্দীদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য একটি ' পেশাদার জিজ্ঞাসাবাদ কৌশল' ব্যবহার করে থাকে[৩০] যার নাম দেয়া হয়েছে 'ওয়াটার বোর্ড'। নির্যাতনের এ কৌশলটিতে বন্দীর হাত দুটো পেছনে বেঁধে তাকে একটা তক্তায় শোয়ানো হয়। তার মুখে কিছু গুজে বা টেপ সেটে দিয়ে কাপড় বা তোয়ালের সাহায্যে মাথাটা বেঁধে ফেলা হয়। এরপর অঝোর ধারায় তার মাথায় পানি ঢালা হয়। বন্দীকে তক্তায় নড়তে দেয়া হয় না এবং তার মাথাটা নিচু করে রাখা হয়। এ অবস্থায় বন্দী অনুভব করে সে ডুবে মারা যাচ্ছে এবং নি:শ্বাস নিলে পানি ঢুকে যায়। তাই বাধ্য হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

তাকে পানি গিলতে হয়; গেলার সময় আবার দম বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। ফলে ভয়ে সে মুখে কোনো শব্দও করতে পারে না। এ পদ্ধতির নির্যাতনের একটি বড় সুবিধা হলো এতে শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন থাকে না। তবে এর সুদূরপ্রসারী মানসিক প্রভাব পড়ে। অন্যদিকে, পানি ঢুকে ফুসফুস নষ্ট, অক্সিজেনের অভাবে মস্তিষ্কের ক্ষতি, রেহাই পাওয়ার চেষ্টায় হাড় ভাঙার মতো ঘটনা – এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

মার্কিন তথ্য মাধ্যমে সিআইএ'র চালানো নির্যাতনের আরও কয়েকটি বর্তমান পদ্ধতি সম্পর্কে জানা গেছে; তাদের একটির নাম অ্যাটেনশন গ্র্যব। এ পদ্ধতিতে জিজ্ঞাসাবাদকারী বন্দীর পরিধেয়ের সামনের অংশ জোরে চেপে ধরে তাকে অনবরত ঝাঁকাতে থাকে। আরেকটি কৌশল হলো অ্যাটেনশন স্ল্যাপ। খোলা হাতে জোরে থাপ্পড় মারার এই পদ্ধতির লক্ষ্য বন্দীকে ব্যথা দেয়া এবং তার মনে ভীতির সঞ্চার করা। অপর পদ্ধতির নাম দ্য বেলি স্ল্যাপ। এতে খোলা হাতে বন্দীর পেটে জোরে থাপ্পড় মারার লক্ষ্য হলো বন্দীকে ব্যথা দেয়া। চিকিৎসকরা মনে করেন, পেটে ঘুষি মারলে ভেতরে ক্ষতি হতে পারে। বন্দীকে লম্বা করে দাঁড় করিয়ে রেখেও আরেকটি কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এতে হাতকড়া পড়িয়ে বন্দীকে জোর করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এ সময় তার পা দু'টি এমনভাবে বাঁধা হয়, যাতে সে বসতে না পারে। আর এ অবস্থায় বন্দীকে টানা ৪০ ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। ফলে ঘুমাতে না পেরে ও ক্লান্তিতে বন্দী হার স্বীকার করে এবং স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয়। নির্যাতনের আরেকটি কৌশলের নাম দ্য কোল্ড সেল। এ সময় বন্দীকে নগ্ন করে ৫০ ডিগ্রি উষ্ণতার একটি কক্ষে রাখা হয় এবং কিছুক্ষণ পর সেখানে তার গায়ে ঠান্ডা পানি ঢেলে দেয়া হয়। সিআইএ'র নির্যাতনের এ কৌশলগুলো খুবই নির্মম। এর শিকার বন্দীদের সারা জীবন নানা মানসিক সমস্যায় ভুগতে হয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মার্কিন লেখক মাইকেল প্যারেন্টি লিখেছেন মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) এবং এ ধরনের অন্যান্য সংগঠনের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় বিভিন্ন বশংবদ রাষ্ট্রের সামরিক ও পুলিশ বাহিনীকে গোয়েন্দাগিরি, নজরদারি, অত্যাচার, ভীতি প্রদর্শন ও খুন করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ফোর্ট বেনিংয়ে অবস্থিত মার্কিন সামরিক বাহিনীর স্কুল অফ আমেরিকান (সোয়া) এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মার্কিন বশংবদ রাষ্ট্রগুলোর সামরিক অফিসারদের অত্যাচার চালাবার সর্বাধুনিক কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বলে সারা ল্যাটিন আমেরিকার জনসাধারণ এর

নাম দিয়েছে 'খুনীদের পাঠশালা' (স্কুল অফ এ্যাসাসিনস/এসওএ)। এল সালভাদরের গ্রামগুলোতে হত্যাযজ্ঞ ও নৃশংসতা চালাবার দায়ে অভিযুক্ত অধিকাংশ সামরিক অফিসারই সোয়াতে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এসব মুৎসুদ্দি-নিপীড়করা তাদের বন্দীদের বাধ্য করেছে বন্দীদের শিশুসন্তানসহ আত্মীয় ও বন্ধুদের ওপর অত্যাচার দেখতে। এরা পরিবারের সদস্যদের সামনে মেয়েদের ধর্ষণ করেছে, এ্যাসিড অথবা গরম জল দিয়ে ঝলসে দিয়েছে যৌনাঙ্গ; মেয়েদের যৌনাঙ্গে এবং বন্দীদের মুখে ইঁদুর ঢুকিয়ে দিয়েছে; যৌনাঙ্গ, চোখ, জিহবাসহ বন্দীদের শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে ফেলেছে। তারা ধীরে ধীরে কষ্ট দিয়ে মারার জন্য মেয়ে বন্দীদের স্তনে বা শিরায় ইঞ্জেকশন দিয়ে বাতাস ভরে দিয়েছে। ছেলেদের মলদ্বারে এবং মেয়েদের যৌনাঙ্গে লাঠি বা বেয়োনেট ঢুকিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে হত্যা করেছে বন্দীদের। এছাড়া নিকারাগুয়া, মোজাম্বিক, এ্যাঙ্গোলা ও আফগানিস্তানে সরকারবিরোধী ভাড়াটে বাহিনীর ধ্বংসাত্মক যুদ্ধকে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা রাষ্ট্র মদত দিয়েছে। এসব ভাড়াটে বাহিনী বয়স নির্বিশেষে মেয়েদের ধর্ষণ করেছে, হাজার হাজার মানুষকে খুন বা পঙ্গু করেছে অথবা অত্যাচার চালিয়ে মানসিকভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। হাজার হাজার কিশোরকে অপহরণ করে মার্কিন মদতপুষ্ট প্রতি বিপ্লবী বাহিনীতে বলপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ নাগরিককে চাল-চুলোহীন অবস্থায় আশ্রয় নিতে হয়েছে উদ্বাস্তু শিবিরে।[৩২]

এছাড়া আবু গারাইব ও গুয়ানতানামো কারাগারে সংঘটিত নির্যাতন এখন সর্বজনবিদিত। দৈনিক *গার্ডিয়ান* পত্রিকার এক প্রতিবেদনে গুয়ানতানামোয় নির্যাতিত এক বৃটিশ নাগরিকের পরিবার তার ওপর চালানো নির্যাতনের প্রমাণ হিসেবে প্রামাণ্য দলিল উপস্থাপন করেছে বলে জানানো হয়। এ প্রতিবেদনে আরও উল্লেখিত হয়েছে যে, ওমর বাগরাম নামে এ ব্যক্তিকে মারধর ও যৌন নির্যাতন ছাড়াও ইলেকট্রিক শক দেয়া হয় এবং ৪৫ দিন তাকে না খাইয়ে রাখা হয়।[৩৩] এ কারাগারে সীমাহীন নির্যাতনে বিপর্যস্ত অনেক বন্দীকে আত্মহত্যা করতেও শোনা গেছে। অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের একজন অংশীদার হিসেবে পাকিস্তানের মোশার্‌রফ সরকার বহু নিরীহ লোককে জঙ্গি সন্দেহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়, যাদের বহুসংখ্যক নিখোঁজ হন এবং নিদারুন নিপীড়নের শিকার হন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর বিশ্বব্যাপী এক মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাতে বলা হয় পাকিস্তানে যেভাবে বন্দীদের নির্যাতন করা হয় তা অমানবিক। প্রচণ্ড মারধর, সিগারেট দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া, বৈদ্যুতিক শক, দীর্ঘক্ষণ ঝুলিয়ে রাখা, পায়ের পাতায় পেটানো ইত্যাদি সেখানকার বন্দী নির্যাতনের সাধারণ দৃশ্য।[৩৪]

শুধুমাত্র বন্দী নির্যাতনের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন সীমাবদ্ধ নেই; তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যেকোনো আন্দোলনকেই দমন করা হয় নির্মমভাবে। এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে ২০০৭ সালে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত জি-৮ সম্মেলনের প্রতিবাদে লক্ষাধিক বিক্ষোভকারীর ওপর চালানো পুলিশি নির্যাতন। জার্মানির একটি আইনী সংগঠন জানায়, বিশ্বায়নবিরোধীদের মিছিল সমাবেশের সময় এবং গ্রেফতারকৃতদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করে পুলিশ। এতে প্রায় এক হাজার ২০০ বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং এদের অনেককে অমানবিকভাবে কংক্রিটের ওপর বসানো শক্ত তারের খাঁচাসদৃশ অস্থায়ী বন্দিখানায় আটকে রাখা হয়। সংগঠনটির ভাষ্যমতে, মাত্র ২০ বর্গমিটারের খাঁচার মতো বন্দিখানায় ২৫ জন করে বিক্ষোভকারীকে রাখা হয়। এছাড়া বিক্ষোভ সমাবেশ চলাকালে পুলিশ বহু নিরীহ বিক্ষোভকারীকেও নির্মমভাবে প্রহার করে।[৩৫]

খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার নিজের নাগরিককেও রেহাই দেয়া হয় না। তাই যেকোনো যুদ্ধবিরোধী বা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে দমন করতে চালানো হয় কঠোর নির্যাতন। প্যারেন্টি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, চল্লিশের দশকের শেষভাগ থেকে ১৯৫০-এর দশকের প্রথম ভাগে কমিউনিস্ট মতবাদের অনুসারী বা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন বলে অভিযোগ তুলে শত শত মানুষকে কর্মচ্যুত, আটক, নিগ্রহ, নিপীড়ন, অত্যাচার বা মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।[৩৬] ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ছাত্রদের বিক্ষোভ, অবস্থান ধর্মঘট ও অন্যান্য গোলযোগের মুখে পড়ে ছাত্রকর্মীদের গ্রেপ্তার, প্রহারসহ সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে যুদ্ধে পাঠানো হয়। এছাড়া কেন্ট স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় ও জ্যাকসন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের গুলি করে হত্যা করা হয়; শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত এবং পুলিশি প্রহারের শিকার হতে হয়। লেখকও ছিলেন তাদের একজন।[৩৭]

উপর্যুক্ত প্রতিটি ঘটনায় বর্বরতার যে স্বাক্ষর পাওয়া যায় তাতে মানুষকে নিছক 'উপায়' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অধিকাংশ নীতিদার্শনিকই* মর্যাদাসম্পন্ন প্রাণী হিসেবে মানুষকে 'উপায়' হিসেবে বিবেচনা করাকে 'অন্যায়' বলেছেন। এছাড়া ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ

---

* জার্মান নীতিবিদ ইমানুয়েল কান্ট, ব্রিটিশ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল, বিপ্লবী দার্শনিক কার্ল মার্কস, সমকালীন চিন্তাবিদ কোর্সগার্ড, এ্যালেন উড, ফিলিপ্পা ফুটসহ বহু দার্শনিকের দর্শনে মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি রয়েছে। এছাড়া কান্ট ও মার্কসের দর্শনে মানুষকে 'উপায়' হিসেবে ব্যবহারের সমালোচনা করা হয়েছে।

সম্মেলনে দেয়া মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় নঞর্থক অধিকারের তালিকায় ৫নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : "নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর আচরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।" এতে আরও বলা হয়েছেঃ কোনো মানুষকে মাদক, সংবেশন অথবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে ক্রমাগত চাপের মাধ্যমে কারও মত কিংবা পূর্ব-ধারণার পরিবর্তন করে তাকে ইচ্ছামতো নিজেদের কাজে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অনৈতিক।[৩৮] এ ধরনের অধিকারসমূহ মানুষের উচ্চতর মর্যাদার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, এখানে মানুষকে 'উপায়' হিসেবে ব্যবহারের বিরোধিতা করা হয়েছে।

নির্যাতনকে যদি আমরা সুখলাভের পথে অন্তরায় বলে বিবেচনা করি তবে তা সুখবাদের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। কারণ এতে ' দৈহিক' ও 'আত্মিক' উভয়বিধ সুখই বিপন্ন হয়। সুতরাং, অমার্জিত সিরেনীয় সুখবাদই[*১] হোক বা এপিকিউরীয় মার্জিত সুখবাদই[*২] হোক– কোনো মতবাদই নির্যাতনের পক্ষে যায় না। অপরদিকে, মিলের উপযোগবাদে যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনুমোদনের[*৩] কথা বলা হয়েছে সে নীতি অনুসারে নির্যাতনের পক্ষে বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোনো প্রকার অনুমোদনই মিলবে না। যদিও প্রায়শই সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে তথাপি কোনো দেশেই আইনসিদ্ধভাবে নির্যাতনকে বৈধতা দেয়া হয়নি। 'ওয়াটার বোর্ড' নির্যাতনের আবাসভূমি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনেও 'ওয়াটার বোর্ড' নির্যাতন গুরুতর অপরাধ বলে স্বীকৃত। এছাড়া অভ্যন্তরীণ অনুমোদন বলতে মিল যে বিবেকবোধের ইঙ্গিত দিয়েছেন সেই বিবেকের রায়কে বহু নীতিদার্শনিকই চূড়ান্ত রায় বা

[*১] সিরেনীয় দার্শনিক এরিস্টিপাস (খৃ. পূ. ৪৩৫-৩৫৬) সুখবাদের একটি দিককে ব্যাখ্যা করেন যা স্থূল সুখবাদ বা অমার্জিত সুখবাদ নামে অভিহিত হয়েছে। তিনি প্রচার করেন যে, মানুষের ধর্মই হচ্ছে সুখ অন্বেষণ করা এবং দুঃখ পরিহার করা। তিনি বিশ্বাস করতেন, সুখ অন্তর্নিহিতভাবে ভাল এবং দুঃখ অন্তর্নিহিতভাবে মন্দ।

[*২] এরিস্টিপাসের সুখের তীব্রতার পরিবর্তে এপিকিউরাস সুখের স্থায়ীত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এজন্য তাঁর মতবাদকে 'মার্জিত সুখবাদ' বলা হয়। এপিকিউরাস (খৃ. পূ. ৩৪২-২৭০) ইন্দ্রিয় সুখ ও মানসিক সুখের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং ইন্দ্রিয় সুখের চেয়ে দেহ-মনের প্রশান্তির দিকটিকে তিনি নৈতিক জীবনের 'পরম লক্ষ্য' বলে গণ্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বিচক্ষণতাকে সুখ নির্ধারণের মানদণ্ড হিসেবে বেছে নিয়েছেন। বিচক্ষণতাকে গুরুত্ব দেয়ার মানে মানুষের যুক্তিবাদিতা তথা বুদ্ধিবাদী দিকটিকে প্রাধান্য দেয়া।

[*৩] জন স্টুয়ার্ট মিলের উপযোগবাদ তত্ত্বে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনুমোদনের ধারণা পাওয়া যায়। বাহ্যিক অনুমোদন বলতে মিল সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুমোদনকে নির্দেশ করেন। আর অভ্যন্তরীণ অনুমোদন বলতে মিল বিবেকবোধের কথা বলেছেন। অভ্যন্তরীণ অনুমোদন এমন যা ব্যক্তিকে কর্তব্যে অবহেলা করলে নিরানন্দ করে রাখে, যন্ত্রণাবিদ্ধ করে রাখে।

নৈতিকতার মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এসব নীতি দার্শনিকদের কেউই নির্যাতনকে বিবেকসমর্থিত বলবেন না, বরং বিবেকহীন কাজ বলেই আখ্যা দেবেন।

পূর্ণতাবাদী দার্শনিক হেগেল[৩৯৩][*১] মনে করেন, মানুষ ইতর প্রাণী থেকে পৃথক তার ব্যক্তিত্ববোধের কারণে। স্বাতন্ত্র্যবোধের কারণে মানুষও ইতর প্রাণীর মত অপর মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়ে নিজের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট হয়। কিন্তু শুধুমাত্র আত্মস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অন্যের ক্ষতি করাকে হেগেল মানবোচিত আচরণ বলে গণ্য করেননি। অর্থাৎ, পূর্ণতাবাদী নীতিদর্শনে কেউ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অপর মানুষের অধিকার বিনষ্ট করলে বা তার উপর অত্যাচার কিংবা নিপীড়নমূলক আচরণ করলে তাকে ইতর প্রাণীর পর্যায়ভূক্ত বলে বিবেচনা করাই যৌক্তিক হবে। অপরদিকে, মানুষের মর্যাদার দৃঢ় প্রবক্তা ইমানুয়েল কান্ট[৪০৩][*২] প্রতিটি মানুষকে বিবেচনা করেছেন উদ্দেশ্যরাজ্যের সদস্য হিসেবে। তাই বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী হিসেবে মানুষ নিজের মত অন্যকেও একইভাবে উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করবে। অতএব, নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অন্যের উপর কোনো প্রকার 'শারীরিক নির্যাতন' কান্টীয় নীতিবিদ্যায় 'অন্যায়' বলে স্বীকৃত।

তবে আত্মস্বার্থবাদী দর্শনটি সকল প্রকার শোষণ বা নির্যাতনের পক্ষে ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ এ মতবাদ অনুযায়ী, অপরের ক্ষতি বা অপকার করে হলেও আত্মস্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা চালানো মানুষের একমাত্র কর্তব্য। এ দর্শনের আবার তিনটি রূপ রয়েছে–

১) সর্বজনীন আত্মস্বার্থবাদ

২) ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মস্বার্থবাদ ও

৩) ব্যক্তিগত আত্মস্বার্থবাদ

[*১] ফ্রেডারিক হেগেল ছিলেন আধুনিক যুগের প্রখ্যাত জার্মান ভাববাদী দার্শনিক। তিনি তাঁর *Outlines of the Philosophy of Right* গ্রন্থে আইন, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান, প্রথা, রীতি-নীতি, ব্যক্তির অধিকার, কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নৈতিকতা সম্পর্কেও ধারণা প্রদান করেন। তাঁর এই নৈতিক মতবাদ দর্শনের ইতিহাসে 'পূর্ণতাবাদ' নামে পরিচিত।

[*২] ইমানুয়েল কান্ট *Fundamental Principles of Metaphysics of Morals* গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শর্তহীন আদেশ সম্পর্কে আলোচনা করেন। শর্তহীন আদেশের দ্বিতীয় সূত্রে তিনি মানুষকে 'উপায়' হিসেবে ব্যবহার নৈতিকতার পরিপন্থী হিসেবে ব্যাখ্যা করেন এবং সকল মানুষকে শুধুমাত্র 'উদ্দেশ্য' হিসেবে গণ্য করে কাজ করার কথা বলেন।

সর্বজনীন আত্মস্বার্থবাদ অনুযায়ী, প্রত্যেক ব্যক্তির এমনভাবে কাজ করাই সঙ্গত যাতে তার নিজ স্বার্থ অধিক পরিমাণে অর্জিত হয়। এ নীতিটিকে সাংকেতিকভাবে প্রকাশ করলে এর আকারটি দাঁড়ায় এরূপ–

x এর উচিত এমনভাবে কাজ করা যাতে x এর স্বার্থ রক্ষা হয়

y এর উচিত এমনভাবে কাজ করা যাতে y এর স্বার্থ রক্ষা হয়

z এর উচিত এমনভাবে কাজ করা যাতে z এর স্বার্থ রক্ষা হয়

এ সাংকেতিক দৃষ্টান্তটিকে বাস্তব দৃষ্টান্তে পরিণত করলে এর আকারটি দাঁড়ায় এরূপ–

মার্কিনীদের উচিত এমনভাবে কাজ করা যাতে মার্কিন স্বার্থ রক্ষা হয়

বৃটিশদের উচিত এমনভাবে কাজ করা যাতে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষা হয়

অস্ট্রেলিয়ানদের উচিত এমনভাবে কাজ করা যাতে অস্ট্রেলীয় স্বার্থ রক্ষা হয়

এখন এ তিন জাতির স্বার্থ যদি অভিন্ন হয় এবং তা পূরণের জন্য যদি আফগানিস্তান কিংবা ইরাক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো, হত্যাকাণ্ড সংঘটন ও আবুগারিব কারাগারে বন্দী নির্যাতনের প্রয়োজন পড়ে, তবে সর্বজনীন আত্মস্বার্থবাদ এসব কর্মকাণ্ডকে নীতিসিদ্ধ বলেই গ্রহণ করবে।

অপর মতবাদ ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মস্বার্থবাদ অনুসারে, ব্যক্তির এমনভাবে কাজ করা উচিত যাতে কেবল তার নিজের স্বার্থই রক্ষা হয়। এ নীতিটিকে সাংকেতিকভাবে নিম্নরূপভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে–

x এর উচিত এমনভাবে কাজ করা যাতে x এর স্বার্থ রক্ষা হয়

y এর উচিত এমনভাবে কাজ করা যাতে x এর স্বার্থ রক্ষা হয়

z এর উচিত এমনভাবে কাজ করা যাতে x এর স্বার্থ রক্ষা হয়

এবার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে–

মার্কিনীদের উচিত এমনভাবে কাজ করা যাতে মার্কিন স্বার্থ রক্ষা হয়

আফগানদের উচিত এমনভাবে কাজ করা যাতে মার্কিন স্বার্থ রক্ষা হয়

Dhaka University Institutional Repository

ইরাকীদের উচিত এমনভাবে কাজ করা যাতে মার্কিন স্বার্থ রক্ষা হয়

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মস্বার্থবাদ নীতি অনুসরণ করে একটি জাতি নিজস্বার্থে অন্য যেকোনো জাতিকে নিছক ‘উপায়’ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

সর্বশেষ আত্মস্বার্থবাদী মতবাদ ব্যক্তিগত আত্মস্বার্থবাদ অনুযায়ী, ব্যক্তির উচিত এমনভাবে কাজ করা যাতে কেবল তার নিজ স্বার্থই রক্ষা পায়, অন্যদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি নিয়ে ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, a শুধু লক্ষ্য রাখবে কীভাবে তার নিজের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়; b, c, d এর স্বার্থ নিয়ে তার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। অন্য কথায়, মার্কিনীরা কেবল নিজ স্বার্থ রক্ষায় কাজ করবে; ইরাক, আফগানিস্তান বা ভিয়েতনামের স্বার্থের কথা তার বিবেচনায় আনার প্রয়োজন নেই।

আত্মস্বার্থবাদী এ সকল যুক্তি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কিংবা নির্যাতনকে বৈধতা দেয়া যেতে পারে, কিন্তু এ যুক্তি কতটুকু সন্তোষজনক সে বিষয়টি যাচাই করে দেখা প্রয়োজন। হেগেলীয় পূর্ণতাবাদ অনুযায়ী, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী হিসেবে মানুষের আত্মস্বার্থবাদী মনোভাবের পাশাপাশি রয়েছে পরার্থবাদী মনোভাব। এ দুই বৃত্তির সমন্বয়ের মাধ্যমেই সে তার মনুষ্যত্বকে অটুট রাখতে পারবে। এ কারণেই তিনি বলেছিলেন, “মানুষ হও”। পুরোপুরি আত্মস্বার্থের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে পরার্থবাদকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করলে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে হারিয়ে ইতর প্রাণীর সমগোত্রীয় হয়ে পড়বে। আর কান্টীয় নৈতিকতায় কোনো ব্যক্তির পক্ষেই নিজেকে বা অন্যকে ‘উপায়’ হিসেবে গণ্য করা ঠিক নয়। সুতরাং, ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মস্বার্থবাদী নীতি অনুসরণে y ও z এর x এর স্বার্থে নিজেকে ‘উপায়’ হিসেবে ব্যবহার করা যেমন অনৈতিক, তেমনিভাবে বিপরীতদিকে x-এর জন্যও y ও z কে ‘উপায়’ হিসেবে ব্যবহার করাও সম্পূর্ণ অনৈতিক।

সাম্প্রতিককালে মনোচিকিৎসকগণ* আত্মস্বার্থবাদী ব্যক্তিদের ‘মানসিক বিকারগ্রস্ত’ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। এ ধরনের মানসিক বিকারগ্রস্ত ও আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক জীবনধারা কখনোই

* বিশ্বখ্যাত মনোসমীক্ষক সিগমুন্ড ফ্রয়েড প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আইনস্টাইনকে বলেছিলেন, যুদ্ধ ঘটে, কারণ মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও ধ্বংস করার একটি সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে। প্রখ্যাত প্রাণী আচরণবিদ লরেঞ্জের (১৯৬৭) তত্ত্বেও জন্মগত নোদনার ধারণাটি টিকে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে সমাজ মনোবিজ্ঞানীগণ আগ্রাসনের এই সহজাত প্রবৃত্তি ব্যাখ্যার তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁরা এই ধারণার বিপরীতে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে বিভিন্ন মানবসম্প্রদায়ের মধ্যে আগ্রাসনের তারতম্য তুলে ধরেন। সাম্প্রতিককালে মনোচিকিৎসকগণ আত্মকেন্দ্রিক, হৃদয়াবেগহীন, অনুশোচনা, লজ্জা বা অপরাধবোধহীন তাড়নাপ্রবণ ব্যক্তিদের ‘মানসিক বিকারগ্রস্ত’ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন।

সন্তোষজনক জীবনপ্রণালী হতে পারে না। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে সমকালীন নীতিদার্শনিক পিটার সিঙ্গার বলেছেন:

"... আমাদের জীবনের একটি স্থায়ী অর্থ খুঁজে বের করার জন্য আমাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতিহীন বা জীবনের পরিকল্পনাহীন মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের জীবনধারা অতিক্রম করাই যথেষ্ট নয়। আমাদের অবশ্যই দূরদর্শী আত্মবাদীদের জীবনধারাকেও অতিক্রম করতে হবে যাদের শুধু নিজের স্বার্থ সম্বলিত দীর্ঘমেয়াদী জীবন পরিকল্পনা রয়েছে। দূরদর্শী আত্মবাদী সাময়িকভাবে তাদের জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে পারেন। কারণ তাদের নিজস্ব স্বার্থ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য রয়েছে। কিন্তু পরিণামে সেই স্বার্থ বৃদ্ধি বলতে কী বোঝায়? আমাদের স্বার্থের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই যখন অর্জিত হয়, তখন কি আমরা নিষ্ক্রিয় থেকে সুখী হতে পারি? আমরা কি এভাবে সুখী হতে পারবো?..."[৪১]

এ প্রশ্নটি রেখে পিটার সিঙ্গার স্পষ্টত:ই বোঝাতে চেয়েছেন, আত্মস্বার্থবাদী জীবন কখনোই অর্থপূর্ণ জীবন হতে পারে না। তিনি মনে করেন, যারাই এ পৃথিবীতে নিজের অবস্থান ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধিকতর সচেতন তাদের জন্যই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি একটি অর্থ ও উদ্দেশ্য বহন করে। সুতরাং একটি অর্থপূর্ণ জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ। এ প্রসঙ্গে সিঙ্গারের সিদ্ধান্ত হচ্ছে: "... ... আমাদের নিজস্ব স্বার্থের চেয়ে ব্যাপকতর একটি উদ্দেশ্যের জন্য যদি আমরা অনুসন্ধান চালিয়ে যাই, তাহলে একটি সুস্পষ্ট সমাধান হচ্ছে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ। এই ব্যাপকতর উদ্দেশ্যটি আমাদের নিজস্ব চেতনার স্তরের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কিছুর অধিকারী হিসেবে জীবনকে দেখার সুযোগ করে দেবে... এই পন্থাতেই আমরা নিজেদেরকে সবচেয়ে সম্ভাব্য বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গি, সিজউইক যাকে বলেছেন 'বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি' এর সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং একাত্ম করতে পারি।[৪২] এভাবে প্রত্যেকেই যদি একটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের মধ্য দিয়ে বিশ্বজনীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহলে পৃথিবীর বুক থেকে শোষণ-নির্যাতন বিলুপ্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিপ্রস্তর চিরতরে ভেঙ্গে পড়বে।

অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক কূটকৌশল

এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার নির্ভরশীল দেশগুলোকে শোষণ করেই সবসময় সাম্রাজ্যবাদ তার মুনাফা অর্জন করে আসছে। বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য তথ্যাদি সংগ্রহ করে রাউল প্রোবিশ[৪৩] দেখিয়েছেন, উন্নত দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যের মাধ্যমে অনুন্নত দেশগুলোর লাভবান হওয়ার যে ধারণা সৃষ্টি করা

হয়েছে তা সঠিক নয়। কারণ অনুন্নত দেশগুলো সাধারণত কৃষিজ পণ্য রফতানি করে আর আমদানি করে শিল্পপণ্য। বাণিজ্য শর্তগুলো ক্রমাগত অনুন্নত দেশগুলোর বিপক্ষে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অনুন্নত দেশগুলো বারবারই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।[৪৪] শুধু তাই নয়, পূর্ববর্তী ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এসব দেশে তৈরি হয়েছে একটি দালাল বুর্জোয়া শ্রেণী যারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করে চলে। তাই উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা লাভের পরেও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এ বুর্জোয়া শ্রেণীটি সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল ভেঙ্গে দেশের উন্নয়নকল্পে কোনো স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণ করেনি। আর এ অনুন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার মূল কারণই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ। এ শোষণ সংগঠিত হয় রফতানিমুখী খাতে পুঁজি বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের মাধ্যমে।[৪৫]

সাম্রাজ্যবাদের ফলে পুঁজির যে আন্তর্জাতিকীকরণ ঘটেছে তা আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনকে আরও গভীর করেছে, বিশ্বের আরও বেশী অঞ্চলকে পুঁজির মাধ্যমে নিকটতর করেছে, আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির আগ্রাসনের মুখে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব হয়ে পড়েছে বিপন্ন। উৎপাদনের বৈশ্বিক ও সামাজিক চরিত্র লাভ উৎপাদনের আরও বিকাশের পথে ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুঁজির শৃঙ্খলকে আরও বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে উপস্থিত করছে, যাতে শ্রেণী সংগ্রাম গভীরতর রূপ নিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব আরও বেশি আন্তর্জাতিক রূপ নিচ্ছে।[৪৬]

বহুজাতিক সংস্থার মাধ্যমে যেমন পুঁজি আন্তর্জাতিক চরিত্র নিয়েছে, তেমনি এ প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপকের ভূমিকা পালন করেছে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ। বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ এবং পুঁজিবাদী কেন্দ্র রাষ্ট্র ও সংস্থাসমূহ অনুন্নত দেশে বিভিন্ন কর্মসূচী চাপিয়ে দিলেও তারা নিজেরা মুক্তবাজার অর্থনীতির নীতিমালা সব ক্ষেত্রে অনুসরণ করে যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে এক ধরনের দ্বিমুখী নীতি। একদিকে তারা অনুন্নত দেশে মুক্ত অর্থনীতি বা অবাধ আমদানির জন্য চাপ দেয়, অপরদিকে নিজেদের অর্থনীতি অন্যের কাছ থেকে সংরক্ষিত রাখে, রফতানিমুখী শিল্পায়নের প্রস্তাব দিয়ে রফতানির পথে আরোপ করে নানা বিধি-নিষেধ। পুঁজির অবাধ চলাচল অনুমোদন করেও পণ্য ও শ্রম কেবল একদিক থেকেই আসতে দেয় এবং তৃতীয় বিশ্বের পণ্য যাবার পথে আরোপ করে বাধা। আবার কৃষিতে ভর্তুকি তুলে দেবার কথা বলে মার্কিন ও ইউরোপীয় কৃষিতে বহুগুণ বেশী ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে। উপরন্তু, উদ্যোক্তার স্বাধীনতাও তারা হরণ করছে ঋণের সঙ্গে বিনিয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে শর্ত জুড়ে দিয়ে।[৪৭]

অপরদিকে, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আগ্রাসন বিস্তৃত করার জন্য অনুন্নত বিশ্বের জন্য বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ দিয়েছে এক কাঠামোগত সামঞ্জস্যবিধান কর্মসূচী (কাসাক)। কাসাকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে : (১) অবাধ বাণিজ্য বিশেষত আমদানি নীতি উদার করা, (২) রাষ্ট্রের ভূমিকা ও দায়িত্ব হ্রাস, (৩) সামাজিক খাতে ব্যয় সংকোচন, (৪) রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান খাত দ্রুত বিরাষ্ট্রীয়করণ, (৫) ভর্তুকি প্রত্যাহার ইত্যাদি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এসব নীতি কেবল অনুন্নত দেশের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা এসবের ঊর্ধ্বে থেকে কিভাবে উন্নত দেশগুলো দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করে অনুন্নত দেশগুলোকে শোষণ করছে। তাই এ কাসাক কর্মসূচীর পরিণতি হিসেবে অনুন্নত দেশগুলোতে দেখা দিচ্ছে দারিদ্র, অনিবার্য পরিবেশ বিপর্যয়, বৈষম্য বৃদ্ধি ইত্যাদি সমস্যা।[৪৮] এভাবেই পুঁজিবাদী বিশ্ব পুঁজির বিকাশের মধ্য দিয়ে আধিপত্য কায়েম করেছে সমগ্র বিশ্বে, যা টিকিয়ে রাখা হচ্ছে জাতিগত, বর্ণগত, ধর্মীয়, লিঙ্গীয় নানা বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে, যা আন্তর্জাতিকীকরণের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ।[৪৯]

সাম্রাজ্যবাদ যেহেতু পুঁজিবাদেরই বিকশিত রূপ, তাই এতে শোষণ ও বৈষম্যমূলক পুঁজিবাদের মৌল নিয়মের (উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব) কোনো প্রকার পরিবর্তন ঘটেনি। বরং, এ পর্যায়ে শোষণ আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে। মার্কস ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার ওপর নৈতিকতার যে ধারণা প্রদান করেছিলেন তাতে এ বক্তব্য সুস্পষ্ট ছিল যে, শোষণ পুঁজিবাদী সমাজের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। এ শোষণ জবরদস্তিমূলক। আর নৈতিক আদর্শের ভিত্তি যেহেতু উৎপাদন পদ্ধতি সেহেতু উৎপাদন পদ্ধতি যেমন হবে নৈতিক আদর্শও তার অনুরূপ হবে। এ কারণে পুঁজিবাদী শোষণকে ভালত্ব বা কোনো নৈতিক আদর্শ দিয়ে বিচার না করে তিনি পুঁজিপতি কর্তৃক উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎকে 'চুরি', 'ডাকাতি', 'লুণ্ঠন' ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন।[৫০] সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে এসে পুঁজিবাদীদের এ লুণ্ঠন আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে এবং বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো লুণ্ঠনকে দিয়েছে নিয়মতান্ত্রিক এক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।

মার্কসীয় পর্যালোচনায় লুণ্ঠনধর্মী চরিত্র, শোষণ, দাসত্ব, বিচ্ছিন্নতা, অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ত্রুটি যাকে তিনি অমানবিক ও অযৌক্তিক বলে অভিহিত করেছিলেন।[৫১] মার্কস ব্যবহৃত 'চুরি', 'ডাকাতি', 'লুণ্ঠন', 'অমানবিক' প্রভৃতি প্রত্যয় নৈতিকতার সাথে সম্পৃক্ত বলে পরবর্তীতে নব্য-মার্কসবাদীরা দাবি করেন, এসব প্রত্যয় ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি

পরোক্ষভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যায্যতাকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। মার্কস লক্ষ্য করেছিলেন, পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের মর্যাদা বলে কিছু নেই। এখানে প্রতিটি মানুষকেই মুনাফা লাভের জন্য উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই তিনি সর্বান্তকরণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদের দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন।

মানুষের মর্যাদা সম্পর্কিত কান্টীয় ব্যাখ্যাটিও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যায়। কান্টের প্রস্তাবিত শর্তহীন আদেশের তৃতীয় সূত্রটি হলো "সমগ্র মানবতাকে ও যুক্তিজীবী প্রকৃতিকে স্বীয় মূল্যে মূল্যবান বলে ধরে নিতে হবে, কেননা ইচ্ছাবৃত্তি নিজে বিশ্বজনীন বিধানকর্তা।"[৫২] পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় দেখা গেছে ধনাঢ্য শক্তিমান কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া আইন সবার ওপর জোরপূর্বক প্রয়োগ করা হয়। আর এর বিকাশধারায় সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোতে দেখা যাচ্ছে, উন্নত তথা ধনাঢ্য দেশগুলোর চাপিয়ে দেয়া নীতি অনুন্নত তথা দরিদ্র দেশগুলোর ওপর অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করা হয়। বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের কাসাক কর্মসূচী এ বাস্তবতারই সাক্ষ্য বহন করে। এ ধরনের চাপিয়ে দেয়া কর্মসূচী বা আইনকে কখনোই স্ব-আরোপিত বলা যায় না, বরং তা নিপীড়নমূলক। এতে অনুন্নত বিশ্বের মানুষকে বুদ্ধিময় সত্তা হিসেবে গণ্য না করে উন্নত বিশ্বের স্বার্থসিদ্ধি বা মুনাফা লাভের 'উপায়' হিসেবে বিবেচনা করা হয় যাতে উদ্দেশ্য রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের সার্বভৌমত্ব এবং মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় যা সম্পূর্ণ অমানবিক ও নিন্দনীয়।

অর্থনৈতিক শোষণের এ অমানবিকতা জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার কর্মসূচীর অর্থনৈতিক অধিকারগুলোর সুস্পষ্ট লংঘন। একটি ন্যূনতম মানসম্পন্ন জীবন নির্বাহের অধিকার ও সমান সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকার অর্থনৈতিক অধিকারগুলোর অন্যতম। বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ আরোপিত শোষণমূলক কর্মসূচী ও অসম বাজার ব্যবস্থার কারণে অনুন্নত বিশ্বে দেখা দিচ্ছে ব্যাপক দারিদ্র, যার ফলে তারা ন্যূনতম মানসম্পন্ন জীবন-যাপনে ব্যর্থ হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদে বিদ্যমান বাজার বৈষম্যের কারণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো তাদের রপ্তানি পণ্যের মূল্য সবসময়ই কম পায় এবং শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে চড়া দামে পণ্য আমদানি করতে বাধ্য থাকে। এতে সমান সুযোগ-সুবিধালাভের অধিকারটি নিছক একটি ফাঁকাবুলিতে পরিণত হয়। উপরন্তু, উন্নত দেশগুলোর দ্বিমুখী নীতি সবসময়ই অনুন্নত দেশগুলোকে তাদের ন্যায্য অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ন করার পাশাপাশি সেসব দেশে চালিয়ে যায় নানাবিধ রাজনৈতিক কূটকৌশল। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিজেদের কর্তৃত্ব অটুট রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রায়শ বহু দেশে 'স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিরোধ' সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালায়। এছাড়া নিজস্ব প্রভাব প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখতে বিপুল শক্তিধর সামরিক স্থাপনা গড়ে তোলে। এর পিছনে দুটো কারণ বিদ্যমান বলে মাইকেল প্যারেন্টি মনে করেন–

প্রথমত: বিশ্ব পুঁজি পুঞ্জীভবনকে সারা বিশ্বে নিরাপদ রাখার জন্য বিশাল সামরিক স্থাপনার দরকার হয়।

দ্বিতীয়ত: বিশাল সামরিক বাহিনী নিজেই বিপুল পুঁজি পুঞ্জীভবনের একটি প্রত্যক্ষ উৎস।[৫৩]

এখন বিভিন্ন দেশে প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু রাজনৈতিক কূটচাল তুলে ধরা যাক। লিবিয়ার নেতা গাদ্দাফি ১৯৬৯ সালে দুর্নীতিবাজ ও ধনী শাসকচক্রের উচ্ছেদ করে অপেক্ষাকৃত সমতাবাদী সমাজ তৈরির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন; এরই এক পর্যায়ে তিনি তেলসম্পদও জাতীয়করণ করেন। এসব ঘটনার পরপরই ৮০ ও ৯০-এর দশকের অধিকাংশ সময়জুড়েই লিবিয়া মার্কিন উসকানি, বিমান আক্রমণ, নিষেধাজ্ঞা ও সুদীর্ঘকাল ধরে চালিত অপপ্রচারের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।[৫৪] ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে মার্কিন মদদপুষ্ট একনায়ক রাফায়েল ট্রুজিল্লোর ৩০ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৬২ সালে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হুয়ান বশ জাতীয় স্বার্থে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের অপরাধে সাত মাসের মধ্যে মার্কিন মদদপুষ্ট সেনাবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন।[৫৫] আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষা করে প্রেসিডেন্ট রেগান ১৯৮৩ সালে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গ্রানাডায় 'আমেরিকানদের জীবন বিপন্ন হওয়া'র অজুহাত তুলে এক সামরিক হামলা চালান। একই অজুহাতে নিকারাগুয়ায় সামরিক হামলা চালাতে উদ্যত হলে একদল মার্কিন নাগরিক বিবৃতির মাধ্যমে এ অভিযান সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন।[৫৬]

এছাড়াও রুশ বিপ্লবের কয়েক মাসের মধ্যেই আমেরিকা ও ১৪টি পুঁজিবাদী দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। এ আক্রমণের পেছনে অজুহাত দেখাতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন বলেন,

শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও নৃশংসতা ঠেকানোর জন্য রাশিয়া আক্রমণকারী বাহিনীর প্রয়োজন আছে। পরবর্তীতে ষাটের দশকে ভিয়েতনাম আক্রমণেও মার্কিনীরা কতিপয় অজুহাত তুলে ধরে। এগুলো হলো–

১) দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারকে স্থিতিশীল করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জড়িয়ে পড়া দরকার।

২) উত্তর ভিয়েতনামের আক্রমণ প্রতিরোধে মার্কিন হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

৩) 'পিকিংস্থ সদর দপ্তর থেকে পরিচালিত এশীয় কমিউনিজমের' হাত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে রক্ষা করা।

৪) মার্কিন নিরাপত্তা ও জাতীয় মর্যাদা এবং মুক্তবিশ্বের টিকে থাকার জন্য এ সামরিক অভিযান প্রয়োজন।[৫৭]

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজ স্বার্থের প্রতিকূল কোনো কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করলেই নানা কূটকৌশল অবলম্বনের মধ্য দিয়ে তা ধ্বংসের ব্যাপক পদক্ষেপ চালায়। তেমনি আবার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যও নেয়া হয় বিভিন্ন অপকৌশল। যেমন: গ্যাস সম্পদ দখলের জন্য আফগান যুদ্ধ ও তেলসম্পদ লুণ্ঠনের জন্য ইরাক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিককালে সারা বিশ্বে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় উঠেছে। এসব অন্যায় যুদ্ধের পেছনে তারা অভিযোগ তুলেছে গণতন্ত্রহীনতার, মানবাধিকার লংঘনের তথা সে দেশের জনগণের স্বাধীনতাহীনতার। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, যে মানবাধিকার বা স্বাধীনতা লংঘনের অভিযোগ তারা তুলেছিলেন, তাদের আক্রমণে তার চেয়ে ব্যাপকতর হারে স্বাধীনতা ও মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের আরেকটি অপকৌশল হচ্ছে মাদকবিরোধী অভিযানের নামে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অবৈধ হস্তক্ষেপ চালানো। কলাম্বিয়ায় এই অজুহাতে মার্কিন সামরিক সাহায্যে বামপন্থীদের হত্যা করা হয়। একই অভিযোগ তুলে পেরুতে মার্কিন বাহিনী রাজনৈতিক বিদ্রোহ দমনকল্পে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে, ১৯৮১ সালে এই কৌশল অবলম্বন করেই পানামায় সামরিক অভিযান চালানো হয়।[৫৮]

রাজনৈতিক অপকৌশল পরিচালনার জন্য আরেকটি বড় সংস্থা হচ্ছে সিআইএ। ষাটের দশকে লাওসে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদবিরোধী প্যাথেট লাও বাহিনীর বিরুদ্ধে মেও উপজাতিকে সংঘর্ষে জড়িয়ে

ফেলার কাজে সিআইএর প্রধান কৌশল ছিল মেওদের আফিম পাচারে সহায়তা করা। এরও পূর্বে ১৯৪৭-৫০ সালের দিকে সিআইএ ফ্রান্স ও ইটালির কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত নাবিক ইউনিয়নগুলোর নেতৃত্বাধীন ধর্মঘট ভাঙার জন্য ইটালির সিসিলি ও করসিকার মাফিয়া চক্রকে অর্থ ও অস্ত্র যোগায়। বলিভিয়ায় কুখ্যাত 'কোকেন ক্যু' সংঘটিত হয় সিআইএর মদদে। ১৯৮৮ সালে সিনেটর কেরির নেতৃত্বাধীন সিনেট সাবকমিটি অন টেরোরিজম, নারকোটিক্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অপারেশনস-এ সাক্ষীরা প্রভূত তথ্য-প্রমাণ হাজির করে দেখান যে, ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ও সামরিক নেতাদের সঙ্গে সিআইএ এবং অন্যান্য মার্কিন সরকারি কর্মকর্তা বিশাল মাদক ব্যবসায় জড়িত। এ মাদক পাচার থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে সিআইএর কর্মকর্তারা ল্যাটিন আমেরিকা অঞ্চলের প্রতিবিপ্লবী বাহিনীগুলোকে অর্থের যোগান দেয়ার পাশাপাশি নিজেদের পকেটভারী করে।[৫৯]

উপরিউক্ত রাজনৈতিক অপকৌশলগুলোকে বিভিন্ন দিক থেকে পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। আদর্শনিষ্ঠ রাষ্ট্রদর্শনের 'শুভ' বিষয়ক মতবাদের অন্যতম হচ্ছে সর্বজনীন ব্যক্তিবাদ। এ মতবাদ অনুসারে, যা কিছু প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ভাল বা মন্দ তা সেই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত এবং সেই প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিবর্গের জন্যও ভাল বা মন্দ বলে বিবেচিত। একারণেই যে প্রাতিষ্ঠানিকতা ব্যক্তিস্বার্থকে অতিক্রম করে যায় ব্যক্তিবাদ সেই প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরোধিতা করে। এছাড়া ব্যক্তিবাদ জাতি, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, সমাজ বা যেকোনো যৌথ সংস্থার উর্ধ্বে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। সুতরাং, যখন একটি বিশেষ রাষ্ট্র অথবা তার মধ্যবর্তী কোনো সংস্থা স্বীয়স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ব্যক্তিমানুষের অধিকার খর্ব করে, ব্যক্তিবাদ অনুসারে তাকে কখনোই 'ভালো' বলা যাবে না। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্রশক্তি বা সিআইএ পরিচালিত যেকোনো কর্মকাণ্ড যদি অন্য কোনো দেশের ব্যক্তিমানুষের জন্য ক্ষতিকারক হয়, তবে ব্যক্তিবাদ কখনোই তাতে সমর্থন দেবে না, বরং তাকে 'মন্দ' বা 'অশুভ' বলেই বিবেচনা করবে।

ব্যক্তিবাদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে: এ মতবাদ মনে করে, পরিবর্তনীয় রাজনৈতিক পরিকল্পনা বর্তমান বা ভবিষ্যতের সেসব ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত হওয়া উচিত যারা এর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। সুতরাং এ নীতি অনুযায়ী, একটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সেদেশের জনগণ কর্তৃক নির্ধারিত হওয়া উচিত। তাই সিআইএর মদতে কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা এর মিত্রশক্তির সরাসরি হস্তক্ষেপে কোনো

দেশের নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা ব্যক্তিবাদ অনুসারে সম্পূর্ণ অনৈতিক। সমকালীন রাষ্ট্র দার্শনিক জন রল্‌স[৬০] লিখেছেন, আদর্শনিষ্ঠ প্রশ্নের সমাধান সেসব ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত যাদের মঙ্গলের জন্য এসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সুতরাং, রল্‌স-এর দৃষ্টিতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের ভাল-মন্দ মূল্যায়ন করা উচিত ব্যক্তিবাদের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে ইরাক কিংবা আফগানিস্তান বা বলিভিয়ার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সিআইএর ইচ্ছাধীন নয়, বরং সেসব দেশের জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করা উচিত। অর্থাৎ, একটি দেশের ভাল-মন্দ বা ভবিষ্যৎ সেদেশের জনগণ কর্তৃক নির্ধারিত হওয়া উচিত, কোনো বহি:শক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তা হতে পারে না।

টমাস হিল গ্রীনের[৬১] রাষ্ট্রচিন্তায় এক ধরনের বিশ্বজনীন ভাতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রসমূহের নি:সঙ্গবাদ অনুসরণ করে বিচ্ছিন্নভাবেও থাকা উচিত নয়, আবার কোনো একটি রাষ্ট্র মহাপরাক্রমশালী হয়ে অন্য রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করবে তা-ও বাঞ্জনীয় নয়।[৬২] অর্থাৎ, একটি রাষ্ট্রের অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপকে তিনি কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। জন স্টুয়ার্ট মিলও[৬৩] তাঁর সময়কার পুঁজিবাদী সমাজে কতিপয় ব্যক্তিবর্গের হাতে জমি, শিল্প পুঞ্জীভূত হতে দেখে হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন। সেই সঙ্গে সমাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এদিক থেকে বলা যায়, বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুগে কতিপয় বৃহৎ ধনাঢ্য শক্তি কর্তৃক সমগ্র বিশ্বের ভূ-খণ্ড ও সম্পদ দখলের প্রবণতা ও নানা অপকৌশলের মাধ্যমে সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের বিকৃত আত্মস্বার্থবাদী দর্শন কখনোই উদারতাবাদের প্রবর্তক মিল কর্তৃক সমর্থিত হতো না।

একটি রাষ্ট্রের ওপর কোনো রাষ্ট্রের অবৈধ হস্তক্ষেপ বা আগ্রাসন নানা কূটকৌশল ও অপতৎপরতার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হলে সেদেশ ও তার জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পুরোপুরি ক্ষুণ্ন হয়। সাম্রাজ্যবাদতত্ত্বের প্রবক্তা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে জনগণের মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। একইভাবে, সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে যেসব রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। অন্যান্য যেসব রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে সেগুলো হলো: জীবননির্বাহের পথে বঞ্চিত না হওয়া, কোনো অধিকার লংঘিত হলে (যদি লংঘনকারী প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিতেও আচরণ করে) ব্যক্তির আইনগত আশ্রয়লাভের অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা, সমতার অধিকার,

অপরাধী বলে প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে নিজেকে নির্দোষ বলে প্রমাণের সুযোগ লাভ করার অধিকার, আইনগতভাবে গোপনীয়তা ও রক্ষা পাবার অধিকার, চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, দোষী সাব্যস্ত হলে পুনর্বিচার প্রার্থনা করার অধিকার। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুগের নির্মম বাস্তবতা হচ্ছে: সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সকলেরই এসব রাজনৈতিক অধিকার থেকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বঞ্চিত হওয়া।

পরিবেশ বিপর্যয়

পরিবেশের ধ্বংসসাধন করা সাম্রাজ্যবাদী শোষণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। দীর্ঘদিন যাবৎ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো মুনাফার স্বার্থে এমনভাবে উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে যাতে গাছপালা ও প্রাণীসহ সবরকমের প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে। এতে কেবল মানবজীবন নয়, বরং সাধারণভাবে জীবনই ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে। এই পরিবেশ দূষণ শুধু ভূ-ভাগ ও বায়ুমণ্ডলে নয়, জলভাগকেও করে তুলেছে মারাত্মকভাবে দূষিত। ভূ-মধ্যসাগর পর্যন্ত জলজ প্রাণীশূন্য হয়ে অর্ধমৃতসাগরে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে। অপরদিকে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ অধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিনিয়ত বেড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে আগামি শতকের মাঝামাঝিতেই মানবজাতি ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। সারা পৃথিবীতে নির্বাপিত মোট কার্বন-ডাই-অক্সাইডের এক চতুর্থাংশই ছাড়ে শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪২০ কোটি টন শিল্পবর্জ্য প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে।[৬৪]

পশ্চাৎপদ দেশসমূহের পরিবেশ বিপর্যয়ের নেপথ্যেও ভূমিকা রাখছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো। সস্তায় গো-চারণভূমি পাবার লোভে কোম্পানিগুলো সমগ্র মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বর্ষণ বন উজাড় করে ফেলেছে। আগামি দুই দশকে মধ্য আমেরিকার বিষুবীয় অরণ্য এবং আমাজন অঞ্চলের আরও বিশাল অরণ্য নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া মার্কিন সামরিক বাহিনী সামরিক মহড়া ও বোমাবর্ষণ অনুশীলনের জন্য দেশ-বিদেশে কোটি কোটি একর জমিদখল করে রেখেছে। বহু দশক ধরে শতাধিক পারমাণবিক অস্ত্র কারখানা তেজস্ক্রিয় আবর্জনায় ভরে দিচ্ছে বাতাস, মাটি, ভূ-গর্ভস্থ জল আর নদী।[৬৫]

বর্তমানে অতিরিক্ত জমা হওয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক গঠন বদলে দিয়ে তৈরি করছে ‘গ্রীনহাউস এফেক্ট’ যাতে অতিরিক্ত তাপে পৃথিবীর মেরুর বরফাচ্ছাদন গলে যাচ্ছে, তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দূর করার প্রধান মাধ্যম হলো বন। কিন্তু সাম্প্রতিককালেই বিগত শতাব্দীগুলোর তুলনায় পৃথিবীর অর্ধেক অরণ্য উজার হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা একদিকে জ্বালানি কাজে ব্যবহার ও জিনিসপত্র তৈরির জন্য বেপরোয়াভাবে গাছপালা কেটে ফেলছে, অপরদিকে, হাতি, তিমি মাছ, হরিণ, বাঘ, সাপ থেকে শুরু করে হাজার হাজার প্রজাতির পাখি মেরে ফেলছে মুনাফার উদ্দেশ্যে। তাদের এ অশুভ তৎপরতার ফলস্বরূপ লাতিন আমেরিকার পেরু, ব্রাজিল ও আফ্রিকার কেনিয়া, উগান্ডা, কঙ্গো, জায়ারে, তানজানিয়া ইত্যাদি দেশ, এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, নেপাল, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশ প্রায় বৃক্ষশূন্য হতে চলেছে। অন্যদিকে, ব্যাপকভাবে বন্যপ্রাণী নিধনের ফলে পরিবেশগত ভারসাম্য একেবারেই নিঃশেষ হবার উপক্রম হয়েছে।[৬৬] কিন্ত এ ধ্বংসযজ্ঞ পশ্চাৎপদ দেশগুলোর ওপর চালানো হলেও তা সংঘটিত হচ্ছে উন্নত বিশ্বের দ্বারা। কারণ পৃথিবীর জনসংখ্যার ২০% হলেও তারা পৃথিবীর ৮০% সম্পদ দখল করে রেখেছে। অথচ পরিবেশ দূষণের খেসারত দিতে হচ্ছে বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশকে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ার ফলে অতিরিক্ত খরা ও বন্যা সৃষ্টির সম্ভাবনাও বাড়িয়ে তুলেছে। এর পরিণতিতে বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ ভূ-খণ্ড আগামি ৫০ বছরের মধ্যে পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।[৬৭]

আমাদের পরিবেশকে এ আসন্ন বিপর্যয় থেকে রক্ষাকল্পে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও যেমন বেশকিছু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে, তেমনিভাবে নীতিদার্শনিকরা পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপন করে এক্ষেত্রে পালন করেছেন অগ্রনী ভূমিকা। আমরা যদি পরিবেশকে স্বত:মূল্যে মূল্যবান সত্তা হিসেবে বিবেচনা করি, তবে এর যথেচ্ছাচার ব্যবহারকে সম্পূর্ণ অনৈতিক বলা যাবে বিনাবিতর্কে। কিন্তু, একে পরত:মূল্য হিসেবে বিবেচনা করলে উন্নত বিশ্ব তথা স্বল্পসংখ্যক মানুষের স্বার্থে এর যথেচ্ছ ব্যবহারকে হয়তো স্থুলভাবে নৈতিক বলা যেতেও পারে, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে কখনোই তাকে নৈতিক বলা যাবে না। কারণ পরিবেশের যদি স্বতঃমূল্য না-ও থাকে তথাপি এর সংরক্ষণের সঙ্গে আমাদের মানবজাতির অস্তিত্বের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যেহেতু মানবসত্তার অন্তর্নিহিত মূল্য আছে, তার জীবনের পক্ষে যা কিছু হুমকিস্বরূপ তা ত্যাগ করা অবশ্যই নৈতিক বলে বিবেচিত হতে বাধ্য। সুতরাং, পরিবেশের 'অন্তর্নিহিত মূল্য' থাকুক বা না-ই থাকুক পরিবেশ সংরক্ষণ মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার

জন্য অত্যাবশ্যকীয়। আর এ দু'ধরনের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশ বিষয়ক অ-মানবকেন্দ্রিক ও মানবকেন্দ্রিক নামে দুটি মতবাদ গড়ে উঠেছে।

সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবননির্বাহ করতো। কিন্তু সময়ের পালাবদলের ধারায় মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে। মানুষ তার নানা প্রয়োজনে পরিবেশকে ব্যবহার করতে গিয়ে সামাজিক পরিবেশের জন্ম দেয়। পরবর্তীতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আরও বেশী গতিশীল ও লাভজনক করতে গিয়ে মানুষ পরিবেশের যথেচ্ছ ব্যবহারে অগ্রসর হয়, পরিণতিতে পরিবেশের ধ্বংসের পাশাপাশি নিজ জীবনকেও করে তোলে বিপর্যস্ত। এ কারণেই লিওপোল্ড* পরিবেশকে অর্থনৈতিক মূল্যের দৃষ্টিতে না দেখে নৈতিক মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন।

আমরা জানি, পরিবেশ কোনো প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য ও নৈতিকতার অংশ হতে পারে না। কিন্তু সাম্প্রতিক দশকগুলোতে কর্পোরেশন, স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের সরকারী প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবেশকে কেন্দ্র করে নীতি নির্ধারণ করেছে। বিশ্বব্যাংক এক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে। ব্যাংকের পরিবেশগত প্রশাসনের প্রথম মূলনীতিটি হচ্ছে: পরিবেশগত মূল্য নির্ধারণে একটি মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা এবং এ বিষয়টি নিশ্চিত করা যে, এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত প্রক্রিয়া। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত মূল্য নির্ধারণ হচ্ছে: স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রভাবশালী গোষ্ঠীর আইনগত স্বার্থ রক্ষা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনভূমির সার্বিক ধ্বংস ঘটে ব্যাংকের গোপন ষড়যন্ত্রের কারণে। কারণ বিশ্বব্যাংকের মূল লক্ষ্য হচ্ছে: অরণ্যবিদ্যার উৎপাদন। তাই সামাজিক অভিঘাতে পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়টি অবহেলিত থেকে যায়। এ ব্যাংক সেসব সরকারের সঙ্গে কাজ করে যারা দেশীয় সংখ্যালঘুদের (যারা দরিদ্র শ্রেণী ও উপজাতীয়দের মৌলিক মানবিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়) ব্যাপারে কোনোভাবেই অগ্রাধিকার দেয় না।[৬৮] তদুপরি, বিশ্বব্যাংকের জবাবদিহিতার কোনো অবকাশ নেই। এর ওয়াশিংটন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

* দর্শনের সঙ্গে তাত্ত্বিক যোগাযোগ না থাকলেও পরিবেশবিদ লিওপোল্ড (১৮৮৭-১৯৪৭) তাঁর পরিবেশ বিষয়ক আলোচনায় নীতিবিদ্যাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে কর্তব্যমূলক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। তাঁর প্রবন্ধগুলোর মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করে "দ্যা ল্যান্ড এথিক" প্রবন্ধটি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্রিয়াও সবার কাছে গোপন রাখা হয় এবং জনগণের জন্য তা একেবারেই উন্মুক্ত নয়। ওয়াশিংটনের এনজিও সমস্যা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তথ্যের প্রয়োজন হলে প্রচলিত নিয়মের ভিত্তিতেই তা হয়ে থাকে। কিন্তু লাতিন আমেরিকা ও তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে ঋণের বোঝা চাপানোর সময় ভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে এক ধরনের 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' অনুসরণে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যেখানে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ পুঁজিবাদীদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে পরিবেশ বিশ্বব্যাংকের স্বাভাবিক কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ কাঠামোর একটি অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। পরিবেশগত পরিস্থিতি এখন অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ ক্রয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে সংকটাপন্ন দিকটি হচ্ছে: একটি নীতি যত সফল হবে, ব্যাংকের পরিবেশ কর্মসূচীতে তা সবচেয়ে কম অগ্রাধিকার পাবে।[৬৯]

আবার বিশ্বব্যাংক কখনো বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থে তৃতীয় বিশ্বে দখলদারিত্ব কায়েম করে। নীতিমালা প্রণয়ন, সরকারি রাজস্ব খাত বা অন্য কোনো উপায়ে এসব দখলদারিত্ব বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে প্রচার করা হয়, শিল্পায়িত দেশগুলো সরকারি পর্যায়ে অতিভোগের সঙ্গে বর্জ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যাটিতে বিবেকসম্পন্ন সাড়া প্রদান করে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পরিবেশগত উন্নয়নে বাধা দৃষ্টি করে উত্তরের দেশগুলো, দক্ষিণের দেশগুলো নয়। এখন আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংক্রান্ত যেকোনো সিদ্ধান্ত লবিকারী ও কর্মীরা অত্যন্ত সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের প্রান্তিক লাভের দিকটি নিশ্চিত করতে। এক্ষেত্রে এনজিওগুলোর কৌশলগত লক্ষ্য হচ্ছে: বিশ্বব্যাংকের সংস্কার সাধন করে এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া।[৭০]

এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যই দাতা সরকারগুলোর স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ কোনো পরিবেশগত খাতে পর্যাপ্ত তহবিল গঠন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব তহবিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে ঋণ গ্রহণে বাধ্য করে দাতা দেশগুলোর ব্যবসার পথ সুগম করা। মন্ট্রিল নীতিমালার অধীনে এরকম একটি বহুপাক্ষিক তহবিল গঠন করা হয়েছিল। এতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ওজোন স্তর ধ্বংসকারী দ্রব্যের ব্যবহার বাদ দিয়ে অতিরিক্ত খরচ নির্বাহ করার জন্য সাহায্য প্রদান করা হয়। ফলে তারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রথম তিন বছরে এ ঋণের যথার্থ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ২৪০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়। ১৯৯১ সালে এ ধরনের আরেকটি তহবিল গঠিত হয়েছিল বৈশ্বিক পরিবেশ সংক্রান্ত

সুযোগ সুবিধা (Global Environmental Facility GEF) কর্মসূচীর আওতায়। একটি তিন বছরের বিমানচালক কর্মসূচীর আওতায় এটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত খাত, যেমন, গ্রীনহাউস গ্যাস হ্রাসকল্পে কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন বা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।[৭১] সুতরাং, আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল এখন দাতা দেশগুলোর ব্যবসায়িক সুবিধার নামান্তর। মূলত বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে একচেটিয়াভাবে এসব তহবিল নিয়ন্ত্রিত হয়। কিছু তহবিল আবার ব্যাংকের সঙ্গে UNEP (United Nations Environmental Project) ও UNDP (United Nation's Developmental project)-এর যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

পরিবেশগত ইস্যুগুলো আন্তর্জাতিক পরিবেশগত কর্তৃপক্ষের অধীনে ন্যস্ত হওয়ার প্রশ্নেও রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। অনেক রাষ্ট্রই নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগকারীদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে অনিচ্ছুক। এ কারণে সার্বভৌমত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে অনেকসময় প্রকৃত ও সম্ভাব্য রাজনৈতিক সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে। প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়, পরিবেশ ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সার্বভৌম অধিকার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বা সীমিত করা হচ্ছে। পরিবেশ ও আন্তর্জাতিক আইনের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেকোনো প্রধান উন্নয়নশীল রাষ্ট্রকে তার সার্বভৌম অধিকার সীমাবদ্ধ করতে বাধ্য করতে চায়। এজন্যই বেইজিং ঘোষণায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর সার্বভৌমত্বের বিষয়টিকে কেন্দ্রীয় অবস্থানে রাখা হয়েছে। বেইজিং ঘোষণার ষষ্ঠ প্যারায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ উন্নয়নশীল দেশগুলোর তাদের নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেদের উন্নয়নমূলক ও পরিবেশগত লক্ষ্য ও প্রাধান্যকে সামনে রেখে ব্যবহার করার সার্বভৌম অধিকার রয়েছে।[৭২]

এখন বেইজিং ঘোষণার এ অংশটিকে নৈতিক মানদণ্ডের আলোকে পর্যালোচনা করা যাক। আমরা সুচিন্তিতভাবে বিবেচনা করলেই বুঝতে পারি যে, উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর দ্বারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে বলেই বেইজিং ঘোষণায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর সার্বভৌমত্বের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। "সকল মানুষ সৃষ্টিগতভাবে সমান"-এ নৈতিক আদর্শটিকে সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রগুলো বৃহত্তর সমতা প্রতিষ্ঠার এবং কৃত্রিম ও অন্যায্য অসমতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। এতদসত্ত্বেও আজকের দিনেও মানুষের অভিযোগ যে, তারা ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, নিরাপত্তা ও কর্মক্ষেত্রে অসমতার শিকার হচ্ছে। তাই যেসব দেশ বিপুল সম্পদের অধিকারী, তারাই জীবন, চিন্তা ও

কর্মক্ষেত্রে জীবনযাত্রার মানকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। আজকের দিনে তাই আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ (যেমন, লোহা, কয়লা, তেল, গ্যাস ও অন্যান্য) ও শিল্প কারখানা, সাধারণ সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলকভাবে স্বল্পসংখ্যক মানুষই নিয়ন্ত্রণ করছে। একইভাবে, শিল্পায়িত দেশগুলো বিপুল পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হওয়ার জন্য অতিমাত্রায় মনোনিবেশ করেছে। তাই আকর্ষণীয় সম্পদের পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে চরম অবহেলিত দারিদ্র।[৭৩]

বস্তুত, গোষ্ঠীগত স্বার্থপরতার প্রবণতা থেকে এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। হ্যারল্ড.এইচ.টাইটাস গোষ্ঠীগত স্বার্থপরতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: "গোষ্ঠীগত স্বার্থপরতা হচ্ছে একটি চূড়ান্ত বিপজ্জনক স্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত। একটি গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্যের ছদ্মাবরণে এটি অপর গোষ্ঠীর চরম ক্ষতিসাধন করে থাকে এবং সাধারণভাবে সামাজিক কল্যাণে বিঘ্ন ঘটায়। এক্ষেত্রে নিজ গোষ্ঠীর সদস্যদের একে অন্যের প্রতি মনোভাব ও প্রবণতা হচ্ছে সহযোগিতা, আনুগত্য ও পারস্পরিক আনুকুল্য। আর অপর গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রতি তাদের মনোভাব হচ্ছে অনীহা, অপছন্দ, বিরাগ, সন্দেহ অথবা যুদ্ধংদেহী প্রবণতা।"[৭৪] প্রকৃতপক্ষে, শিল্পায়িত দেশগুলো এক ধরনের দ্বিমুখী নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে গোষ্ঠীগত স্বার্থপরতার মনোভাব থেকে। একারণেই Richard N. Cooper তাঁর "United States Policy towards the Global Environment"[৭৫] Wilfred Beckerman তাঁর æGlobal Warming and International Action : An Economic Perspective"[৭৬] শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের দ্বন্দ্বই বৈশ্বিক জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে প্রকট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যা উত্তর-দক্ষিণের সংঘাত নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে তিনটি সমস্যা সবচেয়ে গুরুতর বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। যথা –

প্রথমত: বিবদমান সম্পদের ব্যবহার ও বিদ্যমান তুলনামূলক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণের অসমতা ওজোন স্তরের শূন্যতার মত বৈশ্বিক সমস্যা ও বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগত দিকটি বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, বিশ্ব জনসংখ্যার ১৬ শতাংশের কাছাকাছি শিল্পোন্নত দেশসমূহ সাম্প্রতিক গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য ৪৮% দায়ী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের হার ৫.৭ টন, সেখানে উন্নয়নশীল বিশ্বে গড়পড়তা মাত্র ০.৫ টন। মার্কিন জনসংখ্যার আনুমানিক ২৩০ মিলিয়ন মানুষ যে

পরিমাণ গ্রীনহাউজের গ্যাস নি:সরণের সঙ্গে জড়িত, সেখানে দক্ষিণের ৪ বিলিয়ন মানুষ একই পরিমাণ গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণের সঙ্গে জড়িত।

দ্বিতীয়ত: বৈশ্বিক পরিবেশ দক্ষিণের ভবিষৎ উন্নয়নের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত। উন্নয়নশীল বিশ্বে ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অপরিহার্যভাবে বৃদ্ধির প্রয়োজন পড়ছে যা সেখানকার মানুষের ওপর প্রভাব ফেলছে এবং আশঙ্কাজনকভাবে দারিদ্র ও বঞ্চনা অতিক্রম করার জন্যই তা করা হচ্ছে।

তৃতীয়ত: অথনৈতিক উন্নয়নে অধিক সহায়ক কার্যবিধি গ্রহণের ব্যর্থতাও দক্ষিণ কর্তৃক গৃহীত বিবিধ পরিবেশগত কার্যক্রমের ভিত্তি দুর্বল করে দেয়। মনে রাখা দরকার, এ বাধা মূলত আসে উন্নত দেশগুলো থেকে। তারা প্রচারণা চালায় যে, যদি ভারতীয় ও চীনা কার্বন নির্গমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর্যায়ে উন্নীত হয়, বিশ্বের নির্গমন হার আরোও তিনগুণ বেড়ে যাবে।

এ প্রসঙ্গে এন্ড্রু হারেল ও বেনেডিক্ট কিংসবেরী তাঁদের *The International Politics of the Environment* গ্রন্থের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন: "ক্ষমতা অবশ্যম্ভবীভাবে নেতিবাচক এবং এ ক্ষমতা মূলত দেখানো হয় বৈশ্বিক পরিবেশগত ঐকমত্যের প্রশ্নে দক্ষিণের ভিত্তিকে দুর্বল করার জন্য। গ্রীনহাউস গ্যাস হ্রাসকরণ বা সিএফসি (ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন) নির্গতকরণের ক্ষেত্রে শিল্পায়িত দেশগুলোর (যারা সিংহভাগ দূষণের জন্য দায়ী) যেকোনো সিদ্ধান্ত সহজেই অপরিবর্তিত রাখা হয়। অপরদিকে, মাত্র অল্পসংখ্যক বৃহৎ উন্নয়নশীল দেশে (বিশেষত চীন, ভারত ও ব্রাজিল) গ্রীনহাউস বৃদ্ধি বা সিএফসি নির্গতকরণের হার বেশী। তারপরেও অনেক উন্নয়নশীল দেশই বৈশ্বিক পরিবেশগত সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য খরচ বহন করে। যেমন, চীন যেখানে বিশ্বের ২৫ শতাংশ জনগোষ্ঠীর বাস সেখানে বিশ্বের মাত্র ৫ শতাংশ পানি সম্পদের প্রবেশগম্যতার সামর্থ্য রয়েছে যা বৈশ্বিক উষ্ণতার মাত্র ৩.৫% পরিবর্তন ঘটায়।[৭৭]

আমরা বলতে পারি, পরিবেশগত সমস্যাগুলো যেহেতু উৎপাদনের বৈশ্বিকভাবে পরিকল্পিত সামাজিক সম্পর্কের কারণেই ঘটে থাকে, তাই এদের সমাধান করতে হবে গণতান্ত্রিক উপায়ে। এ লক্ষ্যে

আঞ্চলিক, জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে উৎপাদন ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে "সমষ্টিগত মানবীয় শুভের"* নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে । এ ধরনের প্রবৃদ্ধির মূলে কাজ করবে সকলের স্বাধীন সৃজনশীল ক্ষমতার সার্বিক উন্নয়ন। ফলে সকল স্বাধীনতা ও কল্যাণ অর্জিত হবে। আর এ নীতি গ্রহণের জন্য অবশ্যই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে তাদের অব্যাহত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে হবে। পরিবেশবাদীদের জন্য এ বিষয়টি নৈতিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। কেননা পরিবেশবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্যায্য বৈষম্যকে বর্জনের নীতির মধ্য দিয়ে। পরিবেশবাদ সমতাবাদী নীতি গ্রহণ করে যাতে সকল শোষিত সত্তার মুক্তি কামনা করা হয়। একইসঙ্গে, মানবসমাজের ভেতরে ও বাইরের যাবতীয় অন্যায় ও মানবীয় সম্পর্কের শোষণ, বঞ্চনা রুখে দিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করে। এ প্রেক্ষিতে, আমরা উত্তর-দক্ষিণের বৈষম্যের দিকটিকে নৈতিকতার নিরীখে যাচাই করে দেখতে পারি। 'সকল মানুষকে সমানভাবে দেখা উচিত'–পারস্পরিক বিনিময়ের এ নৈতিক ধারণা থেকে শুরু করলে দেখা যাবে যে, উত্তর-দক্ষিণের সম্পর্ক বর্তমানে যে অবস্থানে রয়েছে তাকে ন্যায়ের সমার্থক বলা চলে না। বৈশ্বিক ন্যায়ের ধারণাটি বর্তমানে অভ্যন্তরীণ ন্যায়েরই একটি পরিবর্ধিত রূপ বলে বিবেচিত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় পরিসরে ন্যায়কে সাধারণত তিনটি শর্তের ভিত্তিতে যাচাই করে দেখা হয়। যথা:

ক) পারস্পরিক নির্ভরতার শর্ত,

খ) ন্যূন্যতম অভাবের শর্ত (যদি আমরা আমাদের সম্পদ ভাগাভাগি করে নেই) এবং

গ) যখন আমাদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটে।

এসব শর্ত ছাড়াও যেকোনো সম্ভাব্য মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা বৈশ্বিক ন্যায়ের ধারণাটিকে যে তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করি না কেন একটি বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, উত্তর-দক্ষিণের মধ্যকার সম্পর্ক অন্যায্য ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য সম্পদের পুনর্বণ্টন সুবিন্যস্তভাবে হওয়া প্রয়োজন।

---

* প্রত্যেক মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখে তার মানবীয় সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দান করে যে শুভত্বের নীতি অনুসরণ করা হয় তাকে 'সমষ্টিগত মানবীয় শুভ' বলা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক পরিসরে ধনী ও দরিদ্র রাষ্ট্রের ব্যবধান ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এক্ষেত্রে 'আদর্শ সমতাভিত্তিক পরিবেশ' বা 'কাঙ্ক্ষিত জীবনসম্পৃক্ত সমতা' নীতি অনুসৃত হলে সকলের জন্য সমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করা যায়। তাহলেই সমষ্টিগত মানবীয় শুভ বাস্তবায়িত হবে।

উদারনৈতিক সমতাবাদী রোনাল্ড ডরকিনের*১ দৃষ্টিতে এ ধরনের সমতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে পদমর্যাদার সমতার ভিত্তিতে নয়, বরং সম্পদের সমতার ভিত্তিতে। অপরদিকে, মৌলিক সমতাবাদীরা*২ মনে করেন, সম্পদের সমতার পাশাপাশি উৎপাদনগত প্রাচুর্যের দিকটিকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে পদমর্যাদাগত সমতার পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবো। নৈতিক সমতার এ ধারণাগুলো প্রত্যাখ্যান করে রবার্ট নজিক*৩ বলেন, নৈতিক সমতা মানে ব্যক্তি মানুষের অনধিকার হস্তক্ষেপের হাত থেকে রক্ষা পাবার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এ নীতি অনুযায়ী, উত্তর ও দক্ষিণের মানুষ একে অন্যের ক্ষতিসাধন না করে শান্তিপূর্ণভাবে নিজ স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। সুতরাং, এখানে পুনর্বণ্টনের বিষয়টি উপেক্ষিত।

---

*১ রোনাল্ড মাইলস ডরকিন (১৯৩১-২০১৩) মার্কিন দার্শনিক ও সাংবিধানিক আইনবিশারদ। আইনদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি তাঁর *Sovereign Virtue* গ্রন্থে সমতার ওপর দুটো প্রবন্ধ লিখেছেন। এতে তিনি 'সম্পদের সমতা' নামে এক তত্ত্বের অবতারণা করেন। এ তত্ত্ব দুটো কেন্দ্রীয় ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম ধারণাটি হচ্ছে, মানুষ তার জীবনে যেকোনো পছন্দের বা নির্বাচনের জন্য দায়ী। দ্বিতীয় ধারণাটি হচ্ছে, প্রাকৃতিকভাবে বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রতিভার অধিকারী হওয়া নৈতিকভাবে অযৌক্তিক এবং এটি সমাজে সম্পদ বণ্টনে কোনো প্রভাব ফেলবে না। তাঁর সমতা তত্ত্বের মূলনীতিটি হচ্ছে, সমাজ কাঠামোর প্রেক্ষিতে সব মানুষ মর্যাদা ও গুরুত্বের দিক থেকে সমান।

*২ মৌলিক সমতাবাদীরা উচ্চতা, বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায় প্রভৃতি দিকে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকল মানুষের সমান অংশীদারিত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু মানুষের অধিকার সবসময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। এজন্য মৌলিক সমতাবাদীরা কতগুলো দাবি উত্থাপন করেন। এগুলো হচ্ছে: বিচারকসহ সকল কর্মকর্তাদের মেয়াদসীমা নির্ধারণ, গণভোটের পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের পদক্ষেপ গ্রহণ, করের হার কমানো (অর্থের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ যত কমবে শোষণও তত কমে আসবে), বিচার বিভাগের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ (সুপ্রিম কোর্ট যা বলবে তাই সংবিধান নয়), নাগরিক অধিকার আইন ও নাগরিক কমিশন বাতিল করা প্রভৃতি। তাঁরা মনে করেন, নাগরিক অধিকার আইনে বিশেষ গোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়। রাষ্ট্র এসব আইনকে ব্যবহার করে নাগরিক জীবনে অবাঞ্ছিতভাবে প্রবেশ করে, বিভক্তি সৃষ্টি করে, আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। মৌলিক সমতাবাদীরা একটি বহুত্ববাদী সমাজ এবং নাগরিকদের সমাজ সংস্কারের অধিকারে বিশ্বাসী। ২০১১ সালে মৌলিক সমতাবাদী নিকোলাস ডি. কিস্টফ নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত তাঁর æEquality: A True Soul Food" প্রবন্ধে অর্থনৈতিক অসাম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখেন।

*৩ বণ্টনমূলক ন্যায়তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা রবার্ট নজিক (১৯৩৮-২০০২) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Anarchy, State and Utopia*-তে সমতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। তিনি মনে করেন, দ্রব্যের বণ্টন যদি স্বাধীন বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় তাহলে সমতা অর্জিত হতে পারে। তিনি মানুষকে 'অভীষ্ট' হিসেবে বিবেচনার কান্টীয় ধারণা সমর্থন করেন। জন রল্‌সের মতো তিনিও মনে করতেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা কমিয়ে আনতে হলে সমাজের পশ্চাৎপদ সদস্যদের সবচেয়ে বেশি সুবিধা দিতে হবে। তিনি জন লকের 'প্রাকৃতিক আইন তত্ত্ব' সমর্থন করেন এবং একটি অনাগ্রাসী মূলনীতির সুপারিশ করেন।

কেই নিলসেন[৭৮] এ মতকে ভ্রান্তিমূলক বলে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষের ক্ষতিসাধন করে। পশ্চিমাকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে আন্তর্জাতিক খাদ্যব্যবস্থা কর্মসূচিতে তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু এ বৈষম্যমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উত্তরের বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছে একটি সন্তোষজনক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সমর্থিত হচ্ছে যা কি না ব্যাপক শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত (অবশ্য উত্তরের অনেক মানুষই এ ব্যবস্থার ভুক্তভোগীমাত্র)। তাই নজিকের ন্যায়তত্ত্বটি উত্তর-দক্ষিণের পুনর্বণ্টনের ধারণাটি সংযুক্ত না করলে সম্পূর্ণ হবে না।

নজিকের ন্যায়তত্ত্বের বিপরীতে নিলসেনের দ্বিতীয় আপত্তিটি আরও বেশী মৌলিক। তিনি মনে করেন, শুধুমাত্র অনধিকার হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখাই যথেষ্ট নয়, ন্যায়সঙ্গত সহযোগিতার অধিকারও থাকতে হবে। এ অধিকারগুলো প্রায়শই সংঘাত সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র অনধিকার হস্তক্ষেপে বাধা প্রদানই সত্যিকার স্বাধীনতা দিতে পারে না। প্রকৃত স্বাধীনতা নির্ভর করে ব্যক্তিমানুষের নিজস্ব যৌক্তিক নির্বাচনের ক্ষমতা ও সুযোগের ওপর। কিন্তু এ বিশ্বে এ অধিকারের বাস্তবায়ন খুব কমই দেখা যায়। বরং, এর পরিবর্তে আধিপত্য এবং অধীনতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে, শ্রেণীভিত্তিক সমাজে সবসময়ই ন্যায়সঙ্গত সহযোগিতার অধিকার ও অনধিকার হস্তক্ষেপমুক্ত থাকার অধিকারের মধ্যে সংঘাত বিদ্যমান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা উত্তর-দক্ষিণ বৈষম্যের বিষয়টি পর্যালোচনা করি, তাহলে সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে সমষ্টিগত উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকতে হবে এবং উৎপাদনের উপকরণগুলো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে। এটি সম্ভব না হলে কিছুসংখ্যক মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা চলে যাবে এবং তারা অন্য সবাইকে শোষণ করবে। তাই শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজে আমরা যদি পুঁজিপতির অনধিকার হস্তক্ষেপমুক্ত থাকার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে যাই তা অবশ্যম্ভাবীভাবে অন্য সকলের ন্যায়সঙ্গত সহযোগিতা পাবার অধিকারকে ক্ষুণ্ন করবে। এতে আমাদের অধীনতামুক্ত থাকার অধিকার ও হস্তক্ষেপমুক্ত থাকার অধিকারের মাঝে মৌলিক সংঘাত সৃষ্টি হবে।

একারণে উত্তর-দক্ষিণের ব্যাপক বৈষম্য দূর করতে হলে আমাদের দক্ষিণের দুর্দশা লাঘবের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। তাই দক্ষিণের অনাহার, অপুষ্টি, কর্মসংস্থানের অভাব ও সীমাহীন দারিদ্র্য দূর করতে উত্তরের দেশগুলোকে অবশ্যই দক্ষিণের দেশগুলোর জন্য পুনর্বণ্টনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর এ কাজটি করতে গেলে আমাদের হস্তক্ষেপমুক্ত থাকার অধিকারের তুলনায় ন্যায়সঙ্গত

সহযোগিতা পাবার অধিকারকেই অধিক অগ্রাধিকার দিতে হবে। তারপরেও এ দু'ধরনের অধিকারের মধ্যকার সংঘাতের বিষয়টিকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। এখন সংঘাতের দিকটি পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে।

স্বভাবতই মানুষের কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু মানুষের স্বার্থের কোনো শেষ নেই। তদুপরি, অধিকারগুলোও আমাদের কিছু জীবনসম্পৃক্ত স্বার্থের সঙ্গে প্যারাডাইমীয় সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। এসব স্বার্থের কোনো কোনোটি আমাদের দৈহিক ও নৈতিক সম্পূর্ণতা পরিপূরণ করে। ধরা যাক, একজন মানুষ তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য কাউকে তার কিডনী দান করলো। সমাজের জন্য এ কাজের মূল্য অপরিসীম। কিন্তু এ দান এ কাজে ব্যক্তির শারীরিক সম্পূর্ণতাকে ব্যাহত করে। এ কাজে ব্যক্তির স্বাভাবিক অধিকার কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু উৎপাদনের উপকরণে সমষ্টিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে কখনো ব্যক্তিমানুষের অপরিহার্য কোনো স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয় না। সুতরাং, উত্তর-দক্ষিণ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অপুষ্টি, অনাহার, আধিপত্য, অধীনতা, চরম দারিদ্র্য, অজ্ঞতা (এগুলো যেকোনো ব্যক্তির অপরিহার্য স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত) দূর করার জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্বার্থ অবশ্যই ত্যাগ করা সম্ভব। কেননা ব্যক্তিবিশেষের কেনা-বেচার স্বাধীনতা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে ইচ্ছামতো সম্পদ বৃদ্ধির অধিকার থাকলেও তা কোনো অপরিহার্য বা জীবনসম্পৃক্ত স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

অতএব, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ রুখে দিতে কারও অপরিহার্য কোনো স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজন পড়ে না। এতে কারও সাধারণ অধিকার ক্ষুণ্ন হয় না। কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ (অধিক মুনাফা অর্জন কিংবা প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগ) কমিয়ে আনলেই একটি ন্যায়ভিত্তিক মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে নজিকের ন্যায়তত্ত্বের বিপরীতে নিলসেনের প্রস্তাবিত ন্যায়তত্ত্বটি অধিক সন্তোষজনক বলে মনে হয়। সুতরাং নৈতিক দিক থেকে, মানবতার খাতিরে আমাদের উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে একটি বিস্তৃত পুনর্বণ্টনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

দৃষ্টান্ত সহকারে বিষয়টি উপস্থাপন করা যেতে পারে। আমরা জানি, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে কৃষি। বর্তমানে দীর্ঘ সময় ধরে উত্তরাঞ্চলে অধিক সার প্রয়োগের কারণে উচ্চ

মাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা দেখা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা দেখিয়েছে যে, এ ধরনের কার্যকলাপ কৃষির ওপর কতটুকু প্রভাব ফেলে তা অনিশ্চিত। সম্ভাব্য অর্থনৈতিক লাভ বা ক্ষতি হতে পারে ১০ বিলিয়ন ডলার। কোনো সাধারণ মানুষ এ অর্থের হিসাবকে অনেক বড় মনে করতে পারে। কিন্তু বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখলেই আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় উৎপাদনের মাত্র তিন শতাংশ আসে কৃষিখাতে। এটি ৫.২ ট্রিলিয়নের মধ্যে মাত্র ১৫০ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ১০ বিলিয়ন ডলার মোট জাতীয় উৎপাদনের ০.২%। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিজাত উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ মোট জাতীয় উৎপাদনের ১.৫%।[৭৯] একারণেই নর্ডহাউস[৮০] তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদন হয় যা থেকে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এ co_2 ব্যবহার না করলে তেমন কোনো অর্থনৈতিক ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উত্তরের দেশগুলো যে পরিমাণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড নি:সরণ করছে তা নিতান্তই নগণ্য। এটি তাদের কোনো অপরিহার্য বা জীবনসম্পৃক্ত স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত নয়। কিন্তু কার্বন নিঃসরণজনিত ক্ষতি সমগ্র পৃথিবীর মানুষের অপরিহার্য ও জীবনসম্পৃক্ত স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। তাই মানবজাতির জীবনসম্পৃক্ত স্বার্থ রক্ষার জন্য নিতান্ত নগণ্য মাত্রার কোনো অর্থনৈতিক স্বার্থ পরিহার করাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

এবার তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের জীবনসম্পৃক্ত স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত একটি পরিবেশগত সমস্যার উদাহরণ দেয়া যাক। উইলিয়াম আর. ক্লাইন[৮১] তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডকে সমুদ্রের তলদেশে তলিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষাকল্পে সমুদ্রের পার্শ্বদেশে দেয়াল নির্মাণের পেছনে ২ ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। ২০৯০ সালের মধ্যে বিশ্বের বার্ষিক আয় (GNP) দাঁড়াবে ১১৫ ট্রিলিয়ন ডলার। তাহলে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির পেছনে খরচ দাঁড়াবে বার্ষিক আয়ের মাত্র ২%। এ বিশ্বের ক্রমবর্ধমান বার্ষিক আয়ের তুলনায় এ ভগ্নাংশ নিতান্তই নগণ্য। বেকারম্যান[৮২] উল্লেখ করেছেন: ‘নির্বাচনের যৌক্তিকতা’র (Logic of choices) নীতির ভিত্তিতে বিষয়টিকে যাচাই করা যেতে পারে। পরিসংখ্যানগত দিক থেকে, জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি রোধকল্পে বিশ্ববাসীকে মোট ২০ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করতে হবে। এ সম্পূর্ণ খরচ শুধুমাত্র সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির খরচের চেয়ে

মাত্র ১০ গুণ বেশি। এতে সুস্পষ্টভাবে এ বিশ্বের স্বার্থ জড়িত। বাংলাদেশী বা অন্যান্য বিপদগ্রস্ত দেশের ওপর পুরো ২০ ট্রিলিয়ন ডলারের বোঝা চাপানো সমীচীন হবে না। এ কাজটি বিপদগ্রস্ত দেশগুলোর উপর ৪ ট্রিলিয়ন ডলার (মোট খরচের এক পঞ্চমাংশ) এবং সমগ্র বিশ্ব ১৬ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয়ের মাধ্যমেই সুসম্পন্ন হতে পারে।

এছাড়াও বেকারম্যান তাঁর প্রবন্ধে আরও দেখান, বাংলাদেশী ও অন্যান্যদের সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির এ দুর্ভোগ থেকে রক্ষার জন্য কিছু সহজ পথ খুঁজে বের করতে হবে। তাদের সামগ্রিক আয়ের মাত্রা ক্রমশ বাড়াতে হবে। এভাবে তাদের বিপদগ্রস্ত উপকূলবর্তী এলাকা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সাহায্য করতে হবে। এছাড়া পরিখা নির্মাণ (এর মাধ্যমে ডাচ জনগোষ্ঠীর অর্ধাংশ সমুদ্রস্তরের নীচে বাস করছে) ও বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। এমনকি এসব দেশের জনগণকে অন্যান্য দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ব্যাপকভাবে সুবিধা দিতে হবে।

বেকারম্যান আরও উল্লেখ করেন: নদীস্তরের ব্যাপক হ্রাস-বৃদ্ধির (যা জলবায়ু পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা রাখে না) কারণে বিগত দুই বা তিন দশক ধরে ব্যাপক বন্যা বাংলাদেশের সাধারণ দারিদ্র্যকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তারপরেও বিশ্বের অবশিষ্ট দেশগুলো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। এরূপ সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে এ দেশটিকে যদি গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণের জন্য অর্থ ব্যয় করতে বলা হয় তা হবে নজিরবিহীন পরার্থবাদের দৃষ্টান্ত। বরং, এর পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল কোনো বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আকস্মিক কোনো কার্যক্রম গ্রহণের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপ্রবণ কোনো নীতিমালা গ্রহণ বাংলাদেশ ও বিশ্বের জন্য সন্তোষজনক ফল বয়ে আনবে। এছাড়া ভূমিক্ষয়ের ফলে প্রতিবছর যে পরিমাণ ভূ-খণ্ড হারিয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষতি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতির তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। বেকারম্যান মনে করেন, এ বিশ্বে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নি:সরণ কঠোরভাবে কমিয়ে আনার চেয়ে ভূ-খণ্ড হ্রাস পাবার প্রবণতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সমস্যাটি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, ভূমিক্ষয়জনিত কারণে দেশটির অর্ধাংশ সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, বন্যার কারণে সৃষ্ট চরম দারিদ্র– এসবই মানুষের

জীবনসম্পৃক্ত অপরিহার্য স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনরক্ষার জন্য যদি বিশ্বের ধনী দেশগুলো তাদের কম গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থত্যাগ (সামান্য অর্থ সাহায্য যা তাদের আয়ের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য) করে তাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কিন্তু এর বিনিময়ে কোটি কোটি মানবপ্রাণ (যার স্বত:মূল্য রয়েছে) রক্ষা পাবে। এতে সহযোগিতা পাবার অধিকারটির বাস্তবায়ন ঘটবে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, নজিক প্রস্তাবিত অনধিকার হস্তক্ষেপমুক্ত থাকার অধিকারই মানবপ্রজাতির জটিল ও সংঘাতমূলক সমস্যা-সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়। এখন ধনী দেশগুলোরই কেন গ্রীনহাউস নি:সরণে প্রধান ভূমিকা রাখা উচিত?– এর সপক্ষে কিছু যুক্তি উপস্থাপন করা যেতে পারে–

প্রথমত: উন্নয়নশীল দেশগুলো শিল্পায়িত দেশের তুলনায় অনেক কম শক্তি খরচ করে। যেমন: চীন সমগ্র বিশ্বের বড়জোর শতকরা ১০% কার্বন-ডাই-অক্সাইড নি:সরণ করে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেকেরও কম।

দ্বিতীয়ত: শিল্পায়িত দেশগুলো বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে খুব কমই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তৃতীয়ত: শিল্পায়িত দেশগুলো তাদের সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড রোধের ব্যয়বহুল পদক্ষেপ নিতে চায় না। কিন্তু এসব দেশেরই এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের ব্যয়ভার নির্বাহ এবং অন্যান্য দেশকেও তাদের কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের সামর্থ্য আছে।

চতুর্থত: উন্নয়নশীল দেশগুলোকে গ্রীনহাউস গ্যাস নিরোধে যে বিপুল স্বার্থত্যাগ করতে হবে তাতে তাদের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণই বিঘ্নিত হয়ে পড়বে।

উপর্যুক্ত কারণে শিল্পায়িত দেশগুলোর নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে গ্রীনহাউস নি:সরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং অনুন্নত দেশগুলোকে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে লক্ষ্য করা যায়, শিল্পোন্নত দেশগুলো গ্রীনহাউস নির্গমন ও জ্বালানি তেল ভোগের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু এতে সাধারণ জনগণের কোনোই উপকার হয় না। তাই সরকার যদি এ কার্যক্রমের উপর করারোপ করে, তাহলে এ অর্থ কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদনকারী উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহযোগিতায় ব্যয় করা যেতে পারে। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য সাহায্য সংস্থায় মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর কার্বন প্রশমনে কোনো অর্থ সাহায্যই প্রদান করে না। এমনকি

জাতিসংঘের সাম্প্রতিক বার্ষিক বাজেট সম্মেলনগুলোতে এ লক্ষ্য অর্জনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যপুষ্ট এ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে বহুবার অনুরোধ জানানো হলেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। নর্ডহাউস দেখিয়েছেন, বিশ্বের সর্বাধিক কার্বন নি:সরণকারী দেশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এ বিশ্বের ৫০% কার্বন নি:সরণের জন্য ১০০ বিলিয়ন ডলার কর প্রদান করা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে যুক্তরাষ্ট্র কখনোই এ পরিমাণ অর্থ প্রদান করেনি।

এসব কার্যক্রম প্রমাণ করে, শোষক সমাজের প্রতিভূ উন্নত দেশগুলো তাদের নিজস্বার্থে সুবিধামতো আইন প্রণয়ন করে যাতে করে কেবল তারাই এর সুফল ভোগ করে। এসব শিল্পায়িত রাষ্ট্রগুলো চূড়ান্ত মানবকল্যাণের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের আপেক্ষিক অবস্থান নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে এবং স্বাতন্ত্র্যবাদী মানসিকতার পরিচয় দেয়। এ কারণে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে তারা পরিবেশগত প্রশ্নকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থান সংহত করার একটা উপলক্ষ্য বলে গণ্য করে। তাই আন্তর্জাতিক পরিবেশগত আলাপ-আলোচনায় রাষ্ট্রগুলোর আপেক্ষিক লাভ-ক্ষতির উত্তেজনাকর কথাবার্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। এক্ষেত্রে একদিকে আঞ্চলিকতাবাদের কারণে অনেকসময় বিশেষ কিছু রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। অপরদিকে, ভৌগোলিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাজনীতি পরিবেশগত অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। যেমন, মিশর যত সহজে পাশ্চাত্যের নীতিনির্ধারকদের বৈশ্বিকভাবে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতে পারে, সে তুলনায় বাংলাদেশের মানুষের দুর্দশা ও পরিবেশগত হুমকি নীতিনির্ধারকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় না।

পরিবেশগত আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থা (যেমন: IMO*), বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা, বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক কমিশন (যেমন: জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী (UNEP), আঞ্চলিক সমুদ্র সংঘ, বা মৎসচাষ বা দূষণ কমিশন। তাদের আলাপ-আলোচনার কৌশল হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইন কমিশনকে উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত পরিহার করে রাজনৈতিক কোরামের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করা। এক্ষেত্রে সবসময়ই গ্রহণযোগ্য সমাধানে বাধা প্রদান করা হয়। একজনমাত্র লেখক ও অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির মাধ্যমে অভিনব কূটনৈতিক কৌশলের

* International Maritime Organization

ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। UNEPর আঞ্চলিক সমুদ্র ও ওজোন সম্মেলনে প্রথমদিকে চুক্তির যে রূপরেখা প্রণয়ন করা হতো তা সাধারণ বচনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হতো এবং স্বাভাবিকভাবে তাতে সাধারণ কর্তব্যের নির্দেশনা স্থান পেতো। কিন্তু বর্তমানে তা প্রকাশিত হচ্ছে বিশেষ কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে অত্যন্ত কঠোর নীতিমালার মাধ্যমে। সাধারণভাবেই আমরা বলতে পারি, শুধুমাত্র বিশেষ কোনো রাষ্ট্রের কোনো অংশের ব্যক্তিনিষ্ঠ বিশ্বাসকে আইনগত বাধ্যবাধকতায় পর্যবসিত করা ন্যায়সঙ্গত হবে না। যেমন: ICJ[*১] পারমাণবিক পরীক্ষণকে অপরিহার্য বলে বিবেচনা করে। ফ্রান্স এ নীতির বিপরীতে ঘোষণা করে যে, আর কোনো বায়ুমণ্ডলীয় পারমাণবিক পরীক্ষণ পরিচালনা করা যাবে না।

UNEP ১৯৮৫ সালের ওজোন সম্মেলনে আলাপ-আলোচনার জন্য ফোরাম গঠন করে এবং পরবর্তীতে খসড়া চুক্তি প্রণয়ন করে। ১৯৮৯ সালে ব্যাসেল সম্মেলনে ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য ও তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং সীমানা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা চলে।[৮৩] কিন্তু উন্নত দেশগুলোর স্বার্থের বিভক্তির কারণে এসব বিষয়ে ঐকমত্যে আসতে প্রভূত রাজনৈতিক সমস্যায় পড়তে হয়। কখনো কখনো UNCHE[*২] ও UNCLOS[*৩] উভয়ই দ্বিমুখী নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। যেমন, ওজোন চুক্তিতে উন্নত দেশগুলো ওজোন স্তরের ক্ষতির কথা চিন্তা করে কিছু গ্যাসের ব্যবহার হ্রাস করে। পক্ষান্তরে, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এসব গ্যাসের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে চীনে রেফ্রিজারেটরের সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত দেশগুলোর একদেশদর্শীতারই পরিচয় বহন করে। উপরন্তু, উন্নয়নশীল দেশগুলো ICJ-র কার্যক্রমকেও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। কারণ কথিত আছে যে, তারা পাশ্চাত্যের প্রতি দুর্বল।

উপর্যুক্ত কার্যবিধি প্রমাণ করে যে, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিচারালয়— সবকিছুই শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কিন্তু মানবতার দাবি কখনোই এর দীর্ঘায়ন দেখতে চায় না। একটি অধিক ন্যায়সঙ্গত, মার্জিত, সুসভ্য ও মানবিক বিশ্ব গঠনের জন্য সব ধরনের অধিকার সংরক্ষিত হোক– এ দাবি এখন গণমানুষের। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপযোগবাদী উদ্দেশ্য নিত্যনতুন স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নতুন ধরনের নৈতিক চাহিদার জন্ম দিচ্ছে। কিন্তু আমরা স্পষ্টত:ই

[*১] International Court of Justice

[*২] United Nations Conference on the Human Environment

[*৩] United Nations Conventions of the Law of the Sea

বুঝতে পারি যে, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক মানুষ পরস্পর সংঘবদ্ধ হয়ে মানবতার কল্যাণে নৈতিক মূল্যবোধের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করবে– একথার কোনো ব্যবহারিক কার্যকারিতা নেই। ঐতিহাসিক বাস্তবতা বিবেচনায় আনলে এ সত্যেরই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ নৈতিকতাবোধ থেকে বাস্তব রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যবহারিকভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। আইনগত ক্ষেত্রেও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। আইনগত ক্ষেত্রেও দেখা যায়, ক্ষমতাবান শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি হলেই আইনের বাস্তব প্রয়োগে সমস্যা দেখা দেয়। তাই এখন আইনগত কাঠামো পুনর্বিন্যাসের যে দাবি উঠছে যাতে আইনবিদ্যার ত্রুটিগুলো সংশোধিত হয়। একারণেই মার্কস[৮৪] বলেছিলেন, শোষক শ্রেণী সবসময় নিজেদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করে এবং তাকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তাই সাধারণ ও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলা যায়, আন্তর্জাতিক রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতার প্রকাশমাত্র। এ নগ্ন ক্ষমতার অন্তরালে আদর্শ হচ্ছে মুখোশমাত্র। অর্থাৎ পুঁজিবাদ যে সমতার কথা বলে তা হচ্ছে আইনগত সমতা। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, এ অসমতাই শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বিভক্ত করেছে।

এক্ষেত্রে লেনিনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন: “বুর্জোয়া গণতন্ত্র সাধারণভাবে ব্যক্তি মানুষের সমতার যে দাবি করে তা সম্পত্তির মালিক ও প্রলেতারিয়েত, শোষক ও শোষিতের মধ্যকার এক ধরনের আকারগত বা আইনসিদ্ধ সমতা। এর মধ্য দিয়ে মূলত শোষিত শ্রেণীকে প্রতারিত করা হয়।”[৮৫] সত্যিকারার্থে আইনগত সমতা প্রকৃত সমতা নয়। এর পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন সম্ভব নয়। শুধুমাত্র মানুষের মধ্যে প্রকৃত সামাজিক সমতার উপর ভিত্তি করেই আইনগত সমতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আজকের দিনের সামাজিক-রাজনৈতিক, বর্ণগত ও জাতিগত বৈষম্য প্রমাণ করেছে যে, পুঁজিবাদ মানুষকে ন্যূনতম কাঠামোগত ও আইনগত সমতা প্রদান করতেও ব্যর্থ হয়েছে। তাই বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ বিমূর্তভাবে এ সমস্যার সমাধান না দিয়ে মূর্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একে ব্যাখ্যা করে। এ মতবাদ অনুসারে, সমতা কোনো আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো বহির্ভূত বিষয় নয়। মার্কসীয়-লেনিনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, সমতা কোনো বিশেষ শ্রেণীর কিছু আইনগত বিশেষাধিকারের স্বীকৃতি নয়, বরং এ শ্রেণী সম্পর্কের বিলোপসাধনের মাধ্যমে সব ধরনের সামাজিক ও শ্রেণী বৈষম্যের সম্পূর্ণ অবলুপ্তির মধ্য দিয়েই শ্রেণীহীন

সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এভাবেই সামাজিক সমতার ভিত্তিতে সাম্যবাদী সমাজ গড়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গে লেনিন বলেন, " শ্রেণীগুলোর বিলোপসাধন করতে না পারলে সমতা একটি ফাঁকাবুলিতে পরিণত হবে। আমরা শ্রেণীগুলোকে বিলুপ্ত করতে চাই, এদিক থেকে আমরা সমতার পক্ষে। কিন্তু আমরা সব মানুষকে একইরকম দেখতে চাই, এ দাবি নিতান্তই অর্থহীন... ।"[৮৬]

অর্থাৎ, মানুষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও সামর্থ্যগত দিক থেকে ভিন্নতা থাকলেও সকলের সমান অধিকার ও সুযোগ থাকতে হবে। আর এভাবেই সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। পরিবেশগত ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের মানুষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও সামর্থ্যগত ভিন্নতা থাকলেও বেঁচে থাকার অধিকার সকলেরই সমান। এজন্য নীতি-নির্ধারণ ক্ষেত্রে সকলেরই সমান অংশগ্রহণ থাকা উচিত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, কিছু উন্নত দেশ বৈশ্বিক উষ্ণতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে মুনাফা লুটতে চায়। শিল্পায়িত দেশগুলোর অর্থনৈতিক অভিঘাত অনিয়ন্ত্রিত থাকে অথবা সামান্যতম সংযতভাবে পরিবর্তন করা হয়। গ্রীনহাউস গ্যাসের নি:সরণ খুবই সামান্য পরিমাণে কমানো হয়। তাছাড়া প্রযুক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর দেশগুলো পরিবেশ উন্নয়নে নেতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। যদিও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিবেশগত উন্নয়ন ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে সকল জাতির সংযত আচরণ একান্ত কাম্য বলে বিবেচিত। কিন্তু বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো নিজেদের সব ধরনের আইনের আওতা থেকে মুক্ত বলে মনে করে। তারা প্রধান দূষণকারী দেশ হলেও যেকোনো সফল আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা তাদের হাতে ন্যস্ত থাকে। ১৯৮৭ সালের মন্ট্রিল সম্মেলনে নীতিমালা প্রণয়নে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার কথা বলা হলেও চীন ও ভারত কোনো ভূমিকা রাখতে গেলে তাদের বাধা দেয়া হয়েছে। এ কৌশল অবলম্বন করেই সিএফসির বৃহত্তম উৎপাদক দেশগুলো ওজোন স্তর হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

অপরপক্ষে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বিষয়ক গবেষণা মূলত উন্নত দেশের বিজ্ঞানীদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলো তাই স্বাভাবিকভাবেই বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের দাবি সম্পর্কে সন্দিগ্ধ থাকে। কারণ বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় সবসময়ই উন্নত দেশগুলোর স্বার্থে কাজ করে। ১৯৮২ সালের জাতিসংঘ সম্মেলনে জটিল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী বহুপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা সমুদ্র আইনের অন্তর্ভুক্ত। এখানে 'রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্বের সমতা'র একটি কৃত্রিম ধারণা সৃষ্টি করা হলেও কার্যক্ষেত্রে এক জাতি, এক-

ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কার্যকর হয়। ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে হেগে অনুষ্ঠিত এক সভায় ২০টির অধিক সরকার এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন যে, 'অধিকাংশ নির্গমন যা বর্তমানে পরিবেশকে প্রভাবিত করছে তার উৎস হচ্ছে শিল্পায়িত দেশগুলো'। এজন্য এসব জাতির বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাহায্য করার।[৮৭] কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, সাহায্যের নামে উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশের ওপর অতিরিক্ত খরচের বোঝা চাপায়।

উন্নত রাষ্ট্রগুলো পৃথিবীর বাসযোগ্যতার পরিবর্তে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বেশী গুরুত্ব দেয়ায় পরিবেশ সমস্যা ক্রমশ প্রকটতর হয়ে উঠছে। ২০০৯ সালের কোপেনহেগেন সম্মেলনের শুরুতে অনেক উচ্চাশার কথা ব্যক্ত করা হলেও শেষ দিনে হতাশার মধ্য দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। সম্মেলন চলাকালে ডেনমার্কসহ সারা বিশ্বে ব্যাপক বিক্ষোভ সংঘটিত হয়। বিক্ষুব্ধ মানুষের দাবি ছিল, ২০২০ সালের মধ্যে উন্নত দেশগুলোকে ৪০% কার্বন নি:সরণ কমিয়ে আনতে হবে এবং দরিদ্রতম দেশগুলোকে পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের লক্ষ্যে ১৫০ বিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য বরাদ্দ করতে হবে। এসময়ে ক্লিমাফোরামের উদ্যোগে ৫০,০০০ মানুষের উপস্থিতিতে একটি বিকল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর পরিবেশবাদীরা Peoples Climate Summit নামে এক ঘোষণা দেন। এতে জলবায়ু পরিবর্তনের বদলে অবকাঠামো পরিবর্তনের দাবি জানানো হয়। কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত এ প্রতিবাদ সভায় অভিযোগ করা হয়, উন্নত দেশগুলো এক ধরনের রুদ্ধদ্বার বৈঠকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কোনোই অভিমত গ্রহণ করা হয় না।

এজন্যই সাম্প্রতিককালে পরিবেশবাদীরা বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে জোরালো অর্থনৈতিক ও সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান। তারা মনে করেন, পরিবেশ সম্মেলনগুলো মূলত উন্নত দেশগুলোর জন্যই ব্যর্থ হয়। অপরদিকে, উন্নত দেশগুলো চীন, ভারতসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার জন্য দায়ী করে। এতে করে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন-ভারতের বিরোধে ক্ষতির শিকার হচ্ছে বাংলাদেশসহ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপরাষ্ট্রগুলো। অন্যদিকে, উন্নত ও ধনী রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রগুলোকে নানারকম সহযোগিতার আশ্বাসের নামে নিজেদের পছন্দমতো চুক্তি মানানোর অপচেষ্টাও চালাচ্ছে। তাই কোপেনহেগেন ও কানকুনের পর ২০১১ সালের

ডারবান সম্মেলনের ব্যর্থতা ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। ২০১৪ সালের লিমা সম্মেলনেও দরিদ্র দেশগুলোর সমস্যার কোনো সুরাহা হয়নি। তারা জলবায়ু তহবিল থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেছে।

পরিবেশক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য সমতার নীতির বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ন্যায় প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে সমতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। স্বাধীনতা ও সমতার আদর্শের সঙ্গে ন্যায়ের ধারণাটি অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। আর অধিকার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কখনোই স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে না। তাই ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোর অগণিত মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন করে পরিবেশগত অগ্রগতি সাধিত হবে না। এ বিষয়টি বিবেচনা করেই Worldwide Fund for Nature এর সভাপতি কিম কোর্সটেন[৮৮] মন্তব্য করেন: নিছক নিরুদ্দম অঙ্গীকার আমাদের এ গ্রহকে বিপজ্জনক জলবায়ু পরিবর্তন থেকে রক্ষা করার জন্য পর্যাপ্ত নয়। এ সংকট নিরসনে ধনী-দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার নতুন পথ খুঁজে বের করতে হবে। এখন আমাদের একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। একযোগে কাজ করলে অর্ধবর্ষেই সাফল্য অর্জন সম্ভব, সেখানে আমরা বহু বছর আলাপ-আলোচনার পরেও অস্পষ্ট উপকরণের ভিত্তিতে স্থুল সব মূলনীতি প্রণয়ন করেছি। এ লক্ষ্যে উপনীত হলে স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি কার্যকর করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য দ্রূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এ গ্রহ ও তার জনগণকে রক্ষাকল্পে এছাড়া কোনো পথ খোলা নেই।

মন্তব্য

বর্তমান বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। এই জনগোষ্ঠীর বেশীর ভাগই বাস করে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায়। উন্নত ও অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসাম্য ক্রমশ তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তাই প্রতিনিয়তই দাবি উঠেছে একটি ন্যায়সঙ্গত বিশ্বব্যবস্থার। বিশ্বজনীনতার উদার আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানুষ কখনোই সংকীর্ণতা ও নিপীড়নের পক্ষে রায় দিতে পারে না। মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে জীববৃত্তি, মানবতা ও ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান। জীববৃত্তির কারণে সে যেমন আত্মসংক্ষরণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তেমনিভাবে আপন ব্যক্তিসত্তার প্রভাবে নৈতিক আচরণে প্রবৃত্ত হয়। সর্বোপরি, মানবিকতার কারণে সে সমগ্র বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণীকে ‘উদ্দেশ্য’ হিসেবে বিবেচনা করে, নিছক ‘উপায়’ হিসেবে নয়। আর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তা

সবসময় মানবসত্তাকে 'উপায়' হিসেবে গণ্য করে। এতে সবসময়ই মানবিকতার দাবি উপেক্ষিত হয়। অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবাদের শোষণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম তৃতীয় বিশ্বের অগণিত মানুষের স্বাভাবিক আত্মসংরক্ষণের অধিকারকেও ক্ষুণ্ন করছে। এ বিশ্বে শান্তি আনতে হলে অবশ্যই সর্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় অধিকার প্রণয়ন করতে হবে এ সর্বজনীন মানবাধিকারের স্বীকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে। তাই সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী তৎপরতা এর অন্তর্নিহিত নিষ্ঠুরতার জন্য কখনোই নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

মানুষের সবসময়ই মনে রাখা উচিত, তাদের মধ্যে যতই ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য থাকুক না কেন তারা একই মানব প্রজাতিরই সদস্য। সাম্রাজ্যের সমর্থকরা, যারা কি না বিদেশী সমাজের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য নিজেদের লাভজনক ধ্বংসযজ্ঞকে বৈধতা দিতে চায়, তারা একথা উপলব্ধি করতে অক্ষম। কিন্তু গোষ্ঠীগত স্বার্থপরতার কাছে কখনোই মানবতার দাবি দীর্ঘকাল অবদমিত হয়ে থাকতে পারে না। এ বিশ্বের অগণিত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এ বাস্তবতারই প্রতিফলন বহন করে।

তথ্যসূত্র

১। *দৈনিক প্রথম আলো*, "নোয়াম চমস্কির সঙ্গে সংলাপ: বিষয় সামরিক শাসন", ২০০৭, ৫ মে: ১২।

২। *প্রাগুক্ত*।

৩। *প্রাগুক্ত*।

৪। William I. Robinson, *Promoting Polyarchy : Globalization, U.S Intervention and Hegemony*, Great Britain : Athenaeum Press, 2nd ed., 1998, p. 79

৫। আনু মুহাম্মদ উদ্ধৃতি দেন বার্ট্রান্ড রাসেলের *War Crimes in Vietnam* (London, 1967) গ্রন্থ থেকে, তাঁর *পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ এবং অনুন্নত বিশ্ব* গ্রন্থে, ২০০৬, পৃ. ১২৭।

৬। আনু মুহাম্মদ উদ্ধৃতি দেন বার্ট্রান্ড রাসেলের *War Crimes in Vietnam* (London, 1967) গ্রন্থ থেকে, তাঁর *পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ এবং অনুন্নত বিশ্ব* গ্রন্থে, ফেব্রুয়ারী ২০০৬, পৃ. ১২৮।

৭। আনু মুহাম্মদ, *পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ এবং অনুন্নত বিশ্ব*, ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ২০০৬, পৃ. ১১৬।

৮। মাইকেল প্যারেন্টি, অনু. ওমর তারেক চৌধুরী, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা : শ্রাবণ প্রকাশনী, জুলাই ২০০৫, পৃ. ১১২।

৯। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১।

১০। Michael J. Clair, *Blood and Oil : The Dangers and Consequence of America's Growing*, New York: Henry Holt, 2004.

১১। Alan Greenspan, *The Age of Turbulence*, London : Penguin, 2007.

১২। *দৈনিক যুগান্তর*, "রবার্ট ফিস্কের কলাম" (কাউন্টারপাঞ্চ থেকে ভাষান্তরিত), ২০০৭, ১২ জুন।

১৩। *দৈনিক প্রথম আলো*, "বেসামরিক ইরাকিদের হত্যার ঘটনায় ব্ল্যাক ওয়াটার জড়িত", (*নিউইয়র্ক টাইম্স* এর প্রতিবেদন অনুসরণে), ২০০৭, ৪ অক্টোবর : ১০।

১৪। *দৈনিক প্রথম আলো*, "পৃথিবীব্যাপী শরণার্থীর সংখ্যা বাড়ছে", ২০০৭, ২০ জুন : ১০।

১৫। *দৈনিক প্রথম আলো*, "রবার্ট ফিস্কের কলাম", (লন্ডনের *দি ইনডিপেন্ডেন্ট* থেকে ভাষান্তরিত), ২০০৭, ২ সেপ্টেম্বর : ১২।

১৬। *দৈনিক প্রথম আলো*, "ইরাকে রাস্তায় পড়ে থাকে মরদেহ, চরম দুর্দশা, হাসপাতাল কর্মীরা পালিয়ে যাচ্ছেন : রেডক্রস", ২০০৭, ১২ এপ্রিল : ১০।

১৭। John Mackenzie, *A Manual of Ethics*. London : University Tutorial Press, T.D.A. 6th editions, 1964, p. 291.

১৮। Immanuel Kant, Tr. by H.J. Patton, *Ground Work of the Metaphysic of Morals*, New York : Harper & Row, 1964.

১৯। J.S. Mill, *Utilitarianism*, New York : Everyman's Library, 1964.

২০। ইমানুয়েল কান্ট, অনু. সাইয়েদ আব্দুল হাই, *নৈতিকতার দার্শনিকতত্ত্বের মূলনীতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ৯৮।

২১। আনু মুহাম্মদ, *পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ এবং অনুন্নত বিশ্ব*, পৃ. ১২১।

২২। *দৈনিক প্রথম আলো*, "রামজি বারুদের কলাম", (আল-জাজিরা ডট নেটের সৌজন্যে প্রাপ্ত), ২০০৭, ১৩ সেপ্টেম্বর : ১২।

২৩। মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৭১-৭২।

২৪। *দৈনিক প্রথম আলো*, "নাইজেরিয়ায় মার্কিন ওষুধ কোম্পানি ফাইজারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের", ২০০৭, ৬ জুন : ১০।

২৫। পিটার সিঙ্গার, অনু. প্রদীপ কুমার রায়, *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৪।

২৬। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।

২৭। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।

২৮। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।

২৯। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮।

৩০। *দৈনিক প্রথম আলো*, "নির্যাতনের আধুনিক পদ্ধতি", ২০০৭, ১৪ ডিসেম্বর : শুক্রবারের সাময়িকীর চলতি বিশ্ব পাতা।

৩১। Michael Parenti, *Against Empire*, New York : City Light Book House, 1995.

৩২। মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৪০-৪১।

৩৩। *দৈনিক প্রথম আলো*, "গুয়ানতানামোয় বৃটিশ নাগরিককে নির্যাতনের অভিযোগ", ২০০৭, ২১ আগস্ট : ১১।

৩৪। *দৈনিক প্রথম আলো*, "ওরা কোথায় গেল!", ২০০৭, ২৭ জুলাই : শুক্রবারের সাময়িকীর চলতি বিশ্ব পাতা।

৩৫। *দৈনিক প্রথম আলো*, "বিশ্বায়নবিরোধীদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ", ২০০৭, ১০ জুন : ১০।

৩৬। মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ১৭৮।

৩৭। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০।

৩৮। Universal Declaration of Human Rights. available from www.un.org.

৩৯। G.W.F Hegel, *Philosophy of Right*, Tr. Dyde, S.W., Canada : Batoche Books Limited, 2001.

৪০। শেখ আবদুল ওয়াহাব, *কান্টের নীতিদর্শন*, (ইমানুয়েল কান্ট রচিত *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* এর বাংলা অনুবাদসহ কান্টের নীতিদর্শনের ব্যাখ্যা ও আলোচনা), ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ১৯৮২, পৃ. ২৫৩।

৪১। পিটার সিঙ্গার, *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা*, পৃ. ২১১।

৪২। *প্রাগুক্ত*।

৪৩। Raul Prebisch, æThe Latin American Periphery in the Global System of Capitalism", in *Human Resources, Employment and Development IEA*, Vol. I, 1983, p. 30-32.

৪৪। আনু মুহাম্মদ, *পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ এবং অনুন্নত*, পৃ. ২৫

৪৫। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩২

৪৬। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩।

৪৭। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬-০৭

৪৮। *প্রাগুক্ত*।

৪৯। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০।

৫০। হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ১৬৬-৬৭।

৫১। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮।

৫২। শেখ আবদুল ওয়াহাব, *কান্টের নীতিদর্শন*, পৃ. ২৫৬-৫৭।

৫৩। মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৯৯।

৫৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১।

৫৫। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪-০৫।

৫৬। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫-০৬।

৫৭। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬-০৭

৫৮। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩-১৪।

৫৯। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫-১৬।

৬০। John Rawls, *Theory of Justice*, U.S.A : Harvard University Press, 1971, p. 4.

৬১। Thomas Hill Green, *The Principles of Political Obligations*, (With an introduction by Lord Lindsay), London : Longmans, 1960.

৬২। E. Barker, *Political Thought in England. 1948-1914*, London: Oxford University Press, 1963, p. 33.

৬৩। John Stuart Mill, *Principles of Political Economy*, (Edited with an introduction by Stephen Nathanson), Indianapolis & Cambridge: Hacket Publishing Company Inc., 2004.

৬৪। বদরুদ্দিন উমর, *সাম্রাজ্যবাদের নোতুন বিশ্বব্যবস্থা*, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫, পৃ. ৪০।

৬৫। মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৭২-৭৩।

৬৬। বদরুদ্দিন উমর, *সাম্রাজ্যবাদের নোতুন বিশ্বব্যবস্থা*, পৃ. ৪৯।

৬৭। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০।

৬৮। Kenneth Piddington, æThe Role of the World Bank", in Andrew Hurrell and Benedict Kingsbury (eds.), *The International Politics of the Environment*, Oxford : Clarendon Press and New York : Oxford University Press, 1992, p. 217.

৬৯। *Ibid*, p. 218.

৭০। *Ibid*, p. 224.

৭১। *Ibid*, pp. 225-26.

৭২। Beijing Declaration. Para 6.

৭৩। Harold H. Titus, *Ethics for Today*, U.S.A : American Book Company, 2nd ed., 1954, pp. 375-76.

৭৪। *Ibid*, p. 500.

৭৫। Richard N. Cooper, æUnited States Policy towards the Global Environment", in *The International Politics of the Environment*, 1992, pp. 290-312.

৭৬। Wilfred Beckerman, æGlobal Warming and International Action : An Economic Perspective”, in *The International Politics of the Environment*, 1992, pp. 253-289.

৭৭। Andrew Hurrell and Benedict Kingsbury, æThe International Politics of the Environment : An Introduction”, in *The International Politics of the Environment*, 1992, p.41.

৭৮। Kai Nielsen, æGlobal Justice, Capitalism and the Third World”, in Robin Attfield & Barry Wilkins (eds.), *International Justice and the Third World*, London: Routledge, 1992, pp. 29-31.

৭৯। Wilfred Beckerman, æGlobal Warming and International Action : An Economic Perspective”, in *The International Politics of the Environment*, pp. 262-63.

৮০। W.D. Nordhaus, æThe Economic Policy making in the Face of Global Warming”, This paper presented to MIT conference on Energy and the Environment, Mar. 1990, p. 10.

৮১। William R. Cline, *Political Economy of the Greenhouse Effect, Preliminary draft*, Washington, DC : Institute for International Economics, Aug. 1989, p. 18.

৮২। Wilfred Beckerman, æGlobal Warming and International Action : An Economic Perspective”, in *The International Politics of the Environment*, pp. 266-267.

৮৩। Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal concluded at Basel, 22 Mar. ILM 28, 1989, 657.

৮৪। Karl Marx, & Frederick Engels, *Manifesto of the Communist Party*, in *Selected Works* in two volumes, Moscow: Foreign Language Publishing House, 1962.

৮৫। V.I. Lenin, Tr. and Ed. by Julias Kutzer, *Collected Works*, Moscow : Progress Publishers, Vol. 31, 2012, p. 145.

৮৬। V.I. Lenin, Tr. & Ed. by George Hanna, *Collected Works*, Moscow: Progress Publishers, Vol. 29, 2011, p. 358.

৮৭। The declaration of the Hague was signed on 11 Mar. 1989, by 24 Prime Minister or Ministers, 11 of them were heads of government or cabinet officers of OECD member states.

৮৮। David Batty, Copaenhagen reaction delegates speaks, London : *The Gardian*, Retrieved 22 December, 2009.

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদের পরিণাম ও একটি বিশ্ববিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতা

সাম্প্রতিক বিশ্বায়ন পর্বে এসে সাম্রাজ্যবাদ আরও বেশি বিস্তৃত ও শোষণমূলক রূপ পরিগ্রহ করেছে। ভৌগোলিকভাবে বলতে গেলে, পুঁজিবাদের অসম চরিত্র ধনী অঞ্চলকে আরও ধনী করেছে এবং দরিদ্র অঞ্চলগুলোকে আরও দরিদ্র করেছে। বিভিন্ন বৈশ্বিক সংস্থা গঠন করে সম্পদের অসম বিনিময় ব্যবস্থাকে কার্যকর রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদ যে কৌশল অবলম্বন করেছে তা তাকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের বিচারে পুঁজি পুঞ্জীভবনের একটি বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিণত করেছে। আন্তর্জাতিকতাবাদের ছদ্মাবরণে প্রকাশিত হলেও আজকের দিনে নব্য রক্ষণশীলতাবাদী নীতির অনুসারী পুঁজিবাদের আগ্রাসী শোষণমূলক চরিত্রই প্রতিফলিত হচ্ছে। তাই উদারবাদী অর্থনৈতিক তত্ত্বের আড়ালে কাজ করছে নব্য রক্ষণশীলতাবাদ। পুঁজির পুঞ্জীভবনের ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই রাজনৈতিক ক্ষমতার বৃত্ত প্রস্তুত হয়। পুঁজি পুঞ্জীভবনের এই সীমাহীন প্রবণতা পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে বেশকিছু সংকট সৃষ্টি করে এবং এ সংকট পর্যবসিত হয় সমাধানহীন এক বিশৃঙ্খলায়।

মার্কসীয় বিশ্লেষণ অনুযায়ী, পুঁজি নিজে কখনোই এ সংকটের সমাধান দিতে পারে না, বরং একে আরও তরান্বিত করে। কিন্তু মার্কসের সময়কার প্রাথমিক পুঞ্জীভবন এখন বিস্তৃত হয়ে বৈশ্বিক পরিসরে শ্রম শোষণ করছে। পুঁজির বিশ্বায়ন যে ভারসাম্যহীনতা ও অস্থিরতার জন্ম দিচ্ছে কোনো উদারবাদী ও নব্য-উদারবাদী অর্থনীতিবিদ তার সমাধানের পথ বাতলে দিতে পারছেন না। তাই নব্য-উদারতাবাদের শেষ ত্রিশ বছরে সামাজিক অসমতা সর্বোচ্চ মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানেও মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর। তিনি বলেছিলেন, অতি পুঞ্জিভবনের পুরনো সংকটই এই ক্রমবর্ধমান অস্থিতিশীলতার উদগাতা।

পুঁজির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব

পুঁজিবাদের প্রধানতম অভ্যন্তরীণ সংকটটি নিহিত আছে অতি-উৎপাদনের মধ্যে। অতি উৎপাদনের পরে স্বাভাবিকভাবে পুঁজির স্বার্থে বেশ কিছুদিন আর উৎপাদনের প্রয়োজন পড়ে না। ফলে শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে ওঠে মুনাফালোভী পুঁজিবাদের একমাত্র অবলম্বন। এর অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে দেশজুড়ে বেকারত্ব, দারিদ্র,

অস্থিরতা, জনসেবা খাতগুলোর স্থবিরতা। তাই পুঁজিবাদের নিহিতার্থই হচ্ছে বিপুল তেজীভাবের পর মন্দা বা সংকটের মুখোমুখি হওয়া। লেনিন তাঁর *সাম্রাজ্যবাদ* গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের তেজীভাবের পর ১৯০০-০৩ সালে কীভাবে সংকট দেখা দেয়। সে সময়ে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ মেনার্ড কিন্সের তত্ত্ব পুঁজিবাদের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ সংকট কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে। ঘাটতি বাজেট, ব্যাংক সুদ নিয়ন্ত্রণ ও সরকারের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সংকট নিরসনের পথ দেখান। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে আনতে তাঁর তত্ত্ব কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। তবে মুদ্রাস্ফীতি সত্ত্বেও কিনসীয় মডেল পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়। এ মডেল ৩৭ বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভঙ্গুর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে কিনসীয় তত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক সংহতি ও বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পুনর্গঠনের কাঠামোগত ভিত্তি প্রস্তুত করে।

উল্লেখ্য যে, পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলোতে জনগণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেলেও কিনসীয় মডেল ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে থাকা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে জনগণের জীবনমান উন্নত করতে পারেনি। উপরন্তু, এ মডেল অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক ঋণ ও সাহায্যের নামে ঔপনিবেশিক শোষণের নব্য কৌশল উদ্ভাবন করে। মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে নিও ক্ল্যাসিকাল মতবাদের পুনর্জাগরণ হয়। এ মতবাদের প্রবক্তারা শুধুমাত্র মুদ্রা ও ব্যাংক ঋণদানের ক্ষেত্রেই সরকারি নিয়ন্ত্রণ সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতি।[১] ষাটের দশকের শেষার্ধে সংকট আরও ঘনীভূত হলে নিও ক্ল্যাসিকাল ও কিনসীয় মতবাদের সংমিশ্রণে নতুন তত্ত্বের প্রবর্তন করা হলো। কিন্তু কোনো তত্ত্বই পুঁজিবাদের আসন্ন সংকট নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারলো না।* এ সংকট নিরসনে পুঁজিবাদ সত্তরের দশকে নতুন নতুন আধুনিক সংস্কারমূলক মতবাদ দাঁড় করায়। কিন্তু কোনো মতবাদই গভীর সংকটে নিমজ্জিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উদ্ধার করতে পারছিল না। ১৯৭৪ সালে আরও এক দফা সর্বব্যাপী সংকট উপস্থিত হয়। এবারের সংকটে নতুন কিছু অনুষঙ্গ সংযোজিত হয়। বল্গাহীন মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থার আকস্মিক পতনের পাশাপাশি দেখা দিল জ্বালানি,

---

* ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত মাত্র আঠার মাস সময়ের ব্যবধানে তিনটি বড় ধরনের মুদ্রা সংকট দেখা দেয়। এ তিনটি মুদ্রা সংকট হচ্ছে: ১৯৬৭ সালের নভেম্বরের পাউন্ড সংকট এবং পাউন্ডের অবমূল্যায়ন, ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসের ডলার সংকট এবং ১৯৬৮ সালের নভেম্বরের ফ্রান্সের ফ্রাঙ্ক এবং জার্মানীর ডয়েস মার্ক সংকট। এর ফলস্বরূপ পুঁজিবাদী বিশ্বে দেখা দিল ১৯৬৯-৭১ সালের ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট। (জোয়ান এডলম্যান স্পেরো, (১৯৮১), (অনু মমতাজউদ্দীন আহমদ, ১৯৮৪), *আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের রাজনীতি*, ঢাকা: খোশরেজ কিতাব মহল, পৃ. ৭৪।)

কাঁচামাল সংকট ও পরিবেশ বিপর্যয়। এবারকার সংকট মোকাবেলায় পুঁজিবাদ রক্ষণশীল অর্থনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করে যা নব্য-উদারতাবাদের মোড়কে প্রচারিত হয়। এর প্রধান প্রবক্তা মিল্টন ফ্রিডম্যান সংকট এড়ানোর জন্য বেকারত্বকে অপরিহার্য মনে করেন। নব্য-উদারতাবাদ আর্থিক সংকটকালেও একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত পুঁজির পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়াকে নিরাপদ রাখার জন্য আন্তর্জাতিক কৌশল অবলম্বন করে। ১৯৪৪ সালের মন্দা নিরসনে পুঁজিবাদ বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ গড়ে তোলে তৃতীয় বিশ্ব শোষণের প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা দেয়ার জন্য। আশি ও নব্বইয়ের দশকে মন্দা মোকাবেলায় তেমনি গড়ে তোলা হয় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা। এ সংকট নিরসনে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে পুঁজিবাদ সমরবাদী নব্য-রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কূটনীতির পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদ এখন সমরবাদকে বেছে নিয়েছে। বিশ্বের কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদকে দখলে আনতে নব্য-উদারতাবাদ পর্বে যেমন নিচু মাত্রার যুদ্ধকে কৌশল হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছিল, এখন সে স্থলে প্রত্যক্ষ সামরিক আগ্রাসনকে স্থান দেয়া হয়েছে। বিশ্বের তেল সম্পদকে নিয়ন্ত্রণে এনে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক শক্তিবলে বিশ্ব অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট। এ নীতি বাস্তবায়নেই শুরু হয়েছে আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া ও সিরিয়া যুদ্ধ। এ যুদ্ধ অর্থনীতির খেসারত দিতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে অর্থনৈতিক স্থবিরতা।

এ যুদ্ধ অর্থনীতির বিকাশ ঘটানো পুঁজিবাদী বিশ্বে নতুন কোনো ঘটনা নয়।পুঁজিবাদ ১৯২৯-৩৩ সালের মহাসঙ্কট কটিয়ে উঠেছিল ফ্যাসিস্ট জার্মানির সামরিক প্রস্তুতির মাধ্যমে। একইভাবে মার্কিন যুত্তরাষ্ট্রে ভারী শিল্পগুলো মন্দা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল ১৯৪০ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য সামরিক প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে। এভাবে যুদ্ধ অর্থনীতিতে রাষ্ট্রই হয়ে ওঠে শিল্পের প্রধান বাহক। ফলে রাষ্ট্র ও একচেটিয়ার অন্তর্মিলন একটি বিশেষ রূপ লাভ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ অর্থনীতি ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প ফার্মগুলোর ব্যয়হ্রাসকরণের চিরায়ত নীতি প্রত্যাখ্যান করে সাধারণ নাগরিক অধিকার খর্ব করে প্রজাতন্ত্রকে ক্রমশ দুর্বল করে তুলেছে। কারণ সামরিক খাতে খরচ সরকারি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করলেও পূর্ণ বিনিযুক্তির স্তরে তা দ্রব্যমূল্যের ওপর ঊর্ধ্বচাপ সৃষ্টি করে। বিকাশের এ প্রণালী মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে। মুদ্রাস্ফীতি একচেটিয়া অতি মুনাফাকে আরো বৃদ্ধি করে, রাষ্ট্র ও একচেটিয়ার স্বার্থকে আরো সমন্বিত করে এবং তাদের অন্তর্মিলনকে আরো ব্যাপক ও শক্তিশালী করে। একচেটিয়া ও রাষ্ট্রের এই অন্তর্মিলনের ফলে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে

একচেটিয়াগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং রাষ্ট্রীয় ঋণের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান খরচ বহন করতে সরকারকে বাধ্য করে।[২]

তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ফান্ড জনগণের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে বৃহৎ কর্পোরেশনগুলোর ভর্তুকির কাজে। ফলে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে গুটিকয়েক মানুষের স্বার্থে বৈষম্যমূলক পথে। এ বৈষম্য ক্রমশ ভারসাম্যহীনতা ও গণঅসন্তোষের জন্ম দিয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে ‘অকুপাই ওয়াল স্ট্রীটে’র মতো সামাজিক আন্দোলনের। কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগত সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত দেশে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সাম্রাজ্য যত শক্তিশালী হয়েছে, প্রজাতন্ত্র তত দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রজাতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের এ দ্বন্দ্ব পুঁজির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের একটি বিশেষ রূপ।

প্রজাতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের মধ্যকার দ্বন্দ্ব

মার্কস রাষ্ট্রকে শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার বলে গণ্য করতেন। রাষ্ট্র যখন জনস্বার্থের পরিবর্তে গুটিকয়েক ধনিক শ্রেণীর সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বার্থে পরিচালিত হয়, তখন আর সে রাষ্ট্রকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা যায় না, সে রাষ্ট্র অবশ্যই শোষণমূলক। ব্রিটিশ, রোমান বা অন্যান্য সাম্রাজ্যের মতো মার্কিন সাম্রাজ্য সবসময় মানুষের অধিকারকে পদদলিত করেছে, রাষ্ট্রকে পরিণত করেছে সংখ্যালঘু শোষক শ্রেণীর শোষণযন্ত্রে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এ বৈশিষ্ট্যটি পুঁজিবাদের ইতিহাসে নতুন কোনো ঘটনা নয়। পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হতো তা ব্রিটিশ জনগণ বহন করতো। সুতরাং, পুঁজির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শোষণমূলকভাবে মুনাফা নিংড়ে নেয়া। আর এ কাজটি করতে গিয়ে তাকে অবশ্যই বিস্তার লাভ করতে হয়। পুঁজি রপ্তানির মধ্য দিয়ে এ বিস্তারের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এ পুঁজি রপ্তানির মাধ্যমে একদিকে যেমন বহির্বিশ্ব থেকে উচ্চহারে উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ করা হয়, তেমনিভাবে বলপূর্বক বাজার দখলের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য নিজ দেশের জনগণকে বাধ্য করা হয়। নতুন বাজার দখল করতে গিয়ে যে সামরিক ব্যয়ের প্রয়োজন হয় তা নির্বাহের জন্য জনগণকে রুটি কেনার অর্থ মারণাস্ত্র ক্রয়ে নিয়োজিত করতে হয়। ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মান ক্রমশ নেমে যায়।

একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে রক্ষণশীল সমরবাদ আরও খোলাখুলি রূপ নেয়ায় সাম্প্রতিক বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে 'ফিসক্যাল ক্লিফ'*১ ও 'শাট ডাউন'*২-এর মতো জাতীয় সংকটের সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্র হিসেবে ক্রমাবনতি ঘটার প্রধান কারণ হচ্ছে তার অসম অর্থনৈতিক কমসূচি। করনীতির কথাই ধরা যাক। ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কর্পোরেশনগুলো ফেডারেল রাজস্ব আয়ের ৫০ শতাংশ প্রদান করত। নব্বইয়ের দশকে এ করের হার কমে মাত্র ৭ শতাংশে পৌছায়।[৩] কালক্রমে করের হার আরও কমে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কর্পোরেশনগুলোর করের হার তখনই কমিয়ে আনা হয় যখন তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে সর্বাধিক। এই চরম অমানবিক ও অসম করব্যবস্থাটি প্রবর্তিত হয় রিগ্যান কর্তৃক আনুক্রমিক আয়কর (Progressive income tax) ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের মধ্য দিয়ে।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার এ অসম চরিত্রটিকে সমতার নীতি দিয়ে পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। আধুনিক সমাজে সমতার নীতিকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একটি হচ্ছে, গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের সমতা ও অপরটি হচ্ছে শর্তমূলক সমতা। গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের সমতার বিভিন্ন দিকের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে আইনবহির্ভূতভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো নাগরিক যেন বঞ্চিত না হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের করনীতির এ বৈষম্য রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে বৈধতা পাচ্ছে। এক্ষেত্রে আইনের শাসনের ন্যায়সঙ্গত ভিত্তিটি আলোচনাসাপেক্ষ। এ প্রসঙ্গে লন ফুলারের[৪] 'আইনের অন্তর্নিহিত নৈতিকতা' বিষয়ক ব্যাখ্যাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ফুলার বলেন, কিছু বিশেষ নীতিমালা অনুসরণ না করে যদি 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে এ ব্যবস্থাটি প্রবর্তন ও রক্ষা করার সাহসী উদ্যোগটি বিভিন্নভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। সুতরাং, এসব নীতিমালাই আইনের অন্তর্নিহিত নৈতিকতার ভিত্তিটি নির্মাণ করে। এই নীতিমালার যেকোনো একটি সম্পূর্ণভাবে লংঘিত হলে আইনগত ব্যবস্থাপনাটি পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়বে। এ মূলনীতি বা নীতিমালাগুলোকে আট ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম মূলনীতিটি হচ্ছে আইনকে অবশ্যই সর্বজনীন হতে হবে। অর্থাৎ, আইনগত ব্যবস্থাটিকে আচরণের

---

* ১ যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ আয়ের নাগরিকদের কর বাড়ানোর প্রস্তাব মার্কিন অর্থনৈতিক কর্মসূচির আওতায় 'ফিসক্যাল ক্লিফ'নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

* ২ যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতারা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সেবা খাতগুলোতে অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত বিল অনুমোদন নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছতে না পারায় ১ অক্টোবর,২০১৩ এর মধ্যরাত থেকে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকারের সেবা খাত বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে গোটা সরকার ব্যবস্থাই অকার্যকর হয়ে পড়ে যাকে গণমাধ্যমে 'গভর্নমেন্ট শাট ডাউন' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

সাধারণ মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে অধীনস্থদের অভিযোগ করার কোনো সুযোগ না থাকায় ব্যবস্থাপকরা সহজেই তাদের সাধারণ আচরণবিধি থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে।[৫] এভাবে আইনের সাধারণ চরিত্রটি বিনষ্ট করে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র প্রতি মুহূর্তে বিশেষ একটি স্বার্থান্বেষী ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে সদাসচেষ্ট।

ফুলার বর্ণিত দ্বিতীয় মূলনীতিটি হচ্ছে : আইনের অন্তর্নিহিত নৈতিকতার একটি অপরিহার্য দিক হলো, যাদের জন্য আইনটি প্রণীত হবে তাদের কাছে এটি সরকারিভাবে ঘোষণা করা হবে।[৬] কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে এর বিপরীত দৃষ্টান্তই লক্ষ্যণীয়। জনগণের সম্পদ তাদের অজ্ঞাতসারেই বহুজাতিক কর্পোরেশনের হাতে তুলে দেয়া হয়। সরকারের পররাষ্ট্রনীতি বা যুদ্ধনীতি জনগণের কাছে গোপন রাখা হয়। সরকারি তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার যে জনগণের মৌলিক রাজনৈতিক অধিকারের একটি–এ বিষয়টি সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠী উপেক্ষা করে চলে।

আইনের শাসনের তৃতীয় মূলনীতিটি হলো, আইনকে অবশ্যই প্রত্যাশিত বা সম্ভবনাময় এবং অতীত পর্যালোচনামূলক হতে হবে। ফুলার মনে করেন, একটি অপরাধ আইন তখনই প্রত্যাশিত হবে যখন অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে। তিনি হিটলার কর্তৃক এ নীতি লংঘনের দৃষ্টান্ত দেন। তিনি হত্যাকাণ্ডকে বৈধতা দেয়ার জন্য নিহত ব্যক্তিকে 'হুমকি' বলে অভিহিত করেছিলেন।[৭] হিটলারের মতো হত্যাকাণ্ডকে বৈধতা দিতে আজকেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একই কৌশল অবলম্বন করছে। গুয়ানতানামো কারাগারে বন্দী অপরাধী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের অপরাধের সপক্ষে কোনো তথ্য প্রমাণ মার্কিন সরকার হাজির করতে পারেনি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের মার্কিন নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ বলে ঘোষণা করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই ২০-২৫ বছর জেল খাটার পর প্রমাণিত হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি আদৌ মার্কিন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি ছিলেন না। তেমনিভাবে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের নামে ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়াসহ বহু দেশে সম্প্রতিক বছরগুলোতে গণহত্যা চালানো হয়েছে। আলেন্দে, গাদ্দাফি, চসেস্কুসহ বহু বিশ্বনেতাকে বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়। সম্প্রতি 'প্রধান সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী' সন্দেহে ওসামা বিন লাদেনকে বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে। ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আইন তার প্রত্যাশিত রূপ পেতে ব্যর্থ হয়েছে।

ফুলারের চতুর্থ মূলনীতিতে বলা হয়েছে, আইনকে অবশ্যই সুস্পষ্ট হতে হবে। তিনি মনে করেন, যা কিছু স্বচ্ছ এবং যুক্তিসম্মত তা অপরিহার্যভাবেই অস্পষ্ট হতে পারে না।[৮] এ নীতিমালার আলোকে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের PNAC (Project for New American Century) ডকট্রিনের তিনটি দিক বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। ডকট্রিনে বলা হয়েছে, (১) একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এশিয়ায় সামরিক ঘাঁটি বাড়ানো প্রয়োজন। এজন্য লক্ষাধিক মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। (২) ভূমধ্য সাগর ও পারস্য উপসাগরে বিমান বাহিনীর উপস্থিতি কমিয়ে এনে প্রশান্ত মহাসাগরে নৌ বাহিনীর উপস্থিতি বাড়াতে হবে। (৩) সমগ্র অঞ্চলজুড়ে পরিকল্পিত বাহিনী গঠন ক্ষমতার উন্নতি সাধনের জন্য সম্মুখ সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে।[৯] প্রথম অংশে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ বোঝাতে কি বোঝোনো হচ্ছে বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। অথচ এ লক্ষ্য অর্জনে লক্ষাধিক মার্কিন সৈন্যের সামরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে। যে মার্কিন জনগণ অপরিসীম কষ্ট ও ত্যাগের বিনিময়ে সামরিক ব্যয় নির্বাহ করবে, তাদের কাছে স্পষ্ট করা হচ্ছে না একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জটি কী? দ্বিতীয় অংশে, প্রশান্ত মহাসাগরে নৌবাহিনী বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে এটি সুস্পষ্ট, কিন্তু কেন? এর কোনো দিক-নির্দেশনা এখানে নেই। তৃতীয় অংশে সমগ্র অঞ্চলে সামরিকীকরণের জন্য সামরিক নেটওয়ার্ক গঠনের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সমগ্র অঞ্চলজুড়ে কেন সামরিকীকরণ প্রয়োজন এর কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এখানে নেই।

অন্তর্নিহিত নৈতিকতার পঞ্চম বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে, আইনে কোনো স্ববিরোধিতা থাকতে পারবে না। অন্য কথায়, একটি আইন তখনই স্ববিরোধী হয়, যখন তাতে মানবাচরণের জন্য কোনো যুক্তিসম্মত দিক-নির্দেশনা থাকে না।[১০] এ বৈশিষ্ট্যটি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দেয়া একটি সংজ্ঞার সঙ্গে এর একটি জাতীয় নিরাপত্তা নীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণে যাচাই করে দেখা যাক। সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধের প্রবক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর একটি পুস্তিকায় সন্ত্রাসবাদের একটি আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এ সংজ্ঞাটি হলোঃ ভীতিপ্রদর্শন, বলপ্রয়োগ বা ধীরগতিতে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যেমে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সহিংসতার ব্যবহার কিংবা কোনো রাজনৈতিক,ধর্মীয় বা আদর্শিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সহিংসতার হুমকি প্রদানই[১১] হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ। কিন্তু এই সন্ত্রাসবাদের বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র কাউন্টার ইন্সারজেন্সী নামক রাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণ করে তা-ও কিন্তু তাদের সংজ্ঞায়িত সন্ত্রাসবাদের অনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ, লাতিন আমোরিকায় জাতীয়

নিরাপত্তা ডকট্রিন নামে প্রবর্তিত মার্কিন নীতির কথা বলা যায়। কেনেডী প্রশাসনে গৃহীত এ মার্কিন নীতির ভূমিকা সম্পর্কে কলাম্বিয়ার মানবাধিকার কমিটির স্থায়ী সদস্য আলফ্রেডো ভ্যাসকুয়েজ ক্যারিজোসা লিখেছেন, মার্কিন প্রশাসন আমাদের সেনাবাহিনীকে কাউন্টার ইন্সার্জেন্সী বিগ্রেডে পরিণত করেছে যা ডেথ স্কোয়াডের মতো নতুন কৌশলকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এ কর্মকাণ্ড কোনো বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য নয়, বরং অভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ। এ নীতি আমাদের সমাজকর্মী, ট্রেড ইউনিয়নের সমর্থক, প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধী নারী-পুরুষ এবং সন্দেহজনক সাম্যবাদী চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে বৈধতা দিচ্ছে। এ তালিকায় আমার মতো মানবাধিকার কর্মীও আসতে পারে।[১২] সুতরাং মার্কিন সরকারের দেয়া সংজ্ঞা অনুসারে, মার্কিন রাষ্ট্রীয় নীতি ও কর্মকাণ্ড নিরীক্ষিত হলে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই একটি সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রে পর্যবসিত হয়। এ পর্যবেক্ষণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতিকে স্ববিরোধী বলে প্রতীয়মান করে।

অন্তর্নিহিত নৈতিকতার ষষ্ঠ উপাদানটি হচ্ছে, আইন কখনোই অসম্ভব কিছু দাবি করতে পারবে না। ফুলার মনে করেন,কঠোর বাধ্যবাধকতার নীতি অনেক সময় দোষ বা অভিপ্রায় ছাড়াই আইনসিদ্ধ বাধ্যবাধকতা আরোপ করে থাকে।[১৩] সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর ২০০২ সালে মার্কিন বিচার বিভাগ এক অধ্যাদেশ জারি করে যাতে উল্লেখ ছিল: 'যদি আপনারা কোনো শত্রু যোদ্ধাকে আটক করেন তাকে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না এবং রাষ্ট্র নিযুক্ত আইনজীবী পাবার সুযোগ দেয়া হবে না। অপরদিকে, একজন যুদ্ধকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট শত্রু শিবিরে যুদ্ধরত যেকোনো মার্কিন নাগরিককে আটক করতে পারবেন এবং তাকে আইনজীবী পাওয়ার কোনো সুযোগ দেয়া হবে না।[১৪] এ দাবিটি নিতান্তই অসম্ভব। কারণ এটি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ লাভের মতো একটি অন্যতম মৌল মানবিক চাহিদাকে অস্বীকার করছে। এটি সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় স্বীকৃত একটি অন্যতম মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার। আইনের ক্ষেত্রে সর্বজনীনতা প্রয়োজন, এটি সরাসরি তাকে উপেক্ষা করছে। এটি এমন এক ধরনের কঠোর বাধ্যবাধকতার নীতি যা ব্যক্তির দোষ বা অভিপ্রায়কে খতিয়ে দেখার সুযোগ দেয় না। এ ধরনের কঠোরতা অমানবিকতার শামিল।

আইনের অন্তর্নিহিত নৈতিকতার সপ্তম মূলনীতিটি হলো, আইন ঘন ঘন পরিবর্তিত হওয়া উচিত নয়। যে আইন সহসাই পরিবর্তিত হয় তা মানব আচরণকে যথার্থ নির্দেশনা দানে ব্যর্থ হয়।[১৫] আইন

তখনই বারবার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, যখন তা সর্বজনীনতাকে প্রত্যাখ্যান করে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্র সাধারণত এলিট শ্রেণীর প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে। যেমন, মনরো ডকট্রিনে লাতিন আমেরিকায় আধিপত্য, ট্রুম্যান ডকট্রিনে সারা বিশ্বের ওপর একক কর্তৃত্ব, আইনজেনহাওয়ার ডকট্রিনে মধ্যপ্রাচ্যের সম্পদের দখলদারিত্বের দিকটি স্থান পায়।

সবশেষে অন্তর্নিহিত নৈতিকতা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও আইনের মধ্যে সঙ্গতি রেখে চলার সুপারিশ করে। ফুলার বলেছেন, এ সঙ্গতি নানাভাবে বিনষ্ট হতে পারে। এগুলো হচ্ছে ঃ ভুল ব্যাখ্যা, আইনের অপ্রাপণীয়তা, আইন ব্যবস্থার সংহতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দূরদৃষ্টির অভাব, উৎকোচ, কুসংস্কার, ঔদাসীন্য, নির্বুদ্ধিতা, ব্যক্তিগত ক্ষমতার চর্চা[১৬] প্রভৃতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত ব্যক্তিগত ক্ষমতার চর্চা বা এলিট স্বার্থ রক্ষার জন্য আইনকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। অধিকাংশ সময়েই উৎকোচের বিনিময়ে প্রণীত এসব আইনে যথেষ্ট দূরদৃষ্টির অভাব থাকে এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন, পিএনএসি ডকট্রিনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এখানে বিশ্বময় যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বলিষ্ঠ ও তাত্ত্বিক নীতির প্রতি জোরালো সমর্থন অন্বেষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, পুরো বিশ্বের ওপর নিজেদের পছন্দমতো বিধিমালা রপ্তানি করা কিংবা প্রয়োজনে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার[১৭] দর্শন এতে বাতলানো হচ্ছে।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা প্রমাণ করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বললেও নিজে কখনোই আইনের শাসনের ধার ধারেনি। সাম্প্রতিককালে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। তাই আইনের ওপর বৃহৎ কর্পোরেশনগুলোর অন্যায় প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অন্যায় প্রভাবের বিরুদ্ধেই 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রীট' আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এ আন্দোলনের পটভূমিতে ছিল রাষ্ট্রসৃষ্ট অসমতা ও বৈষম্য। মন্দা চলাকালীন সময়ে দেখা গেছে, আপামর জনতার জীবনযাত্রার মান অতিমাত্রায় নেমে গেলেও শীর্ষ ধনীদের সম্পদ ও আয় বেড়েছে। এ প্রসঙ্গে জোসেফ স্টিগলিজ মন্তব্য করেছেন, "একটি অর্থনীতিতে মোট দেশজ উৎপাদন যতই বাড়ুক না কেন, তার সুফল যদি অধিকাংশ মানুষ ভোগ না করে, বিপুলসংখ্যক মানুষ যদি ক্রমবর্ধমান হারে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, তাহলে সেটি একটি ব্যর্থ অর্থনীতি—একদম মৌলিক বিবেচনায়। আর যে নীতির কারণে সমাজে নিরাপত্তাহীনতা বেড়ে যায় বা অধিকাংশ মানুষের জীবনমানের অবনমন ঘটে

সেটাও মৌলিকভাবে ত্রূটিপূর্ণ নীতি।"[১৮] পুঁজিবাদের এ মৌলিক ত্রুটি আজকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার যৌক্তিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মতোই আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বকেও পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা উপেক্ষা করতে পারে না। আজকের বিশ্বের অধীশ্বর কর্পোরেট মনোপলিগুলোর ক্ষমতা ও আধিপত্যের লড়াইকে কেন্দ্র করে পুঁজিবাদ আরেক ধরনের সংকটের পথে এগোচ্ছে। তাই শোষক শ্রেণীর সঙ্গে শোষক শ্রেণীর দ্বন্দ্বও পুঁজির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের একটি বিশেষ রূপ।

শোষক শ্রেণীর সঙ্গে শোষক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একক পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র পুঁজিবাদী বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এরপর থেকে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ডব্লিউটিওর মতো আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম গঠন করে নিজেদের স্বার্থে আন্তর্জাতিক নীতিমালা প্রণয়ন করতে থাকে। কিছু আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়ামে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই একক ভোটো ক্ষমতা রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হলেও তার বিপুল অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের মোকাবেলায় পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর ঐক্য প্রয়োজন ছিল বলে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সকলে একজোট হয়। এ প্রসঙ্গে আর্মস্ট্রং* মন্তব্য করেছেন:

'যুক্তরাষ্টের পরিকল্পনা হলো এ বিশ্ব শাসন করা। এর বাহ্যিক রূপ হচ্ছে একপাক্ষিকতাবাদ, কিন্তু চূড়ান্তভাবে এটি একটি আধিপত্যের উপাখ্যান, এটি (ডিফেন্স প্ল্যানিং গাইডেন্স) যুক্তরাষ্ট্রকে সর্বব্যাপী সামরিক শ্রেষ্ঠত্বকে অক্ষুণ্ন রাখতে এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে তাকে চ্যালেঞ্জকারী নতুন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর বিকাশে বাধা দান করতে বলে। এটি বন্ধু ও শত্রূর প্রতি একইভাবে কর্তৃত্ব বজায় রাখার আহবান জানায়। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কেবল অধিক বা সর্বোচ্চ শক্তিশালী হতে বলে না, বরং পরম শক্তিধর হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।'[১৯]

বর্তমানে অঞ্চলভিত্তিক আধিপত্য বিস্তারে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় বাধা হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এজন্য ইউরোপীয় দুর্গের বিকাশ প্রতিরোধে যুক্তরাষ্ট্র দ্বৈত কৌশল প্রবর্তন করেছে। প্রথমত,

*ডেভিড আর্মস্ট্রং হার্পার ম্যাগাজিনের একজন অনুসন্ধানী রিপোর্টার। পূর্বে তিনি ন্যাশনাল সিকিউরিটি নিউজ সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন।

তাদের ওপর নব্য-উদারতাবাদী নীতিমালা চাপিয়ে দিয়েছে। ডব্লিউটিওর অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনায় দ্রব্য বিনিময় ও পুঁজি সঞ্চালন এর উপর ভিত্তি করে এসব নীতিমালা প্রণীত হয়। দ্বিতীয়ত, ইইউ'র অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের জন্য কিছু রাজনৈতিক ও সামরিক উপায় অবলম্বন করা হয়। এসব উপায়ের মধ্যে রয়েছে ব্রিটেন, স্পেন, ইটালি এবং পূর্ব ইউরোপীয় ব্লকের কিছু দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোর মাধ্যমে ইউরোপের সঙ্গে স্থায়ী জোট গঠনের অপরিহার্যতার কথা বললেও তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো এর মাধ্যমে ইউরোপীয় সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিকাশে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বজায় রাখা।[২০] একইভাবে, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজ আর্থিক ও উৎপাদিকা শক্তির পুঞ্জীভবনে যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা জাপান, তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারগুলোর ওপর রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। তাছাড়া চীনের উত্তরোত্তর বিকাশ ঠেকাতে ভারতের মাধ্যমে ভারসাম্য স্থাপনের একটি প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু জাপানের মতো চীনের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই বৈশ্বিক আধিপত্য রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন চীনের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি নিয়ন্ত্রণে আনা এবং বিভক্তি সৃষ্টি করে ইউরোপকে শোষণ করা।[২১]

বর্তমানে রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক কৌশল গ্রহণে ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে পিছিয়ে আছে। বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো (যাদের অনেকেই সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে সুপরিচিত) ওয়াশিংটনের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হলেও যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যকার 'বাজার দ্বন্দ্ব' এখন নৈমিত্তিক রূপ পরিগ্রহ করেছে।[২২] প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ফ্রান্স ও জার্মানির দ্রব্য বর্জিত হচ্ছে, একইভাবে ইউরোপীয়রা যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য বর্জন করে। বিদেশী দ্রব্য তাদের কারো অর্থনীতিতে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন না করলেও উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব থেকে তারা এ ধরনের ঘোষণা দিয়ে থাকে। নব্য-উদারতাবাদী ব্যবস্থার অধীনে আন্তর্জাতিক পুঁজির সঞ্চালন ও পুঞ্জিভবনকে কেন্দ্র করে এ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত ঘটে। এ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ বিগত বিশ্বযুদ্ধগুলোর উদগাতা। একবিংশ শতাব্দীতে উপনীত হয়ে আমরা আরও একটি সভ্যতার সংঘাতে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছি। শোষক শ্রেণীর নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ছাড়াও শোষিত শ্রেণীর সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্বও আজকের দিনের সভ্যতার সংঘাতের অন্যতম চরিত্র। এর পেছনে কাজ করছে পুঁজিবাদের চিরাচরিত সংকট পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব।

পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব

ব্যক্তি মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা এক ধরনের বৈরি উৎপাদন সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে উৎপাদনের পদ্ধতি (উৎপাদনের বস্তুগত শক্তিগুলো) এবং অস্তিত্বশীল মালিকানাধীন সম্পর্ক (উৎপাদনের সম্পর্ক) এক ধরনের স্ববিরোধিতায় উপনীত হয়। কারণ এখানে উৎপাদিকা শক্তি শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদন কাঠামো নিয়ন্ত্রণে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। এ উৎপাদন কাঠামোর নিয়ন্ত্রক হিসেবে পুঁজির মালিক শ্রেণীটি সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও বৌদ্ধিক প্রক্রিয়াগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করে। আর সমস্ত অধিকার হারিয়ে শ্রমিক তার শ্রম দিয়ে কেবল পুঁজিপতি শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

শ্রেণীবৈরি এ সমাজে রাষ্ট্র হচ্ছে একটি রাজনৈতিক উপকরণ যা বিদ্যমান শোষণের সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে কাজ করে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শোষণের রূপ দ্বিবিধ। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। শোষক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কর্মসূচি হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও তাদের অল্পসংখ্যক শোষক গোষ্ঠীর অধীনস্থ করে রাখা। উৎপাদনের উপকরণের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থাকায় অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোরে তারা রাষ্ট্রের ওপর একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। একটি শোষক রাষ্ট্রের বাহ্যিক কাজ হলো, স্বরাষ্ট্র নীতির আলোকে পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করা। তাই নিজ রাষ্ট্রে যেমন শ্রমজীবীদের বঞ্চিত করে ও অন্যান্য প্রগতিবাদী শক্তিকে সমূলে উৎপাটিত করে শাসন ক্ষমতা রক্ষা হয়, তেমনি বহির্বিশ্বে প্রতিক্রিয়াশীল ও লুণ্ঠনমূলক পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে আজকের সাম্রাজ্যবাদ উৎকর্ষ লাভ করেছে।[২৩] সুতরাং, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বাহ্যিক কাজ হলো অন্য রাষ্ট্রগুলোর ওপর দখলদারিত্ব, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সাম্প্রতিক সাম্রাজ্যবাদ তার চূড়ান্ত শোষণমূলক পর্যায়ে এসে এ নীতিকে আরও বেশি প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে নিয়ে গেছে। রাষ্ট্রের কার্যাবলির ভিত্তিতে পুঁজি ও শ্রমের সাম্প্রতিক দ্বন্দ্বকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথম দ্বন্দ্বটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে তার নিজের জনগণের দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয় দ্বন্দ্বটি হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের জনগণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে তার জনগণের দ্বন্দ্ব

শোষণমূলক পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় প্রতিটি রাষ্ট্রই সুবিধাভোগী ও সুবিধাবঞ্চিত–এ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শিল্পোন্নত বাজার অর্থনীতিতে কিছু মানুষ অতিমাত্রায় সম্পদ ভোগ করে, কিছু মানুষ

মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে আর কেউ কেউ দারিদ্রের মধ্যে কালাতিপাত করে। সম্পদ, আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও চাকরীলাভের সুযোগ এবং অবসর সময়ের ভিত্তিতে যাচাই করলে সর্বোচ্চ সুবিধাপ্রাপ্ত ও সর্বনিম্ন সুবিধাপ্রাপ্তদের মধ্যে এক বিশাল ফারাক লক্ষ্য করা যায়। আশির দশক থেকে রক্ষণশীল করনীতি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের পরে এ অসমতা দিন দিন বেড়েছে। রাষ্ট্রের শক্তিশালী কার্যসাধন পদ্ধতি ক্রমশ অসম উপাদানগুলোকে ক্রিয়াশীল করে তুলেছে। তাই এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে ন-মানবীয় পুঁজি অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় অধিক দানবীয় রূপ ধারণ করেছে।

বাজার অর্থনীতি প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের অনিয়ন্ত্রিত ও স্বাধীনভাবে দ্রব্য বিনিময় ও বণ্টন ব্যবস্থার যে ধারণা দেয় তাকে আপাতদৃষ্টিতে সমতা প্রতিষ্ঠার শর্ত মনে হলেও চূড়ান্তভাবে এটি রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তিমানুষের ওপর নির্মম বলপ্রয়োগের ধারাবাহিক অনুশীলনের অনুমোদনদানকারী আদর্শ। কিন্তু রাষ্ট্র যে বলপ্রয়োগের দায়িত্ব নেয় তা সবসময়ই ক্ষুদ্র একটি এলিট শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত হয় এবং সাধারণ মানুষ প্রতি মুহূর্তে তাদের অপ্রতিরোধ্য নিশানায় পরিণত হয়। এই শোষক অভিজাত শ্রেণীটি একটি সমাজের নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার চর্চায় বিপুল অসমতা সৃষ্টি করে। এই রাজনৈতিক অসমতা অনেকসময় ধন ও আয়ের অসমতাজনিত কুফলগুলোকে ম্লান করে দেয়।[২৪]

দার্শনিকরা সবসময় সমতার স্বতঃমূল্যকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁরা মনে করেন, সমাজে আয়ের বৈষম্য থাকার কারণে অতি দরিদ্র ও অতি ধনী শ্রেণীর জন্ম হয়। সমতাবাদীদের মতে, অন্যান্য সব দিক সমান হলে মানুষের সমান অর্থ (বা বৃহত্তর অর্থে সমান সম্পদ) থাকা নৈতিকভাবে কাঙ্ক্ষিত। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানের করুণ চিত্র তুলে ধরেন। তাঁরা উল্লেখ করেন, দরিদ্ররা পর্যাপ্ত পুষ্টি, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিভিন্ন রোগ তাদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়, কিন্তু তা নিরাময়ের জন্য চিকিৎসাসেবা নেবার সামর্থ্য তাদের থাকে না। তারা মানসম্মত শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে সমর্থ না হওয়ার কারণে অমর্যাদাকর ও অদক্ষ পেশায় নিয়োজিত হয়। তারা প্রায়শই নিজেকে অপরাধ জগতের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। বিপরীতক্রমে, ধনীরা আকাঙ্ক্ষিত জীবনের সকল উপকরণ বিপুলভাবে উপভোগ করে।[২৫] পৃথিবীর অন্যতম ধনী রাষ্ট্র ও বৃহত্তম পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এ বাস্তবতা অত্যন্ত নির্মম। বিশ্বের সবচেয়ে আকাশছোঁয়া ভবনের ছড়াছড়ি যে নিউ

ইয়র্ক শহরে, সেখানেও দরিদ্র মানুষেরা সেতুর নিচে পুরনো খবরের কাগজ জড়িয়ে রাত্রিযাপন করে। যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ মানুষ এরকম দারিদ্রের যাঁতাকলে পিষ্ঠ।

এভাবেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শোষণ যন্ত্র বৈষম্যমূলক ধনিক শাসন টিকিয়ে রাখতে চায়। তাই যেকোনো নাগরিক অধিকার অর্জিত হয়েছে বহু রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে। যেমন, ষাটের দশকেও যুক্তরাষ্ট্রে কালো মানুষদের ভোটাধিকার ছিল না। বহু সংগ্রামের পথ পেরিয়ে তারা এ অধিকার অর্জন করেছে। কিন্তু আজও বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্রের শোষণের শৃঙ্খল তারা ছিন্ন করতে পারেনি। আফ্রিকান আমেরিকানরা মার্কিন জনসংখ্যার মাত্র ১২ শতাংশ হলেও ভিয়েতনাম যুদ্ধে তাদের মৃত্যুর হার ছিল ২২ শতাংশ। নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যের আইনসভার এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মেক্সিকান আমেরিকানরা এই রাজ্যের জনসংখ্যার মাত্র ২৯ শতাংশ হলেও রাজ্য যাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে, তাদের ৬৯ শতাংশই ছিলেন মেক্সিকান আমেরিকান এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রথম বছরগুলোতে এই রাজ্যের মৃতদের মধ্যে এদের হার ছিল ৪৩ শতাংশ।[২৬] সুতরাং, রাষ্ট্র যাদের সুবিধাবঞ্চিত রেখেছে, ত্যাগ স্বীকারের জন্য আবার তাদেরকেই বলি হিসেবে ব্যবহার করেছে। এই ২০১৪ সালেও কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত ফার্গুসন শহরে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসার কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গ যুবক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। রাষ্ট্র এ হত্যাকাণ্ডের বিচার তো করেইনি, অপরাধীকে শনাক্তকরণেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে। উপরন্তু, বিচারপ্রার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন নির্মমভাবে দমন করেছে। উল্লেখ্য যে, ফার্গুসন শহরে ৬৭.৪ শতাংশ মানুষ কৃষ্ণাঙ্গ হলেও ৫৩ জন পুলিশ অফিসারের ৫০ জনই শ্বেতাঙ্গ। এই বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রনীতি দেশীয় গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। তাই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বাহ্যিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে বর্হিবিশ্বের সম্পদ, পরিবেশ শোষণ করে কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষা করা। অর্থাৎ, সাম্রাজ্যের সঙ্গে নিজ দেশের জনগণের দ্বন্দ্বের পাশাপাশি বহির্বিশ্বের জনগণের দ্বন্দ্বও সমানভাবে ক্রিয়াশীল।

তৃতীয় বিশ্বের জনগণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব

হেগেল তাঁর *The Philosophy of Right* গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন, বুর্জোয়া সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের জন্য একদিকে সম্পদের অতি পুঞ্জীভবন এবং অপরদিকে ক্রমবর্ধমান দরিদ্র জনগোষ্ঠী দায়ী। সুতরাং, এ সমস্যার সমাধান হতে পারে ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী পন্থায়।[২৭] হেগেলের মতো ধনকুবের সেসিল

Dhaka University Institutional Repository

রোডস*ও বিশ্বাস করতেন, দেশের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধ এড়াতে সাম্রাজ্যবাদ বা ঔপনিবেশিকতাবাদই হতে পারে একমাত্র সমাধান। বৈরি সামাজিক সম্পর্কের উদগাতা পুঁজিবাদ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পরিসরে পুঁজিপতি ও নির্যাতিত শোষিত শ্রেণীর মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। পুঁজিবাদ তার অন্তর্নিহিত শ্রেণী বৈষম্যের নিয়মকে উপেক্ষা করতে পারে না। তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতির অংশ হিসেবে তা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘাত টিকিয়ে রাখে। বৈশ্বিক পুঁজির বিস্তার রক্ষা করতে গিয়ে এসব সংঘাতের জন্ম। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সার্বিকীকরণ করতে গিয়ে যে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের উদ্ভব, তা-ই এখন কেন্দ্র ও প্রান্তের দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রাথমিক অন্তর্নিহিত উপাদান হিসেবে কাজ করছে। এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে এ দ্বন্দ্ব সবচেয়ে প্রখর হয়ে উঠেছে।

নব্য-উদারতাবাদী বিশ্বায়ন ও গ্যাট চুক্তি কার্যকর করার পর বৈশ্বিক অসমতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ধনিক কল্যাণে নিবেদিত নব্য-উদারতাবাদী বিশ্বায়ন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর পরই বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ধনীদের মোট পরিসম্পদ বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। বিশ্বের উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও এ উৎপাদনের সুফল ভোগ করেছে স্বল্পসংখ্যক ধনাঢ্য ব্যক্তি, সাধারণ মানুষের গড়পরতা আয় বৃদ্ধি পায়নি। এ অসম বিশ্বব্যবস্থায় সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী ও সর্বোচ্চ সুবিধাবঞ্চিতের মধ্যকার পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান কখনোই নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্বময় এ অসম সমাজকাঠামো টিকিয়ে রাখা হয় ফ্যাসিবাদ বা প্রাধিকারবাদী শাসনব্যবস্থা তৈরি করে। এ ধরনের কর্পোরেটবাদী শোষণকাঠামো ও কৌশল দেশে দেশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আদর্শিক সংকট সৃষ্টি করে। সাধারণত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে এ ধরনের সংকট মোকাবেলার উদ্যোগ নেয়া হয়। বিদ্যমান শ্রমবাজার ও শিল্পনির্ভর নীতিমালা রক্ষার জন্য

*লেনিন তাঁর *Imperialism : The Highest Stage of Capitalism* গ্রন্থে ব্রিটিশ বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ সিসিল রোডসের উদাহরণ দেন। ১৮৯৫ সালে রোডস তাঁর সাংবাদিক বন্ধু স্টেভের কাছে লন্ডনের শ্রমিক অঞ্চলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। শ্রমিকরা নিজেদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়েছে দেখে রোডস বিচলিত হন। এর সমাধান হিসেবে তিনি গৃহযুদ্ধ এড়াতে উপনিবেশ বিস্তার ও নতুন নতুন দেশে আগ্রাসন চালানোকেই সমাধান হিসেবে বেছে নেন। উল্লেখ্য যে, রোডস ছিলেন ইঙ্গো-বুয়োর যুদ্ধের পরিকল্পনাকারী। (V.I. Lenin, *Imperialism: The Highest Stage of Capitalism*, in *Selected Works*. Moscow: Foreign Languages publishing House, Vol.I, 1960, p. 773-4.)। এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সাম্রাজ্যবাদের এই কৌশলটি অক্ষুণ্ণ আছে। বুশ-চেনি সরকার সেদেশে 'তেল মাফিয়া' অভিধা লাভ করে। তাঁরাও ছিলেন এই একবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর পরিকল্পনাকারী। তবে আজকের এ চূড়ান্ত ক্ষয়িষ্ণু পর্বে অন্য দেশে আগ্রাসন চালিয়েও সাম্রাজ্যবাদের নিজের দেশের গৃহযুদ্ধ এড়ানোও কঠিন হয়ে পড়ছে। গণসচেতনতা ও গণপ্রতিরোধ এ বিশ্বায়নের যুগে অনেক বেশি সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে। তাই আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে ব্যাপক যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

উদারতাবাদী সংসদীয় গণতন্ত্র প্রায়শ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজে স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের দাবি জানায়। নতুন আঙ্গিকে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে বৈধতা দিতে সংসদীয় ও আমলাতান্ত্রিক শাসন টিকিয়ে রাখা খুবই জরুরী। বহুত্ববাদী সাধারণীকরণের নামে কর্পোরেট স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এ ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখে। এভাবে গণতন্ত্রায়নের মধ্য দিয়ে বাজার অর্থনীতির সামাজিকীকরণ ঘটে। পুঁজিবাদী যুক্তি অনুযায়ী, গণতন্ত্র সামাজিক প্রগতির পরম শর্ত। পূর্ব ও দক্ষিণের দেশগুলো যাদের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন অত্যন্ত ব্যয়বহুল তারা এ ধারণাটি নির্বিচারে গ্রহণ করেছে খুব বেশিদিন আগে নয়। পুঁজিবাদী বিশ্বে এ আনুষ্ঠানিক মতবাদটি শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এ শাসকগোষ্ঠীই আবার লাতিন আমেরিকায় সামরিক একনায়কতন্ত্র ও আফ্রিকায় স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে যুক্তিসিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে।[২৮]

গণতন্ত্র একটি আধুনিক ধারণা। আর আধুনিক যুগের ইতিহাস হচ্ছে পুঁজিবাদের ইতিহাস। তাই আধুনিক যুগে গণতন্ত্র ধারণাটিও পুঁজিবাদী শাসক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী চক্রজালে বন্দী। ইতিহাসের বস্তুবাদী দর্শন আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। সুতরাং, সাম্প্রতিক সময়ের গণতন্ত্রের আদর্শটি উন্নত পুঁজিবাদী শাসক শ্রেণীর মতাদর্শিক হাতিয়ার। উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বকে দেখা গেছে, তৃতীয় বিশ্বের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে প্রত্যাখ্যান করতে। ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়া, ১৯৬২ সালে ডোমিনিকান রিপাবলিক, ১৯৭৩ সালে চিলি, ১৯৯০ সালে হাইতি ও সাম্প্রতিককালে মিশরের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি গণতান্ত্রিক সরকারকে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করা হয়। বিপরীতক্রমে, মার্কিন আগ্রাসনের পর ডোমিনিকান রিপাবলিক ও গ্রানাডা, মার্কোস শাসনাধীন ফিলিপাইন, ১৯৮৮ সালে মেক্সিকো ও ১৯৯৪ সালের এল. সালভাদরের প্রহসনমূলক নির্বাচনকে প্রধান পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক বলে ঘোষণা দেয়। এ বৈপরীত্যই পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপটি উন্মোচন করে। এ গণতন্ত্র তৃতীয় বিশ্বের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন নয়, কর্পোরেটনির্ভর বাজার স্বার্থের রক্ষক। তাই বিভিন্ন সময়ে গণতন্ত্রের নাম করে তৃতীয় বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে আমদানি উদারিকরণ নীতি, অহেতুক ঋণের বোঝা, মুদ্রার ভাসমানতা, উচ্চ সুদের হার,অধিক হারে ব্যক্তি মালিকানাকরণ প্রভৃতি শোষণমূলক ব্যবস্থা।

আজকের দিনে কর্পোরেটবাদ কোনো সুবিন্যস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক বা নীতিদর্শন অনুসরণ করে না। কারণ এখনকার কর্পোরেট এজেন্ডা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন ও বিদ্যমান বৈষম্যমূলক শ্রেণী কাঠামো টিকিয়ে রাখায় ব্যাপৃত। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে অন্তত তিনটি ধাপ রয়েছে। প্রথমত, পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থাকে পুনরায় নীতিসিদ্ধকরণ এবং একে অধিকারের মতো সামাজিক বাধ্যবাধকতার পর্যায়ে নিয়ে আসা। দ্বিতীয়ত,প্রলেতারিয়েতদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি ও সহিংস হবার পথে বাধা তৈরির জন্য সামাজিক অধিকার ও মর্যাদার সঙ্গে শ্রমিকের কর্তব্যের দিকটিও যুক্ত করা হয়। তৃতীয়ত, বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে উভয়কেই কর্পোরেশনের ক্রিয়া-কলাপের সাথে সাংগঠনিকভাবে সম্পৃক্ত করা। এতে তাদের উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা গড়ে ওঠে এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা রক্ষা করা সহজ হয়।[২৯] বিশ্বময় পুঁজির চলাচল অবাধ ও নিরাপদ রাখার জন্য এসব পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বকে আড়াল করার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের কর্পোরেটকরণের মাধ্যমে স্পেন, পর্তুগাল ও লাতিন আমেরিকায় এক ধরনের প্রাধিকারবাদী কর্পোরেটবাদ গড়ে তোলা হয়েছিল।[৩০] এ ব্যবস্থায় জনপ্রিয় সামাজিক শক্তিগুলোর অংশবিশেষের সহায়তায় অসমতাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়। অসম প্রবৃদ্ধি শ্রমিক ও সম্পত্তিমালিকের ব্যবধানকে তীব্র করে তোলে এবং বিচ্ছিন্নতার সমস্যাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। তাদের সৃষ্ট এ নব্য সমাজে পুঁজি ও সম্পত্তি মালিকানা অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধির পাশাপাশি শ্রমের প্রতি ক্ষতিকারক উপাদানগুলোর প্রভাব বাড়তে থাকে, মানুষ চাকুরীর নিরাপত্তা হারায়, দারিদ্রীকরণের প্রবণতা বেড়ে চলে এবং একটি বিপুল জনগোষ্ঠী সামাজিক বর্জনের শিকার হয়।

ইউরোপও অতিজাতিক পুঁজির স্বার্থে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সমষ্টিগত সাম্রাজ্যবাদকে মেনে নেয়। অতিজাতিক মুনাফার সর্বোচ্চ বৃদ্ধির জন্য পরিচালিত এসব আগ্রাসনকে মানুষের কাছে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য সামাজিক ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নানারকম কাল্পনিক ধারণা প্রচার করে থাকে। পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র চাপিয়ে দেয়ার জন্য তৃতীয় বিশ্বের মানুষের ওপর আগ্রাসন পরিচালিত হচ্ছে যার রূপকার সভ্যতার সংঘাতের উদগাতা প্রতিক্রিয়াশীল ওয়াশিংটন। মার্কিন কর্পোরেশন যেমন বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে, তেমনিভাবে ন্যাটোর মাধ্যমে বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করছে। এর প্রধানতম শিকারে পরিণত হচ্ছে দুর্বলতম পরিধিভুক্ত দেশগুলো। এতে কেন্দ্র ও পরিধির দ্বন্দ্ব আরও বাড়তে থাকে। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ এবং বিশ্বায়নবিরোধী ও পরিবেশবাদী আন্দোলন এ দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত

অভিব্যক্তি। বর্তমানে বৈশ্বিক ন্যায়ের দাবি উত্থাপনকারী আন্দোলনগুলো ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং বিশ্বময় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করছে।

একটি বিশ্ববিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতা

মার্কস ও এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন, বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের সংঘাত গভীরতর হয়ে উঠলে একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ সুগম হবে। একটি দেশে বিপ্লব সফল হলে ধীরে ধীরে তা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে। সেসময়কার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে মার্কস উন্নত পুঁজিবাদী দেশ থেকে বিপ্লব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু মার্কসের সময়টি পুঁজিবাদের বিকাশের যুগ। এক শতাব্দী পর পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়ে এক চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল পর্যায়ে উপনীত হয়। লেনিন এ নতুন পর্বে এক নতুন ধরনের বিপ্লবতত্ত্ব হাজির করেন। তিনি দেখান, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অধীনে থেকে উন্নয়ন অসম্ভব। কারণ পুঁজিবাদী গণতন্ত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত এবং এ রাষ্ট্রব্যবস্থা হয়ে ওঠে সংখ্যালঘিষ্ঠ কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠকে শোষণের যন্ত্র। নিও-ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ বিষয়টি অত্যন্ত খোলাখুলিভাবেই প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, 'যতদিন সম্পত্তি থাকবে ততদিন এমন কোনো সরকার থাকবে না, যার মূল উদ্দেশ্য সম্পদ নিরাপদ রাখা এবং গরিবদের হাত থেকে ধনীদের রক্ষা করা নয়।' কিন্তু প্রাচীন এথেন্স থেকে আজবধি গণতন্ত্রের যেসব তাত্ত্বিক ধারণা প্রচলিত আছে তার উদ্দেশ্য ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ ধনীদের হাত থেকে দরিদ্রদের রক্ষা করা।[৩১] এ প্রকৃত গণতন্ত্র, শান্তি ও জাতীয় প্রগতি প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের আন্দোলনই একসময়ে বিপ্লবে রূপ নেবে বলে লেনিন মনে করতেন।

লেনিনের দৃষ্টিতে, সাম্রাজ্যবাদের প্রাথমিক ও সর্ববৃহৎ উদ্দেশ্য স্বদেশে ও বিদেশে গণতন্ত্রের নীতিমালা লংঘন করা। এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদকে গণতন্ত্রের অস্বীকৃতি বলে অভিহিত করা যায় বলে তিনি মনে করতেন। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়াতন্ত্র কায়েমের মাধ্যমে পুঁজিবাদ এখন বিস্তৃতি লাভ করেছে। একচেটিয়াতন্ত্র সমৃদ্ধ করা এবং প্রলেতারীয় আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে থামিয়ে দেয়ার জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একচেটিয়াতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সম্মিলনে এমন এক রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে তোলে যার কাজ হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা রক্ষা করা এবং আগ্রাসী যুদ্ধকে উসকে দেয়া। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র হয়ে ওঠে একচেটিয়া এলিটদের নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের শাসনব্যবস্থা। এ সম্পর্কে কমিউনিস্ট ইশতেহারে মার্কস ও এঙ্গেলস

বলেছিলেন, 'আধুনিক রাষ্ট্রের নির্বাহী শাখা হচ্ছে সমস্ত বুর্জোয়াদের সাধারণ বিষয়গুলো দেখাশুনা করার একটি পরিষদ'। এ কথার মাধ্যমে মার্কস ও এঙ্গেলস নির্বাহী শাখার বিশেষ শ্রেণী কার্যক্রম স্বীকার করেছেন।[৩২] এই পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্র উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সর্বক্ষণিক হস্তক্ষেপ এবং বিভিন্নভাবে এর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে। আর একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনীতির স্বতন্ত্র শাখাগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে তারা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে এক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে অর্থহীন বলে প্রতিপন্ন হয়। তাই পুঁজিবাদের মুক্ত বিশ্ব হয়ে ওঠে কোটি মানুষের বেকারত্বের দুর্দশা। অন্য কথায়, বুর্জোয়া ব্যবস্থা সকলের কাজ পাবার অধিকার নিশ্চিত করতে পারে না, দিতে পারে না অবসর ও সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার।[৩৩] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওবামা সরকার 'পেশেট প্রটেকশন অ্যাক্ট' ও 'অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট' নামে দুটি আইনের মাধ্যমে দরিদ্রবান্ধব জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ জনকল্যাণমুখী আইন বাতিলের দাবিতে বিরোধী রিপাবলিকানরা ২০১৪ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন থেকে বিরত থাকে। এতে জনপ্রশাসনের প্রায় আট লাখ কর্মকর্তা কর্মচারীর বেতন-ভাতা বন্ধ হয়ে যায়, লে-অফ হয়ে যায় তাদের চাকরি। চিকিৎসাসহ অনেকগুলো সামাজিক সেবা ব্যবস্থায় সৃষ্টি হয় অচলাবস্থা। পুঁজিবাদের এই ভয়ানক গণবিরোধী কার্যক্রম তাদের মধ্যে মধ্যপন্থী ও উদারপন্থী সমর্থকদেরও বিচলিত করে তোলে। মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা হরণকারী এ আত্মঘাতী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি তাই ক্রমশ জনঅসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ জনঅসন্তোষ রুখে দিতে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অধীনে ফিন্যান্সিয়াল অলিগর্কি সর্বোচ্চ প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করে। এতে এক ধরনের সন্ত্রাসবাদী একনায়কতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে যা পরবর্তীতে ফ্যাসিবাদে রূপ নেয়। এ ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থা সামরিক ও পুলিশ বাহিনী ব্যবহার করে জনগণের ক্ষোভ দমন করে। বৃহত্তম একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি রাষ্ট্রের পূর্ণ আনুগত্য, অর্থনীতির সামরিকায়ন, রাষ্ট্রযন্ত্রের বিস্তার ঘটানো, শ্রমজীবী মানুষের সাম্যবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে উন্মত্তভাবে আঘাত হানা, শান্তিবাদী ও অন্যান্য প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের নির্যাতন ও শাস্তি প্রদান, বর্ণবৈষম্য এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার সামান্য সম্ভাবনার পথকে অঙ্কুরেই বিনাশ সাধন হচ্ছে আজকের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ নীতি।[৩৪]

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার নামে মার্কিন সরকার তার দেশের জনগণের ওপর কি ধরনের নীতি চাপিয়ে দিচ্ছে তার একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে ফুড স্টাম্পসহ গরিবদের সমর্থনের নানা খাতে ব্যয় এখন প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলার যা হ্রাস করার জন্য প্রবল চাপ বিদ্যমান। অপরদিকে, এ দেশেই এখন কারাগারের পেছনে বার্ষিক ব্যয় ৮০ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রই এখন বৃহত্তম কারাগার অর্থাৎ বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রেই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ কারাগারে বাস করে। নানারকম ভর্তুকি, কর সুবিধা, নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষতিকর বিনিয়োগ ও জালিয়াতি, দেশে দেশে অবাধ তৎপরতা শতকরা ১ ভাগের কম জনসংখ্যার ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর উচ্চ আয়ের উৎস। সরকারি হিসাব অনুসারেই,এই শতকরা ১ ভাগের আয় দেশের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ, আর শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ সম্পদ তাদের দখলে।[৩৫] তাদের এ দখলদারিত্বের খায়েশ মেটাতে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের বিস্তার ঘটায় তার অপগোয়েন্দা তৎপরতার ভিত্তিতে। আর কথিত সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধের ব্যয়ভার মেটাতে সে এখন পরিণত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত দেশে। বর্তমানে মার্কিন ঋণের পরিমাণ ১৬ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছেছে।

প্রধান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের এ সাম্প্রতিক বৈশিষ্ট্য পুঁজিবাদের মধ্যকার সাধারণ ভারসাম্য রক্ষার অসম্ভাব্যতাকে নির্দেশ করে। এ ক্রমবর্ধমান সামরিকায়ন ও গণবিরোধী নীতি তাকে এক স্থায়ী অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শ্রেণীবৈষম্য ছাড়া যেহেতু পুঁজিবাদ চলতে পারে না, তাই আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত ও বহির্বিশ্বের রাজনীতিক অস্থিরতা উপেক্ষা করা পুঁজিবাদের জন্য অসম্ভব। এ শ্রেণীচরিত্রকে আড়াল করার জন্য শাসক শ্রেণী পুঁজিবাদী সমাজচিন্তাকে সমাজের গভীরে গ্রোথিত করে তোলে। এভাবে প্রারম্ভিক পর্যায়ে ঐতিহাসিক মার্কসবাদকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে পর্যবসিত করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। তাই শ্রমিক আন্দোলনেও সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শ জোরালোভাবে কার্যকর করে তোলা হয়। এ লক্ষ্যে পুঁজিবাদী তাত্ত্বিকরা কার্যকরী ভূমিকা রাখেন। যেমন, বৃটিশ তাত্ত্বিক বিল ওয়ারেন তাঁর *New Left Review* গ্রন্থে মার্কসবাদের এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যা দাঁড় করান যা ব্রিটেনে শ্রমিক আন্দোলনের তাত্ত্বিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এজন্য বিংশ শতাব্দীর চরমপন্থী বিপ্লবগুলো সমাজতন্ত্রের নামে মার্কসবাদ-লেলিনবাদের ব্যানারে সংঘটিত হলেও এর দ্বি-মুখী ভূমিকা ছিল। একদিকে, এটি উৎপাদিকা শক্তির দ্রূত বিকাশের মাধ্যমে পরিধিভুক্ত পুঁজিবাদ বিকাশের গতি মন্থর করে দেয়। অপরদিকে, এমনকিছু প্রবর্তন করে যাকে সবাই ‘সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব’ বলে মনে করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরিধিভুক্ত দেশগুলোর জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে এ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়।[৩৬]

মার্কসবাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তি সাধন, এ নতুন ধারায় এ দিকটিকে ক্রমশ লঘু করে ফেলা হয়। সম্প্রতি প্রকৃত ইসলামের সাম্যবাদী ও উদারবাদী চরিত্রকে আড়াল করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী মদদে ব্যাপকভাবে জঙ্গিবাদী সংগঠন গড়ে তোলা হচ্ছে।

তবে বিপ্লবের নামে এ ধরনের প্রতিবিপ্লবী কার্যক্রম পুঁজিবাদের ইতিহাসে নতুন নয়। লেনিনকেও বিপ্লবের পূর্বে কাউটস্কির অতি-সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। মধ্যপন্থার নামে কাউটস্কি এক ধরনের সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মান জাতীয়তাবাদকে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদের সাম্যবাদ ও শ্রেণী বৈষম্যের দিকটি পুরোপুরি উপেক্ষা করেন। কাউটস্কি সেসময়ে বলেছিলেন, 'প্রত্যেকেরই স্বীয় পিতৃভূমিকে রক্ষা করার দায়িত্ব আছে, সে অধিকার তার আছে। আমার জাতির সঙ্গে যুদ্ধরত জাতিসহ সকল জাতির সমাজতন্ত্রীদের জন্য এই অধিকার স্বীকৃতির বিষয়টি সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতাবাদেরই অন্তর্ভুক্ত। লেনিন তাঁর বক্তব্য খণ্ডন করে *দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন* গ্রন্থে লিখেছেন, কাউটস্কির এই কথার মানে দাঁড়াচ্ছে, পিতৃভূমি রক্ষার নামে জার্মান শ্রমজীবীদের ওপর ফরাসী শ্রমজীবীদের গুলি চালানোকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলা আর সেটাই হল সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতাবাদ।[৩৭] যদিও কাউটস্কি তাঁর যুক্তির সমর্থনে মার্কস-এঙ্গেলসের দৃষ্টান্তগুলো উপস্থাপন করেন। কিন্তু সেসময়কার স্বৈরাচারী বা ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত সেসব লড়াইকে সাম্রাজ্যবাদী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার কোনো কারণ নেই বলে লেনিন মনে করতেন। এখানে লেনিনীয় বিশ্লেষণটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আমরা তাঁর উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শিক দিক সম্পর্কে অবহিত হই যা বিপ্লবের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যকে উন্মোচিত করে। এ বৈশিষ্ট্য তথা আদর্শিক দিকগুলো হচ্ছে: (ক) বিপ্লব সবসময় শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর পরিচালিত যুদ্ধ, লড়াই বা আন্দোলন। যে যুদ্ধে এক দেশের শোষিত সমাজ অন্য দেশের শোষিত সমাজের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় তাকে কখনো বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ড বা ন্যায় যুদ্ধ বলা যায় না। (খ) ক্ষুদ্র জাতীয় স্বার্থ, সংকীর্ণ স্বার্থান্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি বা সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি কখনো বিপ্লবের লক্ষ্য হতে পারে না। (গ) আন্তর্জাতিকতাবাদী মানবিকতাবোধই হচ্ছে বিপ্লবের প্রকৃত প্রেরণা। অমানবিক শোষণ থেকে মানবসত্তাকে মুক্ত করাই বিপ্লবের প্রকৃত লক্ষ্যবস্তু। (ঘ) সংখ্যালঘিষ্ঠ শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিপীড়িত জনতার লড়াইকে বিপ্লব বলা চলে। এটি শ্রেণী সংগ্রামের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। তবে এসব লক্ষ্য

অর্জনের জন্য কিছু অপরিহার্য শর্তের বাস্তবায়ন একান্ত কাম্য বা বিবেচ্য। এসব অপরিহার্য শর্ত বিশ্লেষণসাপেক্ষে সাম্প্রতিককালে এর প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করে দেখা জরুরী।

বিপ্লবের প্রথম অপরিহার্য শর্ত হলো, শাসক শ্রেণীর জন্য পুরনো পদ্ধতিতে শাসনব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়বে। এ পরিস্থিতি থেকে এক ধরনের সংকট সৃষ্টি হবে। এ প্রসঙ্গে লেনিন বলেন, একটি জাতীয় সংকট ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব।[৩৮]

সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দুটি জাতীয় সংকট 'ফিসক্যাল ক্লিফ' ও 'শাট ডাউন' পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও বেকারত্বের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি, ঋণ পরিশোধে জনগণের অক্ষমতা, জনগণের আয় হ্রাস পাওয়া, রাষ্ট্রীয় সেবা খাতগুলো ভেঙ্গে পড়া, মানব উন্নয়নে অবনমন, পেন্টাগনের গোপন দলিল-পত্র ফাঁস, সংখ্যালঘু নিপীড়ন প্রভৃতি মার্কিন সমাজে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া ২০০৮ সালের মহামন্দা সমগ্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছে। স্বয়ং আইএমএফ স্বীকার করেছে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজার এখনো নাজুক রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো ইউরোপেও পুঁজিবাজারে অস্থিরতা এবং স্পেন ও গ্রীসের ঋণসংকট গভীর উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এ ঋণসংকট কর্মী ছাঁটাই ও বেকারত্বকে বাড়িয়ে তুলছে। প্রতিমাসেই ইউরো অঞ্চলে লক্ষাধিক যুবক চাকরী হারাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদায় দুর্বলতার কারণে বেকারত্ব আরও বেড়ে যাবে বলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পূর্বাভাস দিয়েছে। কর্মসংস্থানের অভাব ও বেকারত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডও রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতির কার্বন শোষণ ক্ষমতা এখন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। এ গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ায় তাপমাত্রা বাড়ার নেতিবাচক প্রভাবের বড় শিকার হবে দরিদ্র দেশগুলো যা শোষক ও শোষিতের বিভাজনকে আরও স্পষ্ট করে তুলবে। পুঁজিবাদের ভারসাম্যহীন বিধ্বংসী উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরিবেশ দূষণ ছাড়াও প্রাকতিক সম্পদের হ্রাসমানতা ও প্রবৃদ্ধির গতি কমে যাওয়ার মতো সংকটকেও মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

মূলত প্রযুক্তিগত একচেটিয়াতন্ত্র, বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ, পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব, মিডিয়া ও তথ্য-যোগযোগ এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ওপর একচেটিয়া ক্ষমতা—এ পঞ্চবিধ একচেটিয়াতন্ত্রের মাধ্যমে বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ এখনও টিকে আছে। এ পাঁচ

প্রকারের একচেটিয়াতন্ত্রকে তারা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে নীতিসিদ্ধ করেছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতির আঙ্গিকে প্রচারিত হলেও এর প্রতিটি মূলনীতিতে রয়েছে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণবাদী অর্থনৈতিক যুক্তিশীলতা। এ ধরনের যুক্তিশীলতা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর শিল্পায়নের পথে সৃষ্টি করেছে প্রতিবন্ধকতা, অবমূল্যায়ন করা হয়েছে উৎপাদনমুখী শ্রমকে, পণ্যের সঙ্গে একীভূত করে ফেলা হয়েছে মানবীয় শ্রমকে এবং নতুন কেন্দ্রীয় একচেটিয়াতন্ত্রের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে অতিরঞ্জিত কিছু মূল্যবোধ প্রচার করে এসেছে। বর্তমান একচেটিয়াতন্ত্র অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় সর্বাধিক আয়ের অসমতা সৃষ্টি করেছে।[৩৯] সারা বিশ্বের ওপর নিজেদের পছন্দমতো নীতিমালা চাপাতে গিয়ে পুঁজিবাদকে একের পর এক সংকট মোকাবেলা করতে হয়েছে। নিত্য-নতুন সংকট মোকাবেলা করতে গিয়ে প্রণয়ন করতে হয়েছে নিত্য-নতুন কৌশল। বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে এ সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। এ বিষয়টি এখন সর্বজনবিদিত যে, বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির হার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঊর্ধ্বগতি সত্তর থেকে নব্বইয়ের দশকে ক্রমশ হ্রাসের দিকে গিয়েছে। সত্তরের দশকে বৈশ্বিক জিডিপির হার ৫ থেকে ৪.৫ এ নেমে আসে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে তা ক্রমান্বয়ে ৩.৪ ও ২.৯ হারে অবনমিত হয়। একবিংশ শতাব্দীতে এসে জি-৭ সরকারগুলো আগামি দিন ভাল হবে বলে যে ঘোষণা নিয়মতান্ত্রিকভাবে দিয়ে যাচ্ছেন তার সঙ্গে বাস্তবতার প্রতিফলন খুব সামান্যই রয়েছে।[৪০]

সাম্প্রতিককালে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের যে প্রভাব অর্থনীতির ওপর পড়ছে তা পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়াকে এক গভীর সংকটের মুখে পতিত করেছে। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের নামে যে ধ্বংসাত্মক প্রবণতার জন্ম দেয়া হচ্ছে তা পুঁজিবাদী উৎপাদনের যৌক্তিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। পুঁজিবাদের স্বল্পমেয়াদী মুনাফার আকাঙ্ক্ষা পূরণে বর্ষণ বনকে উজাড় করে দেয়া হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের পরিবেশের ওপর পুঁজিবাদের এ আগ্রাসী আক্রমণকে পরিবেশবাদীরা নব্য-ঔপনিবেশিকতার নতুন রূপ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এভাবে পুঁজিবাদ বননিধনের মতো গচ্ছিত খনিজ নিঃশেষ, মাটির উপরিভাগ ধ্বংস বা নদী দূষণের মাধ্যমে যে আগ্রাসী উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণ করে বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক গঠনের বিনাশসাধন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি ও সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ নানাবিধ সংকট সৃষ্টি করছে যা আজকের দিনের সবুজ আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণ করেছে। শিল্পায়ন মানেই জ্বালানির ব্যবহার। এ মরণঘাতী উৎপাদন পদ্ধতি সমগ্র মানবজাতি, প্রকৃতি ও জীবজগতের অস্তিত্বের পক্ষে এক ধরনের স্ববিরোধিতায় লিপ্ত। তাছাড়া শিল্পোন্নত দেশগুলোর বিপুল মারণাস্ত্র সমগ্র জীবের মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম।

তাই এ যুগের সাম্রাজ্যবাদী প্রযুক্তিগত একচেটিয়াতন্ত্র মানুষের বেঁচে থাকার সব কয়টি উপকরণে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছে।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ সামির আমিন*[৪১] সাম্প্রতিক পুঁজিবাদের এ নেতিবাচক চরিত্রগুলো বিশ্লেষণ করে এর ভেতরকার দ্বিবিধ অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন। এ অসঙ্গতিদ্বয় পুঁজিবাদকে একটি সেকেলে ব্যবস্থাপনায় পর্যবসিত করতে যাচ্ছে। পুঁজিবাদের সেকেলে প্রতিপন্ন হওয়ার প্রথম কারণ হলো, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল যেমন, পুঁজিবাদ যে কম্পিউটার-প্রযুক্তি ও মানুষের শ্রম লাঘবের জন্য উদ্ভাবিত পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতিকে প্রবর্তিত করছে তাতে স্বল্প শ্রমে ও পুঁজিতে বৃহৎ বস্তুগত অর্জন সম্ভব হচ্ছে। এতে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূল ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যটি ব্যাহত হচ্ছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে পুঁজির মাধ্যমে শ্রমের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এখানে আধিপত্যের মাত্রাটি স্বল্প। অন্য কথায়,পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্ক এখন আর আগের মতো ধারাবাহিক পুঞ্জীভবনকে অনুসরণ করতে দিচ্ছে না। কারণ এখন তা মানব সভ্যতার উৎকর্ষের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। এজন্য পুঁজির ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সম্পর্কের অবলুপ্তি এখন একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রয়োজন। বস্তুগত সম্পদের নবতর প্রবৃদ্ধির এ যুগে পুঁজিবাদী অনিবার্যতা প্রকাশ পায়নি। বর্তমানে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে পেশীশক্তি দিয়ে চালিত শ্রমিক শ্রেণীর পরিবর্তে এক নতুন কর্মজীবী শ্রেণী উৎপাদনের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পণ্ডিতরা তাদের নাম দিয়েছেন 'নলেজ ওয়ার্কার্স' বা 'জ্ঞানশ্রমিক'। উৎপাদনমুখী বাণিজ্যের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এখন আর্থিক বাজারের প্রাধান্য বেশি। তাই নতুন এ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। ইউরোপজুড়েও যখন বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে,

---

* সামির আমিন ১৯৩১ সালে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্যারিসে রাজনীতি, পরিসংখ্যান ও অর্থনীতির ওপর উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। পুঁজিবাদের পরিবর্তিত চরিত্র, উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্ক ও উন্নয়ন তত্ত্ব সম্পর্কে সম্প্রতি উদ্ভূত প্রশ্নগুলোর সমাধানে তিনি এ সময়ের একজন মৌলিক চিন্তাবিদ, যিনি বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৭০-৮০ সাল পর্যন্ত তিনি IDEP (the United Nation African Institute for Planning) এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, এছাড়া তিনি ডাকার ও সেনেগালে *তৃতীয় বিশ্ব ফোরামের* পরিচালক ছিলেন। তিনি *World Forum for Alternatives* এর অন্যতম প্রবক্তা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে: *The Arab Nation: Nationalism and Class Struggle* (1978), *The Arab Economy Today* (1982), *Maldevelopment: Anatomy of Global Failure.*(1990), *Eurocentrism.* (1989), *Delinking: Toward a Polycentric World* (1990), *The Empire of Chaos* (1992), *Re-reading the Postwar Period: An Intellectual Itinerary* (1994), *Capitalism in the Age of Globalization: The Management of Contemporary Society* (1997), *Obsolescent Capitalism* (2003) প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

তখন এ আধুনিক জ্ঞান শ্রমিকরাই আন্দোলন গড়ে তুলছে। তাই আজকের দিনে লেনিনীয় বিপ্লব তত্ত্বের তুলনায় মার্কসীয় বিপ্লব তত্ত্বই অধিক কার্যকর হয়ে উঠেছে। তিনি শিল্পোন্নত সমাজে বিপ্লবের অধিক কার্যকারিতার কথা বলেছিলেন।

সুতরাং, আজকের সাম্রাজ্যবাদ প্রযুক্তিগত বিপ্লবের দ্বি-মুখী শিকারে পরিণত হয়েছে। একদিকে, পুঁজিবাদ অধিক মুনাফার আশায় তার উৎপাদনমুখী কল-কারখানা তৃতীয় বিশ্বে সরিয়ে নিচ্ছে। ফলে তাদের অধিক কার্বন নি:সরণের ফলভোগ করছে তৃতীয় বিশ্বের পরিবেশ। অন্যদিকে, কোনো দেশের বাজার জোরপূর্বক দখলের জন্য পুঁজিবাদ আশ্রয় নিচ্ছে গণবিধ্বংসী যুদ্ধের, এখানেও মানুষ ও পরিবেশকে দিতে হচ্ছে চরমমূল্য। তাই তৃতীয় বিশ্বের মানুষ তাদের অস্তিত্বের সংকট মোকবেলায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলছে পরিবেশবাদী ও যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন। অপরদিকে, নিজ দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দ্রচত বিকাশমান জ্ঞানশ্রমিকরা গড়ে তুলছে সাম্যবাদী ও সমতাবাদী আন্দোলন যার চূড়ান্ত রূপ ছিল 'অকুপাই ওয়ালস্ট্রীট' বিক্ষোভ। সাম্প্রতিককালে শ্রেণী সংগ্রামের আরও একটি আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে মার্কিন রাজনীতিতে সরাসরি শ্রেণীযুদ্ধ শব্দটি ব্যবহৃত হওয়া। ১ শতাংশ মানুষের সীমাহীন লোভের কারণে আমেরিকায় অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা সৃষ্টি হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংকটের মুখে পড়েছে, দেউলিয়া হয়েছে সাধারণ মানুষ, বেকারত্বে ভুগছে প্রতি ১০০ জনে ৮ জন মানুষ। অথচ, দেশের করনীতি এ এক শতাংশ মানুষের অনুকূলে। তাই স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেছেন,গত ২০ বছরে আমেরিকার অর্থনৈতিক অব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে লাভবান হয়েছে দেশের মাত্র ২ শতাংশ মানুষ। এখন সময় এসেছে তাদের আনুপাতিক কিছু দায়িত্ব নেয়ার। ওবামার এ ঘোষণাকে রিপাবলিকানরা সরাসরি 'শ্রেণীযুদ্ধ' বলে অভিহিত করে। একইভাবে, ওয়ালস্ট্রীটের লাগামহীন ব্যবহারের প্রতিবাদে যে 'অকুপাই ওয়ালস্ট্রীট আন্দোলন' গড়ে ওঠে তাকে রিপাবলিকানরা 'শ্রেণীযুদ্ধ' বলে মন্তব্য করে। অপরদিকে, রক্ষণশীল নীতির প্রবর্তক রোনাল্ড রিগ্যান যে 'চুঁইয়ে পড়া অর্থনীতির'* প্রচলন করেন, তাকে ডেমোক্র্যাটরা 'গরীব ও মধ্যবিত্তের

---

* মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রবক্তারা যুক্তি দেখান যে, বড় বড় কর্পোরেশনগুলোর হাতে যত বেশি সম্পদ জড়ো হবে, ততই সেই সম্পদের কিছু কিছু চুঁইয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবে। তাই অর্থনীতির এই ধারাকে 'ঘোড়া দিয়ে চড়ুই পাখিকে খাওয়ানো' হিসেবেও অভিহিত করা হয় অর্থাৎ হজম করতে না পারায় ঘোড়ার গোবরে যেসব শস্যদানা থাকে তা যেভাবে চড়ুই পাখি খুঁটে খায়, সেভাবে ধনীদের উচ্ছিষ্ট পৌঁছবে গরীবের পেটে। এ সম্পর্কে উপহাস করে বলা হয়, ধনীদের তেলে মাথায় আরও বেশি তেল ঢাললে সে মাথা থেকে চুঁইয়ে বাড়তি যে দু-চার ফোঁটা তেল গড়িয়ে পড়বে, নিচের তলার মানুষের তা নিয়েই খুশি থাকতে হবে। অর্থাৎ, ধনী যদি আরও ধনী হয়, তাহলে তার মাথা থেকে চুঁইয়ে পড়া তেলের পরিমাণ বাড়বে।

বিরুদ্ধে শ্রেণীযুদ্ধ' বলে অবহিত করে। বিপরীতক্রমে, ওবামা কর্তৃক ছাত্রদের সহজ শর্তে শিক্ষা ঋণের ব্যবস্থা, অবৈধ অভিবাসীদের শিক্ষার আইনসঙ্গত পদক্ষেপ, অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার কারণে বেকার ভাতার সময়সীমা বৃদ্ধি, দরিদ্রদের স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে আইন প্রণয়ন প্রভৃতি কর্মসূচিকে মিট রমনি 'গরীবদের জন্য ওবামার উপহার' বলে ব্যঙ্গ করেছেন।[৪২] ক্ষয়িষ্ণু পর্বে এসে লেনিন সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বেশি দমনমূলক ও শোষণমূলক হয়ে ওঠার যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন এ যেন তারই অভিব্যক্তি বহন করে।

পুঁজিবাদের 'সেকেলে' হয়ে ওঠার সপক্ষে আমিন যে দ্বিতীয় কারণটি নির্দেশ করেন তা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপানের সমষ্টিগত ত্রয়ী সাম্রাজ্যবাদের দিকনির্দেশনা মোতাবেক পরিধিভুক্ত দেশগুলোতে 'নির্ভরশীল' পুঁজিবাদী বিকাশ কার্যকর রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। বৈশ্বিক পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক পর্বগুলোতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলো পরিধিভুক্ত দেশগুলোতে পুঁজি রপ্তানিতে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করতো। এ নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে এক ধরনের অসম উন্নয়ন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হতো। সুতরাং, পুঁজি রপ্তানিই ছিল পরিধিগুলোর এ উদ্বৃত্ত শ্রম শোষণ করে উদ্বৃত্ত মূল্য অর্জনের প্রধান হাতিয়ার। অর্থাৎ, পুঁজির উদ্বৃত্ত নির্গমনের তুলনায় মুনাফা ফিরিয়ে আনাই ছিল তখন পুঁজি রপ্তানির প্রধান কৌশল। সাম্রাজ্যবাদের প্রধান কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্র এ কাজে এখন আর সঠিকভাবে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছে না। সে নিজে সারা বিশ্ব থেকে বিপুল অঙ্কের উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ করলেও তার সহযোগী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো পরিধিভুক্ত দেশগুলোতে আর বেশিদিন পুঁজি রপ্তানিকারী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারছে না। নতুন উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের সুযোগ না থাকায় উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে সুদে-আসলে ঋণ আদায়ের মতো নানা কৌশল অবলম্বন করে তারা এখন উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করে নেয়। আমিন মনে করেন, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার এ পরাশ্রয়ী চরিত্র তাকে 'সেকেলে' প্রতিপন্ন করে এবং কেন্দ্র ও পরিধির দ্বন্দ্বকে আসন্ন করে তোলে।

এ দ্বিবিধ অকার্যকারিতার উপাদান পুঁজিবাদকে এক 'সৃষ্টিহীন ধ্বংসে'র দিকে ঠেলে দেবে বলে আমিনের বিশ্বাস। শুমপিটার যেখানে 'সৃজনশীল ধ্বংসে'র কথা বলেছিলেন, আমিনের অবস্থান পুরোপুরি তার বিপরীতমুখী। যদিও প্রচলিত ধারার গণমাধ্যমে অহরহই প্রচারিত হচ্ছে যে, পরিধিগুলো থেকে কেন্দ্র ক্রমশ সরে আসছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, এখন সাম্রাজ্যবাদ বলে কিছু নেই। সুতরাং, দক্ষিণকে

ছাড়াই উত্তর ভালো চলছে। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনার প্রভাব নেগ্রি ও হার্টের *Empire* গ্রন্থে রয়েছে। কিন্তু আইএমএফ, ডব্লিউটিও ও ন্যাটোর অপতৎপরতা প্রতি মুহূর্তে এ ধরনের ভাবধারার অসারতা প্রমাণ করছে। নেগ্রি-হার্টের ধারণা ঔপনিবেশিক যুগে যেমন জাতি-রাষ্ট্রের প্রভুত্ব ছিল তা এখন আর নেই। কোনো জাতির পক্ষে আর বিশ্বনেতা হওয়া সম্ভব নয়। অথচ ঔপনিবেশিক যুগের অবসানের পর আমরা দেখেছি, একক বিশ্বনেতা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য জাতির ওপর এত বেশি প্রভুত্ব বিস্তার করেছে যে, বিভিন্ন সময়ে তার সহযোগী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোও ক্ষুব্ধ হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধার প্রতি ইউরোপীয় দেশগুলো ও জাপান বিভিন্ন সময়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। আজও ডব্লিউটিওর সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এছাড়া বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের কারণে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজের আধিপত্য অক্ষুণ্ন রেখেছে। কিন্তু তার এ প্রভুত্ব অন্য শক্তিগুলোকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

সাম্রাজ্যবাদের এ দ্বন্দ্বকে আড়াল করতে গিয়ে নেগ্রি ও হার্ট বলেন, আমরা এখন উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী পর্বে উপনীত হয়েছি। সাম্রাজ্যবাদ এখন সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সাম্রাজ্যের শাসনের কোনো সীমা নেই। সাম্রাজ্যের ব্যবহারিক অনুশীলন বার বার রক্তস্নাত হলেও তার প্রথম ও প্রধান কাজ শান্তিরক্ষা।[৪৩] অর্থাৎ, শান্তিরক্ষার জন্য সাম্রাজ্যকে প্রয়োজনে পুলিশি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এজন্য হার্ট-নেগ্রি মার্কিন সাম্রাজ্যকে গণতান্ত্রিক মনে করেছেন। সুতরাং, আরেক রাষ্ট্রের ওপর সার্বভৌমত্বের প্রয়োগ এখন আর সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্য নয়। এখানে মার্কিন রাষ্ট্রের দ্বৈত চরিত্রটি নেগ্রি-হার্ট আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র নানা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ হাসিলের জন্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তা আমরা ইতোমধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি। যুক্তরাষ্ট্র সামরিক খাতে যে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে তা অন্যান্য শক্তিগুলোর সম্মিলিত সামরিক ব্যয়ের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি। ১৮৯০-২০০৩ বিগত এই ১১৩ বছরে আমেরিকা মোট ১৩০ বার অন্য দেশে আগ্রাসন চালিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে ইরাক যুদ্ধ পর্যন্ত ৫৮ বছরে সে ৬৫ বার অন্যদেশে সামরিক হস্তক্ষেপ করেছে। এই 'অনন্ত যুদ্ধ' আজকের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সংকট থেকে মুক্তির উপায়। কারণ বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতি সংকটগ্রস্ত সাম্রাজ্যবাদকে সংকটমুক্ত করবে একথা মার্কিন পুঁজিপতিরাও বিশ্বাস করে না। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সারা বিশ্ব লুণ্ঠন করে এবং নব্য-ঔপনিবেশিক কৌশলে শোষণ চালিয়েও অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্ত থাকতে পারছে না। ফলে আশু সমাধানের লক্ষ্যে তাকে আগ্রাসন, অস্ত্রবিক্রি, ষড়যন্ত্র, পরোক্ষ

সামরিক হস্তক্ষেপ, এমনকি যুদ্ধের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। একারণে ১৯ ও ২০ শতকে ব্রিটিশ, ফরাসি, স্পেনীয় বা ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করে যেসব দেশ ও রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করেছিল তাদের আজ ব্যর্থ রাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত করে বুশ ডকট্রিন প্রি-এমপটিভ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছে। যুদ্ধ-আক্রমণ-লুণ্ঠন চালিয়ে ঐসব দেশ ও রাষ্ট্রে মার্কিনি অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়ে মার্কিনীকরণের চেষ্টা শুরু হয়েছে। 'ব্যর্থ রাষ্ট্রে'র তালিকার অগ্রভাগে রয়েছে ইরাক, ইরান, সিরিয়া, লেবানন ইত্যাদি। ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোচীনের দেশগুলোও তালিকার অন্তর্ভুক্ত।[৪৪] সুতরাং, আজকের সাম্রাজ্যবাদের এ ধ্বংসাত্মক নীতিই তাকে নেগ্রি-হার্টের শান্তিপ্রয়াসী সাম্রাজ্যের ধারণাকে অপ্রমাণ করে আমিনের 'সৃষ্টিহীন ধ্বংসে'র ধারণাটিকে অনিবার্য করে তোলে। শুমপিটারের 'সৃজনশীল ধ্বংসে'র ধারণাটি বর্তমান বাস্তবতায় নিতান্তই অলীক।

বিপ্লবের দ্বিতীয় শর্ত হলো শোষিত শ্রেণীর দারিদ্র ও দুর্ভোগ চরম পর্যায়ে পৌঁছনো।[৪৫] চরম দারিদ্র নতুন কিছু না হলেও বৈশ্বিক অসমতার বিস্তৃতি ঘটা নতুন একটি বিষয়। এর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে নব্য-উদারতাবাদী বিশ্বায়ন ও গ্যাটের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। উচ্চ আয়ের দেশগুলো যারা বিশ্ব জনসংখ্যার মাত্র ১৫.৬ শতাংশ, তারা বৈশ্বিক আয়ের ৮১ শতাংশ ভোগ করে। তাদের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ২৬,৭১০ ডলার। অপরদিকে, সারা বিশ্বের অন্য সব দেশের মানুষের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৫,১৪০ ডলার।[৪৬] দিন দিন এ বৈষম্য আরও বেড়েই চলেছে। ভারসাম্যহীন বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া একদিকে যেমন বৈশ্বিক অসমতা সৃষ্টি করে উত্তর-দক্ষিণের সংঘাতকে অবধারিত করে তুলছে, অপরদিকে, উত্তরের অভ্যন্তরীণ সংঘাতকেও রুখতে পারছে না। বর্তমানে মন্দার প্রভাবে উত্তরের দেশগুলোতে বেকারত্ব, ছাঁটাই, লে-অফ, ক্লোজার বেড়েই চলেছে। একদিকে ব্যাপক কর্মহীনতা ও অন্যদিকে কর্পোরেট জগতে ব্যাপক দুর্নীতি— এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে একজন সাধারণ শ্রমিক ও একজন কর্পোরেট সি.ই.ও-র মধ্যে আয়ের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ১ঃ১২৫০।[৪৭] সম্প্রতি বিকাশমান এ অসমতা দেশে বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

অথচ, একটি সত্যিকার সভ্য সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সমতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানবিকতার পূর্ণ বিকাশসাধন এবং মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদার অনুভূতিকে জাগ্রত করা। অপরদিকে, অসমতা সমাজকে অমানবিক ও অমর্যাদাকর অবস্থায় পর্যবসিত করে। এ প্রসঙ্গে ইংরেজ কবি ম্যাথিউ আর্নল্ড

মন্তব্য করেন, অসমতা একদিকে প্রশ্রয়দানের মাধ্যমে ক্ষতি করে, অন্যদিকে এটি স্থুল এবং কষ্টদায়ক। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়। এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এটি ভেঙ্গে পড়ে।[৪৮] এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন, অসমতা শুধু একটি শ্রেণীকে অতিরিক্ত প্রশ্রয়দানেই সীমিত নয়, অপর একটি শ্রেণীর জন্য সীমাহীন দুর্ভোগ সৃষ্টিতেও তৎপর। এভাবে অসমতা শোষক ও শোষিত শ্রেণীর ব্যবধান বাড়িয়ে সমাজজীবনে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। এই ভারসাম্যহীনতার পরিণতিতে ভাঙ্গন একসময় অত্যাসন্ন হয়ে ওঠে। তাই এ সামাজিক অসমতার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে বিপ্লব। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠান পরিবর্তিত হতে ব্যর্থ হলে একটি সাময়িক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এবং একটি বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হয়।

এই একবিংশ শতাব্দীতে মার্কিন সমাজে বর্ণবাদ অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এফবিআইয়ের তথ্য মতে, ২০০৫ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সাত বছরে প্রতি সপ্তাহে গড়ে প্রায় দুটি এমন ঘটনা ঘটেছে, যেখানে একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ একজন কৃষ্ণাঙ্গকে গুলি করে হত্যা করেছে। এভাবে গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশি নির্যাতন আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘু নাগরিকরাই পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন। তাই সেদেশের কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকদের একটি বড় অংশই মনে করে, শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীই নয়, বিচারব্যবস্থা, বিশেষত গ্র্যান্ড জুরি ব্যবস্থা, তাদের জীবন ও অধিকার সুরক্ষা করতে পারছে না।[৪৯] সম্প্রতি শ্বেতাঙ্গ পুলিশ নিউ ইয়র্কে কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা এবং ফার্গুসনে ১৮ বছর বয়সী কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরকে গুলি করে হত্যা করলেও গ্র্যান্ড জুরি দুটি ক্ষেত্রেই পুলিশ কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করতে অস্বীকৃতি জানায়। যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশ বাহিনীর মতোই অবাধে প্রশ্রয় পাচ্ছে সেদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও। সম্প্রতি সিআইএর নিষ্ঠুর নির্যাতনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে জানা যায়, বন্দীকে কষ্টকর ভঙ্গিতে দীর্ঘসময় বসিয়ে রাখা, পোকা-মাকড়ের মধ্যে রাখা, ঘুষি মারা, প্রহার করা, ওয়াটার বোর্ডিং, ২৬৬ ঘণ্টা কফিনের ভেতর রাখা, নগ্ন করে রাখা, টানা সাত দিন ঘুমাতে না দেয়া, মলদ্বার দিয়ে নল ঢুকিয়ে খাওয়ানোর মতো অমানবিক ও অনৈতিক পদ্ধতিতে নির্যাতন করা হয়েছে। এ নিষ্ঠুর নির্যাতনের তথ্য ছড়িয়ে পড়লে বিশ্বময় সিআইএর বিচারের দাবি উঠলেও সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি এই নির্যাতকদের 'বীর' বলে আখ্যায়িত করেন এবং তাদের রাষ্ট্রীয় পদক দিয়ে সম্মানিত করার দাবি জানান। উচ্চ পর্যায় থেকে এ নির্যাতনের নির্দেশ এসেছিল বলে মন্তব্য করেন জাতিসংঘের মানবাধিকার ও সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক বিশেষ দূত।

এ উচ্চমহলটি দীর্ঘকাল যাবৎ আইনের উর্ধ্বে থেকে দেশে-বিদেশে বিপুল সংখ্যক মানুষের সীমহীন দুর্ভোগের কারণ হচ্ছে। বিদ্যমান ব্যবস্থার ত্রুটি, আইনের শাসন ও সুশাসনের অভাবই এ কষ্টদায়ক পরিণতির জন্য দায়ী। এজন্যই অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জাঁ পল সাঁত্রে সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর উর্ধ্বে মানুষের স্বাধীনতাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছিলেন। এ অধিকার হননের বিরুদ্ধেই সমকালীন আন্দোলনগুলো সংঘটিত হচ্ছে। আজকের দিনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিক অধিকার অর্জনের আন্দোলন, শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তনের দাবিতে ফ্রান্সের ছাত্র বিক্ষোভ, শিক্ষাব্যবস্থার বাণিজ্যিকরণের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের ছাত্রসংগ্রাম, রাষ্ট্রব্যবস্থার গণতন্ত্রায়নের দাবিতে স্পেনের শ্রমিক বিদ্রোহ, ইউরোপজুড়ে বেকার যুবকদের বিক্ষোভ, 'অকুপাই ওয়ালস্ট্রীট' আন্দোলন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্তর্নিহিত ত্রুটির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোর অন্তর্গত বিচারব্যবস্থা, সামরিক বাহিনী ও জনপ্রশাসনে নিয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর অপতৎপরতা প্রচলিত ব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতাকে প্রকাশ করে। তাই এ সময়ের তারুণ্যদীপ্ত নাগরিক অধিকার আন্দোলনগুলোকে নিশ্চিতভাবেই শ্রেণীযুদ্ধ বলা যায়। এ ধরনের আন্দোলনের নেতৃত্বে আজকাল আর কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে দেখা যায় না। বরং কবি, লেখক, বুদ্ধিজীবীরাই এসব আন্দোলনের অগ্রনায়ক থাকেন। মানুষের অধিকার আদায়ের এ লড়াইগুলোতে শিল্পায়িত সমাজের অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলো থেকে পরিত্রাণের পথ খোঁজা হয়।

শিল্পায়িত সমাজের শোষণমূলক চরিত্রের কারণেই আজ মানুষের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হচ্ছে, তারা কাজ হারাচ্ছে, নিজস্ব চাহিদা পরিপূরণে ও সম্ভাবনার বিকাশসাধনে ব্যর্থ হচ্ছে এবং কর্মক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হচ্ছে। নব্য-বামপন্থী চিন্তাবিদ মার্কাস দেখান, *Capital* গ্রন্থে মার্কস যে কর্ম পরিবেশের বর্ণনা করেছেন তা এখন অনেকাংশেই বদলে গেছে। অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন মানুষের বৌদ্ধিক ও বস্তুগত জীবনের ওপর সমাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মার্কস বর্ণিত পরস্পরবিরোধী বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত শ্রেণী এখনও আধুনিক পুঁজিবাদের মৌলিক শ্রেণী হিসেবে বিরাজ করছে। মার্কাস মনে করেন, পুঁজিবাদের বিকাশ তার কাঠামো ও দুই শ্রেণীর ক্রিয়া-কলাপে পরিবর্তন আনলেও ঐতিহাসিক রূপান্তরে তাদের ভূমিকা আগের মতোই আছে। বরং, অবস্থার উত্তরণ ও আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধির কারণে সমকালীন সমাজের সবচেয়ে অগ্রসর ক্ষেত্রগুলোতে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে

পুরাতন সংঘাতে অবতীর্ণ হয়। মার্কাস বলেন, আজকের একপাক্ষিক মানুষ এখন দুটো স্ববিরোধী প্রকল্পের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে। যথাঃ (১) অগ্রসর শিল্পায়িত সমাজ তার আসন্ন ভবিষ্যতের জন্য যেকোনো পরিমাণগত পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম। (২) বিরাজমান শক্তি ও প্রবণতা এই আধেয় বা কাঠামোকে ভেঙ্গে দেবে এবং সমাজকে বদলে দেবে।[৫০]

আজকের যুগের পুঁজিবাদের কেন্দ্রে ফাটকামূলক প্রবণতা ঊর্ধ্বগতিতে বেড়ে চলায় উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের তুলনায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দাপট ও স্বেচ্ছাচারিতাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফাটকা পুঁজির এ লাগামহীন ক্রিয়া মার্কিন পুঁজিবাদকে পরিণত করেছে এক 'দুর্বৃত্তায়িত' পুঁজিবাদে। ৯০-এর দশক ছিল লগ্নি পুঁজির ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও সর্বব্যাপী ফাটকা পুঁজির দশক। এ ক্যাসিনো পুঁজির হাত ধরে গত এক দশকে মার্কিন পুঁজিবাদেরও দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে। এই দুর্বৃত্তায়নের পেছনেও রয়েছে সেই উচ্চমহলের শোষক শ্রেণী মার্কিন কর্পোরেট ও রাজনৈতিক অলিগর্কিরা। এসময়ে এনরন ও ওয়ার্ল্ডকমের মতো দৈত্যাকার বহুজাতিকগুলো গ্রাস করেছে বড় বড় ব্যাংক, হিসাবপরীক্ষা সংস্থা, জনসংযোগ ও বিজ্ঞাপন তথা আইনি পরামর্শদাতা সংস্থা ইত্যাদিকে। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের সাথে সঙ্গতিহীনভাবে পরিষেবা ক্ষেত্রটির তুলনামূলক অস্বাভাবিক বৃদ্ধি আজকের ক্যাসিনো অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। মার্কস বলেছিলেন, সঙ্কটই পুঁজিবাদকে আগ্রাসী করে তোলে। আর সব সঙ্কটের মূলে কাজ করে অর্থনৈতিক সংকট। দীর্ঘ মন্দার কারণে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ অর্থনীতিকে বেছে নেয়। যুদ্ধের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে চায়। নিজেদের এই আর্থিক যথেচ্ছাচারের অর্থ যোগানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন বিদেশী পুঁজি আমদানির ওপরও নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অর্থনীতির এ সমস্ত ভারসাম্যহীনতা মোকাবেলা করতে গিয়ে তাকে আগ্রাসন, অস্ত্র বিক্রি, ষড়যন্ত্র, পরোক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ এমনকি যুদ্ধের আশ্রয় নিতে হচ্ছে।[৫১] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের ব্যাপক প্রশ্রয়দান আজকের পুঁজিবাদকে ক্ষয়িষ্ণু ও ভঙ্গুর অবস্থায় পর্যবসিত করেছে। এই দুই শতাংশ ধনিক গোষ্ঠী মার্কস বর্ণিত 'বুর্জোয়া' শ্রেণীর আর ৯৮ শতাংশ জনগণ–'প্রলেতারিয়েত' শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে। তাই মার্কাসের বিশ্লেষণে গুণগত পরিবর্তন বা বিপ্লবের যে শর্ত নির্দেশিত হয়েছে সাম্প্রতিক পুঁজিবাদের ভগ্নদশা তাকে অত্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ করে তুলেছে।

ক্ষয়িষ্ণু পর্বে এসে সাম্রাজ্যবাদ সর্বোচ্চ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে এবং যুদ্ধই সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করবে বলে লেনিন মনে করতেন। দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক–অর্থনীতিতে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি যেমন অশান্ত হয়ে উঠেছে তেমনি বহির্বিশ্বে ব্যাপক দমন নীতির কারণে বিশ্বব্যাপী মার্কিনিদের প্রতি ঘৃণা ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে কর নীতির সমালোচনা, বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোতে ঘুষ ও ব্যাপক দুর্নীতি, নাগরিকদের ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের অভাব, বিরাট ঋণের বোঝা, মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা,ডলার হেজিমনি ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা প্রভৃতি। এসব সংকট মোচনের জন্য তারা যুদ্ধকে বেছে নিচ্ছে। মনে রাখা প্রয়োজন, শুধুমাত্র তেলের দখলদারিত্বের জন্য ইরাক যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, 'ডলার হেজিমনি রক্ষা'ও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং, ইরাক আক্রমণ ছিল একদিকে মার্কিন পুঁজিপতিদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য রক্ষার লড়াই, অপরদিকে, পেট্রোলিয়াম উৎপাদক দেশগুলোর জন্য এক ধরনের হুশিয়ারি যে, ডলার ত্যাগ করার পরিণতি কি হতে পারে তা দেখিয়ে দেয়া।

কিন্তু এ ভয়ংকর যুদ্ধ বিশ্বজুড়ে কোটি মানুষকে ঠেলে দিয়েছে চরম দুর্ভোগের দিকে। ইরাক যুদ্ধের জন্য যে বিপুল অঙ্কের সামরিক ব্যয় বুশ নির্ধারণ করেছিলেন তা ছিল প্রতিরক্ষা বাজেটের জন্য নির্ধারিত অর্থের বাইরে। বাজেট অফিস জানায়, সরকারের পক্ষে এ ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। তখন প্রতিদিন ২৮ লক্ষ ব্যারেল তেল উত্তোলন করলেই যুদ্ধে ব্যয়কৃত অর্থ উঠে আসবে বলে যুক্তি দেয়া হয়েছিল।[৫২] এ বিপুল সামরিক ব্যয়কে বৈধতা দেয়া হয়েছিল জনগণের চরম দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ ও নানা জাতীয় দুর্গতির ভার বহনের মধ্য দিয়ে। বিপুল ব্যয়ভার বহনকারী এ ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের অব্যবহিত পর যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষে পৌঁছে। মার্কিন শ্রমদপ্তরের সমীক্ষা অনুসারে, এ হার তখন ৬.২ শতাংশে পৌঁছেছিল।[৫৩] এ হার এখনও ক্রমবর্ধমান। শুধু চাকুরী হারানো নয়, রাষ্ট্রীয় পরিষেবা খাত সংকুচিত করে এবং রাষ্ট্রের বহু সেবাখাত বন্ধ করে দিয়ে জনগণের মৌল মানবিক চাহিদাকে উপেক্ষা করে এ যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের ব্যয়ভার বহন করা হয়। এভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়ে একটি ধনী দেশের জনগণ কিভাবে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হতে পারে ইরাক যুদ্ধ তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি নয়, জনগণের জীবন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশকেও দিতে হয় চরম মূল্য। ১২ লাখেরও বেশি প্রাণক্ষয়, তাৎক্ষণিকভাবে বোমারু বিমানের শব্দে আড়াই লাখ শিশুর বধির হয়ে যাওয়া, রাসায়নিক ও

জীবাণু অস্ত্রের প্রভাবে ক্যান্সারসহ নানা মরণঘাতি ও সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া ছিল ইরাকিদের অনিবার্য নিয়তি।

সাম্প্রতিক বিশ্বে আশঙ্কাজনকভাবে সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। ক্ষয়িষ্ণু পর্বে এসে মরিয়া হয়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বজুড়ে সামরিকায়ন তীব্রভাবে বাড়িয়ে তুলছে। এ বিপুল ব্যয়ভার নির্বাহ করতে গিয়ে দেশের অর্থনীতিতে সৃষ্টি হচ্ছে ভারসাম্যহীনতা। দেশজুড়ে দেখা দিচ্ছে জনঅসন্তোষ। অপরদিকে, বিশ্বজুড়ে মার্কিন সমরবাদের শিকার কোটি কোটি মানুষও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে। আজকের তথ্য-প্রযুক্তির বিপ্লবের যুগে মানুষের কাছে আর শোষণের চরিত্র আড়াল করে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সামাজিক মিডিয়ার বদৌলতে মানুষের কাছে প্রতিদিনই পৌঁছে যাচ্ছে নির্যাতনের লোমহর্ষক ইতিবৃত্ত। ফিলিস্তিন প্রসঙ্গেই আসা যাক। আগে যুক্তরাষ্ট্রে যত বেশীসংখ্যক মানুষ ফিলিস্তিনবিরোধী ছিল, এখন তার সংখ্যা কমছে। সুতরাং, প্রচলিত মিডিয়ার মিথ্যা তথ্য দিয়ে আগে মানুষকে যত সহজে ভুলিয়ে রাখা যেতো, এখন তা আর হচ্ছে না। ফেসবুক ও টুইটারে নিয়মিত ছড়িয়ে পড়ছে ইসরাইলের বর্বরতার চিত্র, সেইসঙ্গে উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে তার রক্ষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অমানবিক ও অযৌক্তিক নীতিহীন চরিত্রটিও। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন, দখলদারিত্ব ও প্রভাব বিস্তারের পথটি মোটেও মসৃণ নয়। পূর্বে দাসত্বের শৃঙ্খলে থাকা বহু দেশই এখন মার্কিন প্রভাববলয় থেকে বেরিয়ে স্বনির্ভর রাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছে। লাতিন আমেরিকান দেশগুলোই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এক সময় মার্কিন প্রভাবাধীনে থেকে যে দেশগুলো নিজ দেশের জনগণের ওপর নিপীড়নের পাশাপাশি বহির্বিশ্বে প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে, তারা এখন মার্কিনবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে বিশ্বময় প্রগতিবাদী কর্মকাণ্ডে উৎসাহ যোগাচ্ছে। এখানেও ফিলিস্তিন প্রসঙ্গ প্রণিধানযোগ্য। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় পূর্ববর্তী লাতিন আমেরিকার শাসক গোষ্ঠী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। রাজনৈতিক পরিবর্তনের নতুন স্রোতধারায় এ লাতিন শাসক গোষ্ঠী এখন অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনদানে ও ইসরাইলি বর্বরতার বিরুদ্ধে। সামাজিক প্রচার-মাধ্যমগুলোতে তারা ইসরাইলি নৃশংসতার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছে। এছাড়া ফিলিস্তিনিদের মানবিক সহায়তা প্রদানসহ জাতিসংঘে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধপরাধের অভিযোগ আনা ও এর সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতেও তারা পালন করেছে অগ্রনী ভূমিকা। সম্প্রতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোও ফিলিস্তিন

রাষ্ট্রের স্বীকৃতির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে যা বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের একঘরে হয়ে পড়ার প্রবণতাকে সুস্পষ্ট করেছে।

সম্প্রতি সিআইএর নির্যাতনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মানবতার খোলসটি আর বিশ্ববাসীর কাছে গোপন থাকল না। বিশ্ব সম্প্রদায় যখন এ পাশবিকতার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে, সেই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি দাবি করেছেন, বেআইনি কিছুই করা হয়নি। বিচার বিভাগীয় অনুমোদনের পরই এই টেকনিক ব্যবহার করা হয়। তাঁর এ অনৈতিক বক্তব্যকে 'ফালতু' বলে উড়িয়ে দিয়ে ভাষ্যকার রে ম্যাকগভার্ন পাল্টা প্রশ্ন রেখেছেন, ধর্ষণ বা দাসপ্রথা অনুমোদিত হলেই কি তা বৈধ হয়ে যায়? একইভাবে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া এসেছে জাতিসংঘ থেকেও। জাতিসংঘের সন্ত্রাসবিরোধী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বেন এমেরসন বলেছেন, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যারা নির্যাতন চালিয়েছে, এখন সময় এসেছে তাদের বিচার করার। শুধু তারাই নয়, নির্যাতন যারা অনুমোদন করেছে, তাদের বিরুদ্ধেও সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান থাকা আবশ্যক। জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনারও সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, আমেরিকা নির্যাতনবিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ চুক্তি অনুযায়ী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে মার্কিন সরকার বাধ্য।[৫৪] সুতরাং, সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতনের প্রতিবাদ এখন মানবাধিকার সংস্থাগুলো ও মার্কিনবিরোধী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, জাতিসংঘ থেকেও জোরালোভাবে শক্তিধরদের বিচারের দাবি আসছে। শুধু তাই নয়, নির্যাতন প্রতিবেদনে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের সম্পৃক্ততার তথ্য থাকায় মার্কিনিদের সঙ্গে তাদের প্রধান মিত্র ব্রিটিশদেরও সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়ায় একের পর এক ব্যর্থ ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ শাসক শ্রেণীর প্রতি জনগণের আস্থাহীনতাকেই বাড়িয়ে তুলেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই গোপন নথি প্রকাশিত হওয়ার পর জনগণ যুদ্ধের অসারতা উপলব্ধি করেছে। তাদের গণবিধ্বংসী যুদ্ধের পরে প্রতিটি দেশেই গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটেছে যা আজও বন্ধ হয়নি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মার্কিন সমর্থিত সরকারকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। অর্থাৎ, যুদ্ধ অর্থনীতি সাম্প্রতিককালে স্বদেশে ও বহির্বিশ্বে গণঅসন্তোষ, অনাস্থা সৃষ্টি করছে। তার মিত্র ন্যাটোভুক্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গেও বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। ইরাক যুদ্ধ যে ডলার-ইউরোর দ্বন্দ্বকে ঘিরে শুরু হয়েছিল তা কারও অজানা নয়। সম্প্রতি ইউরোপীয় দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের নজরদারিতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। এক পর্যায়ে ইইউ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তথ্য বিনিময় চুক্তি বাতিলেরও হুমকি দেয়। চীন-রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব বহু

পুরনো। তবে তারা ইদানীং ইরান ও সিরিয়ার পক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করায় পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ নতুন করে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। তাদের সমর্থনপুষ্ট সরকারগুলোর পক্ষ থেকেও সমালোচনা আসছে। যেমন, সৌদি আরবের সাবেক গোয়েন্দা প্রধান সম্প্রতি সিরিয়া সংঘাতের জন্য পশ্চিমাদের দায়ী করেছেন। দুই বছরে দুই লাখ সিরীয় নিহত হওয়ার পর পশ্চিমারা আইএস জঙ্গি দমনের নামে এক মাসে ৫৮৫ জনকে হত্যা করে। হামাস নেতা মুসা আবু মারজুক অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে দাবি করেছেন, হামাস ও মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো দলগুলোর সংগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত করতে পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশ আইএস সৃষ্টি করেছে। চীনা পত্রিকা *পিপল্‌স ডেইলি* এ বিষয়টিকে 'বাঘকে ইচ্ছে করে সামনে নিয়ে আসা'র সঙ্গে তুলনা করে। পত্রিকাটির দাবি, পশ্চিমারাই মধ্যপ্রাচ্যে সন্ত্রাস উসকে দিচ্ছে। অপরদিকে, ওআইসিভুক্ত দেশগুলো যেখানে মার্কিন মদদপুষ্ট রাজতান্ত্রিক সরকারেরই প্রাধান্য বেশি তারাও সম্প্রতি নির্যাতিত ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ইসরাইলি বাহিনীর বর্বরতার খবর মুসলিম দেশগুলোর গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করার অঙ্গীকার করেন। অতএব, আজকের সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দ্বন্দ্ব–এ ত্রিবিধ দ্বন্দ্বই অত্যন্ত সুস্পষ্ট রূপলাভ করেছে। এ দ্বন্দ্ব থেকেই লেনিন পতনের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। বর্তমান সময়ে ব্যাপকভাবে জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় গণমানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথ তৈরি হচ্ছে এবং বিপ্লবের প্রবণতাগুলোকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করছে।

বিপ্লবের তৃতীয় অপরিহার্য শর্ত হলো জনগণের কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়া। সাধারণভাবে জনগণ অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকলেও সংকটকালে পরিস্থিতিই তাকে বাধ্য করে স্বনির্ভর বিপ্লবী কর্মসূচী গ্রহণ করতে।[৫৫] সম্প্রতি ফার্গুসন, অ্যারিজোনা, নিউ ইয়র্কের স্ট্যাটেন আইল্যান্ড ও ব্রুকলিন, ফ্লোরিডা, ওহাইও, ক্লিভল্যান্ড, সাউথ ক্যারোলিনায় শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে একের পর এক কৃষ্ণাঙ্গের মৃত্যু ঘটলে যুক্তরাষ্ট্রের ৬০টি শহরে ব্যাপক গণবিক্ষোভ ও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এ আন্দোলন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে নাগরিক সংহতিতে পরিণত হয়। এ গণঅসন্তোষ একদিনে সৃষ্টি হয়নি, বৈষম্যভিত্তিক সমাজে দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটে আজকের এ গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে। হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েও ন্যায়বিচার পেতে ব্যর্থ কৃষ্ণাঙ্গরা রাজপথ বিক্ষোভে মুখরিত করে। এ বিক্ষোভে অংশ নিয়েও তাদের পুলিশি নির্যাতন, হয়রানি ও গ্রেফতারের শিকার হতে হয়। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির নামে যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর ক্ষমতা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর নির্মম শিকারে পরিণত হয় সেদেশের কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী। ২০১০ সালে

মিশেল আলেকজান্ডার তাঁর *দ্য নিউ জিম ক্রোঃমাস ইনকারনেশন ইন দি এইজ অব কালার ব্লাইন্ডনেস* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা, বিশেষ করে ফৌজদারি ব্যবস্থা এমন রূপ নিয়েছে যে তাকে বাইরে থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য প্রতিকূল মনে না হলেও মর্মবস্তুর দিক থেকে তা অনেকাংশেই তাদের বিরুদ্ধে। তিনি মনে করেন, ষাটের দশকে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে যা অর্জিত হয়েছিল, আজ তা থেকেই এই নাগরিকেরা বঞ্চিত। বিশেষত সত্তরের দশক থেকে 'ওয়ার অন ড্রাগ' নাম করে যে মাদকদ্রব্যবিরোধী অভিযান চালানো হচ্ছে তার মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গদের সমাজকেই ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে।[৫৬]

এ থেকে প্রমাণিত হয়, ক্ষয়িষ্ণু পর্বের পুঁজিবাদ আগের চেয়ে পশ্চাদমুখী। একবিংশ শতাব্দীতে এসে এটি নতুন করে পুরাতন রক্ষণশীল ও শোষণমূলক নীতি গ্রহণ করেছে যা সমাজদেহে গভীর ক্ষত ও ভারসাম্যহীনতা তৈরি করেছে। চলতি বছরের বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের মতো গত বছরেও অভিবাসী সংস্কার আইন পাসের দাবিতে লাখো মানুষের সমাবেশ হয়েছিল। ২০১১ সালে দেখা দিয়েছিল 'অকুপাই ওয়ালস্ট্রীট আন্দোলন'। গ্রেফতার, হয়রানি বা প্রাণহানির মতো আশঙ্কাকে তুচ্ছ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ এসব প্রতিবাদে অংশ নেয়। মার্কস বলেছিলেন, মানুষের যখন শৃঙ্খল ছাড়া আর কোনোকিছু হারানোর ভয় থাকবে না, তখনই সে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলবে। অর্থাৎ শোষণ যখন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করবে, তখন মানুষ জীবন-মৃত্যুকে পরোয়া না করে শোষণমূলক কাঠামো ভেঙ্গে ফেলতে চাইবে। সাম্প্রতিককালে দারিদ্র, বেকারত্ব, সর্বোচ্চ আয়বৈষম্য, বর্ণবৈষম্য কবলিত মার্কিন সমাজে নাগরিকদের একটি বড় অংশের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আন্দোলন মানেই গণজাগরণ। তাই মার্কিন সমাজে বর্তমানে অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় অধিক মাত্রায় নাগরিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। গণনির্যাতন বন্ধের দাবিতে আন্দোলনরত সংগঠন 'স্টপ মাস ইনকারনেশন নেটওয়ার্ক' অনেক আগে গঠিত হলেও এবারের বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে তারাই নেতৃত্ব দিয়েছে। এছাড়া কৃষ্ণ অধিকার আন্দোলন, ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন ফর এ্যাডভান্সমেন্ট অব কালারড পিপলের সদস্য ও নাগরিক অধিকারকর্মীরা ফার্গুসন থেকে মিজৌরীর রাজধানী জেফারসন সিটি পর্যন্ত পুরো ১২৭ মাইল হেঁটে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়েছেন। অনেকেই বলছেন, ষাটের দশকে মার্টিন লুথার কিং এর নেতৃত্বে এদেশে যে নাগরিক অধিকার আন্দোলন হয়েছিল, আজকের আমেরিকায় সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়ায় বামপন্থী সাপ্তাহিক *নেশন* লিখেছে, এ মুহূর্তে আমেরিকায় যা

ঘটছে তা শুধু প্রতিবাদ ঝড় নয়, এ এক নাগরিক অভ্যুত্থান। বৈষম্যবিরোধী এ আন্দোলনের লক্ষ্যমাত্রা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাগরিক অধিকার নেতা আর্ল শাপটন বলেছেন, এদেশের বিচারব্যবস্থা দুই ধরনের— একটি শ্বেতকায় ও উচ্চবিত্তের জন্য, অন্যটি কালো ও নিম্নবিত্তের জন্য। এ কারণেই আজকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থেকে শহরের মেয়র, পুলিশ, প্রধান ধর্মীয় নেতা ও সাধারণ নাগরিক সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, চলতি বর্ণবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার।[৫৭]

উল্লেখ্য যে, মার্কসের সময়কালে ব্রিটেন ও আমেরিকায় সামরিক চক্র ও আমলাতন্ত্রের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে তিনি সেখানে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সংঘটনের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। কিন্তু লেনিন দেখান, বিংশ শতাব্দীতে এ অবস্থার বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই এ দুটি রাষ্ট্রে এখন আর শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সম্ভব নয়, বরং সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নিতে হবে। সাম্প্রতিককালে একবিংশ শতাব্দীতে এ রাষ্ট্রগুলো নব্য-রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করে সর্বোচ্চ সামরিকীকরণের দিকে ঝুঁকেছে। এমতাবস্থায় জনগণের সামজিক আন্দোলনগুলো রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নিতে পারছে না রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্মম দমনমূলক কাঠামোর কারণে। জন স্টুয়ার্ট মিলের উদারপন্থী মতবাদের প্রভাবে একসময়ে ব্রিটেনে কিছু মানবীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি ও গণতন্ত্রের চর্চা শুরু হলেও বিংশ শতাব্দীতে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের আধিপত্য ও শোষণ প্রক্রিয়া টিকিয়ে রাখার জন্য পীড়নমূলক রাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে। এতে রাষ্ট্রের মাধ্যমে জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনগুলো দমনের পথ তৈরি হয়। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ বিপ্লব দমন ও নিজেদের পুঁজি পুঞ্জীভবনের পথ সুগমের জন্য শোষণমূলক ঔপনিবেশিক নীতির প্রয়োগ ঘটানো হয়। একবিংশ শতাব্দীতে আবার নতুন করে রক্ষণশীলতাবাদের প্রাধান্য ঘটায় ব্রিটেন আবার পূর্ণ সামরিকীকরণের পথে ফিরে এসেছে। এতে তৃতীয় বিশ্বের সরকারগুলোর নিপীড়নমূলক পদক্ষেপের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদের দূরভিসন্ধি ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজ হয়ে যায়। এ সামরিকীকরণ মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ন্যূনতম অধিকারটুকু কেড়ে নিয়ে তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা, নির্যাতন, অযাচিতভাবে জেল-জরিমানা ও হয়রানির শিকারে পরিণত করবে। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ উন্নয়ন সংস্থা অক্সফাম জানিয়েছে, ব্রিটিশ করদাতারা তাদের সাহায্যের টাকায় হাসপাতাল তৈরি দেখতে চায়, সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার কেনায় অংশ নিতে চায় না। সুতরাং, বিংশ শতাব্দীতে যেমন ব্রিটিশ সরকার জনগণের টাকায় ভারতে ব্যবসারত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পুঁজির পুঞ্জীভবনে সহযোগিতা করতো, আজকে তেমনি দেশে-বিদেশে সামরিকীকরণের মাধ্যমে বিশ্বময় মানুষের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের লড়াইকে থামিয়ে দিতে চায়।

মার্কিন নেতৃত্বাধীন নব্য সাম্রাজ্যবাদের অর্থনীতি মূলত যুদ্ধনির্ভর। তাই ইরাক থেকে সেনা প্রত্যাহার ও আফগানিস্তান থেকে ২০১৪ সাল নাগাদ মোট সামরিক ব্যয়ের ৪০ শতাংশই এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র করছে। ২০১২ সালেও দেশটি সামরিক খাতে ৬৮ হাজার ২০০ কোটি ডলার ব্যয় করে। এই ব্যয়ের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের পরে সামরিক খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় করা ১৩টি দেশের মোট ব্যয়ের চেয়ে বেশি।[৫৮] মার্কিন চলচ্চিত্রগুলোও অস্ত্রনির্ভর সহিংসতায় পরিপূর্ণ। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যেও এক ধরনের মারমুখী মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা সমাজে অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়ে তুলছে। প্রেসিডেন্ট সিনিয়র বুশ উপসাগরীয় যুদ্ধের পর স্বীকার করেছিলেন, এ যুদ্ধে যতসংখ্যক সৈন্য প্রাণ হারিয়েছিল, প্রতি বছর শুধুমাত্র নিউ ইয়র্ক শহরে আততায়ীর গুলিতে তার চেয়ে বেশীসংখ্যক মানুষ প্রাণ হারায়। সমাজজীবনে এত বিপর্যয় নেমে আসার পরও অস্ত্র ব্যবসায়ীরা মুনাফার লোভে এ ব্যবসা কমাচ্ছে না, বরং বাড়াচ্ছে। কারণ অন্য যেকোনো ব্যবসার চেয়ে অস্ত্র ব্যবসা অধিক লাভজনক। এসব নানা সুবিধা মুনাফাখোর পুঁজিবাদকে করে তুলেছে প্রাণঘাতী অস্ত্রকেন্দ্রিক দানব। এ অস্ত্র ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা বিশ্বব্যাপী সহিংস কর্মকাণ্ডে উৎসাহ জোগায়। সিআইএর প্রত্যক্ষ মদদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিচু মাত্রার যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাখা হয়।

২০১৪ সাল ছিল সবচেয়ে সহিংসতম বছর। এ সময়ে সারা বিশ্বজুড়ে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ রাষ্ট্র গণতন্ত্র ত্যাগ করে একনায়কতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছে। বেশীর ভাগ দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কথিত সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধের অংশীদার হওয়ায় তারাও যুক্তরাষ্ট্রের মতো পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিশ্বায়ন এখন বিশ্বব্যাপী তার নিয়ন্ত্রণ, নিপীড়ন ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়াশীল। এ সমরবাদী অর্থনীতির ভার বহন করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আয়বৈষম্যও এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। মার্কিন গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০১৩ সালে মার্কিন ধনী পরিবারগুলোর গড় আয় ছিল ৬ লাখ ৩৯ হাজার ৪০০ ডলার। মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টারের গবেষণা থেকে জানা যায়, একই সময়ে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর গড় আয় ছিল ৯০ হাজার ৫০০ ডলার। আর নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোর সঙ্গে ধনী পরিবারগুলোর আয়ের বৈষম্য গড়ে ৭০ শতাংশ বেশি। বৈশ্বিক মন্দার পর মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলো যেখানে ব্যাপকভাবে সম্পদ হারায়, সেখানে ঐ একই সময়ে মার্কিন ধনকুবেররা তাদের হারানো সম্পদ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এটিই ধনী-

দরিদ্রের সম্পদের বৈষম্যকে আরও প্রকট করেছে। গবেষণা প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়, গত ৩০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের ধনী পরিবারগুলোর সম্পদের পরিমাণ গড়ে ১০০ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর সম্পদ বেড়েছে গড়ে মাত্র ২.৩ শতাংশ। এ পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে, সম্পদের বৈষম্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কতটা প্রকট। বিশ্বমন্দা কাটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর পরও প্রত্যাশিত হারে আয় ও মজুরি বৃদ্ধি না পাওয়াকে আয় বৈষম্য বৃদ্ধির আরেকটি বড় কারণ বলে মন্তব্য করেছে পিউ রিসার্চ। এ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মন্দার পর মার্কিন পুঁজিবাজার ঘুরে দাঁড়ালেও এর সুফল শুধু ধনী পরিবারগুলোই ভোগ করেছে। ফলে পুঁজি বাজারে ধনী পরিবারগুলোর আধিপত্য আরও বেড়েছে।[৫৯]

এ অন্যায়ের বিরুদ্ধেই ‘ওয়ালস্ট্রীট দখলে করো’ আন্দোলনে স্লোগান উঠেছিল: ‘আমরাই ৯৯ শতাংশ’। এ স্লোগানটি ছিল প্রচলিত ক্ষমতার কাঠামোর প্রতি একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। এখানে আন্দোলনকারীরা সমাজের বৃহত্তর শ্রেণী বিভাজনটিকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সক্রিয়ভাবে তুলে ধরে। এ অপরাধে লক্ষাধিক আন্দোলনকারীকে নিয়মিত পুলিশের সামরিক প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়। এভাবে ১% কর্পোরেট ও ব্যাংক এলিটরা তাদের বর্ধিত ক্ষমতা ও নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও অনুশীলনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে দেশ শাসন করছে। এই ১ শতাংশের শোষণ এখন আর এক দেশেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, বিশ্বায়নের মাধ্যমে এই ১ শতাংশ এখন বিশ্বময় অন্য যেকোনো অধিকারের উর্ধ্বে বিনিয়োগের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা বিভিন্ন দেশে মুক্ত বাজারের পথে বাধা সৃষ্টিকারী পরিবেশ, শ্রম ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার মানদণ্ড সম্বলিত আইনগুলো বাতিল করে চলেছে। বিশ্বায়ন উৎপাদনের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে, কর্পোরেশনগুলোকে উচ্চমাত্রায় ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উৎপাদক ও কৃষকদের জীবনধারণকে বিপন্ন করে তুলেছে। এমনকি বিশ্বায়ন প্রকৃতিকেও কর্পোরেশনগুলোর একচেটিয়া সম্পদে পরিণত করেছে। আমাদের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণসমূহ কৃষিবীজ, চাল, শস্য, এমনকি বৃষ্টিজলের ওপরও কর্পোরেশনগুলোর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছে। এটি মুক্তবাণিজ্য নয়, এটি হচ্ছে একচেটিয়া বিনিয়োগ। এর ফলাফল শুধুমাত্র ঐ এক শতাংশ ছাড়া তৃতীয় বিশ্ব ও পুঁজিবাদী বিশ্বের উভয়ের জনগণের জন্যই ধ্বংসাত্মক হয়েছে।[৬০] এই এক শতাংশের জন্য মুনাফার পাহাড় গড়তে পুঁজিবাদ এখন একের পর এক সংকট মোকাবেলা করে চলেছে।

আধিপত্যবাদ সবসময়ই বহুপাক্ষিক ও আপেক্ষিক। এই আপেক্ষিকতার কারণে তাকে হুমকির মধ্যে থাকতে হয় বিভিন্নভাবে। বহুপাক্ষিক এ অর্থে যে, বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেই নিয়ন্ত্রণ করছে না, একইসঙ্গে এটি রাজনৈতিক, আদর্শিক (এমনকি সাংস্কৃতিক) এবং সামরিক কর্মকাণ্ডেরও নিয়ন্ত্রক। এটি আপেক্ষিক এজন্য যে, বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতি কোনো একক শক্তি দ্বারা বিশ্ব সাম্রাজ্য গড়ে তোলেনি, আধিপত্যশীল কেন্দ্রগুলোর সমঝোতার ভিত্তিতেই এ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। তাদের নিজস্ব সমঝোতা ছাড়াও নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান পরিবর্তনও অনেক সময় সাম্রাজ্যবাদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বব্যবস্থার অংশীদারদের মধ্যকার পরিবর্তিত শক্তির সম্পর্কের ভিত্তিতে টিকে থাকা আধিপত্যকে সবসময় হুমকির মধ্যে থাকতে হয়।[৬১] ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রের নেতা হিসেবে তার দায়িত্ব পালন বন্ধ করে দিয়েছে। নিষ্ঠুর যুদ্ধের মাধ্যমে পুঁজি রপ্তানি অক্ষুণ্ন রাখলেও অন্যদের পুঁজি রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে না। কেন্দ্রের দেশগুলোর ওপর রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সে তার আধিপত্য রক্ষা করছে। এখন প্রশ্ন, কতদিন অন্যান্য শক্তিগুলো এ নিয়ন্ত্রণ মেনে নেবে? তাছাড়া বহির্বিশ্বের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে যে বিপুল অর্থভাণ্ডার যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যয় করতে হচ্ছে তা তার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে আরও নাজুক ও দুর্বল করে ফেলছে। যুক্তরাষ্ট্র সাম্প্রতিক দশকে যুদ্ধংদেহী নীতি গ্রহণ করায় এর অর্থনীতি মারাত্মকভাবে অসম হয়ে পড়েছে। এতে সে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশটি আরও মানবেতর অবস্থায় চলে গেছে। ব্যাপক হারে কেন্দ্রীভবনের সঙ্গে সঙ্গে করও হ্রাস করা হচ্ছে। এর ফলাফল হচ্ছে, শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষার মতো জনকল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগের হার কমে যাওয়া। একারণে একমাত্র রুমানিয়া ছাড়া অন্য যেকোনো উন্নত দেশের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে শিশুদারিদ্রের হার বেশি। সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ১৪.৫ ভাগ মানুষ দরিদ্র হলেও শিশুদের মধ্যে ১৯.৯ ভাগই দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করে যার সংখ্যা এখন প্রায় দেড় কোটি। ব্রিটেনের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে শিশুদারিদ্রের হার দুই-তৃতীয়াংশ বেশী, আর নর্ডিক দেশগুলোর চেয়ে চার গুণ বেশি।[৬২]

যুগ যুগ ধরে যুক্তরাষ্ট্র অসম রাষ্ট্রব্যবস্থা কার্যকর রেখে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য সৃষ্টি করে বর্ণবাদ ও মহাজনী মোড়লতন্ত্র টিকিয়ে রেখেছে। এই এক শতাংশ সুবিধাভোগী মোড়লরা কখনোই চান না সাধারণ মানুষ সুশিক্ষিত ও সচেতন হোক। এ প্রসঙ্গে প্যারেন্টি লিখেছিলেন,'... ... স্বল্প আয়ের তরুণরা সরকারি সম্পদের গণমুখী পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে সংগঠিত হচ্ছে, এটা দেখার চেয়ে এই রক্ষণশীলরা দেখতে চান যে, তরুণরা মাদকের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। আজকের তরুণদের আগের প্রজন্মের তরুণরা 'ইয়াং লর্ড',

'ব্ল্যাকস্টোন রেঞ্জার' এবং 'ব্ল্যাক প্যান্থার' সংগঠনে যোগ দিয়ে বিপ্লব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিল। নগরীর দরিদ্র মানুষ অধ্যুষিত এলাকার তরুণরা পূর্ববর্তীদের মতো বিপ্লব নিয়ে কথা না বলে বরং নিজেদের শরীরে মাদকের সুঁই ফোঁটাক এবং একজন আরেকজনকে গুলি করুক রক্ষণশীলদের কাছে সেটাই বেশি কাম্য।.............................. নিউ ইয়র্কের কৃষ্ণ অধ্যুষিত হার্লেম থেকে মধ্য আমেরিকার হন্ডুরাস পর্যন্ত সর্বত্রই, নিয়ন্ত্রণাধীনে আসতে অনিচ্ছুক জনসাধারণকে নিরুৎসাহিত ও অসংগঠিত রাখতে সাম্রাজ্য সকল কৌশলই গ্রহণ করে।'[৬৩] কিন্তু বৈষম্য যখন চরমসীমায় পৌঁছায় তখন কোনো কৌশল ও নিপীড়িত হওয়ার ভয় মানুষের ওপর কার্যকর করা যায় না। সামাজিক অনাচার যখন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে, তখন মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে কিছুদিন প্রশমিত রাখা যায়। কিন্তু অনাচার যখন অনিয়ন্ত্রিত ও লাগামহীন হয়ে ওঠে তখন আর গণঅসন্তোষকে রুখে দেয়া সম্ভব হয় না। আধিপত্যবাদের বহুপাক্ষিকতার কথা আগেই বলা হয়েছে। সাম্প্রতিক পুঁজিবাদের আধিপত্যের ক্ষেত্রও যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি মানুষের অসন্তোষের পরিধিও বেড়েছে। বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারের যথেচ্ছাচারবিরোধী, যুদ্ধবিরোধী, পরিবেশবাদী, গণতন্ত্রের দাবিতে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিচর্যার ও কর্মসংস্থানের সুযোগের দাবিতে, বিশ্বায়নবিরোধী, বর্ণবাদবিরোধী, রাষ্ট্রীয় নিপীড়নবিরোধী নানা অধিকার আদায়ের আন্দোলন আজকাল প্রাধান্য লাভ করেছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে শোষণের পরিসর যেমন বেড়ে গেছে, তেমনি তথ্য-প্রযুক্তির আশীর্বাদে বিশ্বময় সে শোষণের চরিত্র প্রকাশিত হওয়ার প্রবণতাও বেড়ে গেছে। দীর্ঘদিন মানুষকে অন্ধকারে রেখে আর শোষণ চালিয়ে যাওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। নিপীড়নমূলক সরকারগুলোর বিরুদ্ধে যেমন মানুষের গণআন্দোলন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি নির্যাতিত দেশের সরকারগুলোও এখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে। পরিবেশ সংকটের মতো আন্তর্জাতিক ঝুঁকির ক্ষেত্রগুলোতে দরিদ্র দেশের সরকারগুলোরও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। আগামী দিনগুলোতে এই প্রতিরোধ আরও জোরালো হবে। বর্তমান বাস্তবতা আমাদের সেই সত্যের দিকেই ধাবিত করে।

তথ্যসূত্র

১। হায়দার আকবর খান রনো, *বিবিধ প্রসঙ্গ*, ঢাকা ঃ তরফদার প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১৪২-৩।

২। আখলাকুর রহমান, *মার্কসীয় অর্থনীতি*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ১৭৯-৮১।

৩। মাইকেল প্যারেন্টি, অনু. ওমর তারেক চৌধুরী, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, ঢাকা: তৃতীয় শ্রাবণ মুদ্রণ, ২০০৫, পৃ. ১৬৭।

৪। L.L. Fuller, *The Morality of Law*, (revised edn.), New Haven., conn : Yale University press, 1971.

৫। C.L. Ten, "Constitutionism and the Rule of Law", in Robert E. Goodin and Philip Pettit (eds.), *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, UK: Blackwell publishers Ltd., 1996, pp. 394-95.

৬। *Ibid*, p. 395.

৭। *Loc. cit.*

৮। *Loc. cit.*

৯। Bobby Tuazon, æCurrent US Hegemony in Asia Pacific", Available from http:///www. coverage. org. nz/abc/ pr. 28-84. html. [Accessed December, 2003]

১০। C.L. Ten, *Loc. cit.*

১১। Noam Chomsky, *Hegemony or Survivals: America's quest for Global Domination*, New York: Henry Holt and Company LLC., 2003, p. 152.

১২। Noam Chomsky quotes from Colombian Human Rights Committee, Colombia Update 1, no. 4 (December, 1989) in his *Hegemony or Surnivals: America's quest for Global Domination*, 2003, p. 155.

১৩। C.L. Ten. "Constitutionism and the Rule of Law", in *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, pp. 395-6.

১৪। Noam Chomsky quotes from Neely Tucker's "Detainees Seek Access to Courts" (3 December. 2002, SceA, p. 22. *Washington Post)* in his *Hegcmony or Survivals: America's quest for Global Domination*, 2003, p.24.

১৫. C.L. Ten, "Constitutionism and the Rule of Law", in *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, p.396.

১৬. C.L. Ten quotes from L.L. Fuller's (1971) *The Morality of Law* (New Haven, comn: Yale University press, p.80) in his æConstitutionalism and the Rule of Law", 1992, p.396.

১৭. David Harvey, *New Imperialism*, Oxford : Oxford University Press, 2005, p. 192.

১৮. জোসেফ ই স্টিগলিৎজ, অনু. প্রতীক বর্ধন, "এ এক অসহায়ত্বের যুগ", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৪, ১৫ অক্টোবর, ১০।

১৯। David Harvey quotes from D Armstrong's "Dick Cheny's Song of America: Drafting a Plan for Global Dominance", *(Harper's Magazine*, 305, oct, 2002, 76-83) in his *New Imperialism*, 2005, p. 80.

২০. David Harvey, *New Imperialism*, p. 82-3.

২১. *Ibid*, p. 84.

২২. Samir Amin, Tr. by Patrick Camiller, *Obsolescent Capitalism*, London & New York : Zed Books Ltd., 2003, p. 108.

২৩. V. Afanasyev, *Marxist Philosophy: A Popular Outline*, (ed. by George Hanna), Moscow: Progress publishers, 3rd ed., 1968, pp. 281-2.

২৪. Richard J. Arneson, æEquality", in *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, p. 490.

২৫। *Ibid*, p.496-97

২৬। মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ৭৫।

২৭। David Harvey quotes from G.W. Hegel's *The Philosophy of Right*, (1967, Tr. by T. knox), New York: Oxford University Press in his *New Imperialism*, 2005, p. 125.

২৮। Samir Amin, *Obsolescent Capitalism*, p.32.

২৯। Bola Jessop, æCorporatism and Syndicalism", in *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, 1996, p. 407.

৩০। *Ibid*, p. 408.

৩১। মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ.১৪৪।

৩২। *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪৯।

৩৩। V. Afanasyev, *Marxist Philosophy: A Popular Outline*, p. 284.

৩৪। *Ibid*, p. 285.

৩৫। আনু মুহাম্মদ, 'মন্দের ভালো বারাক ওবামা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১২, ৬ নভেম্বর, ১৩।

৩৬। Samir Amin, *Obsolescent Capitalism*, p. 24, 26.

৩৭। হায়দার আকবর খান রনো, *ফরাসী বিপ্লব থেকে অক্টোবর বিপ্লব*, ঢাকা: তরফদার প্রকাশনী, পৃ. ৩৩০।

৩৮। V. Afanasyev quotes from V.I. Lenin's *Selected Works*, vol. 3,p.430 in his *Marxist Philosophy: A Popular Outline*, p.306.

৩৯। Samir Amin, *Obsolescent Capitalism*, p.63-4.

৪০। *Ibid*, p.42-3.

৪১। *Ibid*, p.93-4.

৪২। হাসান ফেরদৌস, "ওবামার আমেরিকায় শ্রেণীযুদ্ধ", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১২, ২৩ নভেম্বর, ১৩।

৪৩। প্রদীপ বসু, *উত্তর আধুনিক রাজনীতি ও মার্কসবাদ*, কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ২০০৫, পৃ.২৪৮।

৪৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২-৩৩।

৪৫। V. Afanasyev, *Marxist Philosophy: A Popular Outline*, p. 306.

৪৬। Thomas W Pogge quotes from World Bank's *World Development Report 2003*, (2003, 235) in his æMoral Universalism and Global Justice", in *Globalisation and Equality*, 2006, p. 55.

৪৭। প্রদীপ বসু, *উত্তর আধুনিক রাজনীতি ও মার্কসবাদ*, পৃ.২৩২।

৪৮। J.C. Johari quotes from Mathew Arnold's "Lecture on Equality", in *Mixed Essays* (1903, pp.48-97) in his *Contemporary Political Theory: New Dimensions, Basic Concepts and Major Trends*, 1995, p. 308-9.

৪৯। আলী রীয়াজ, "নাগরিক অধিকারের সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৪, ৭ ডিসেম্বর,১০।

৫০। J.C. Johari, *Contemporary Political Theory: New Dimensions, Basic Concepts and Major Trends*, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1995, p. 643.

৫১। প্রদীপ বসু, *উত্তর আধুনিক রাজনীতি ও মার্কসবাদ*, পৃ.২৩১-৩২।

৫২। *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩৫।

৫৩। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২।

৫৪। হাসান ফেরদৌস, " 'নির্যাতন প্রতিবেদন' মুখোশ খুলে দিল মার্কিন সরকারের", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৪, ১৪ ডিসেম্বর, ০১।

৫৫। V. Afanasyev, *Marxist Philosophy: A Popular Outline*, *Loc. cit.*

৫৬। আলী রীয়াজ, "আমেরিকান রাষ্ট্র ও সমাজের গভীর ক্ষত", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৪, ২৩ আগস্ট, ১১।

৫৭। হাসান ফেরদৌস, "বর্ণবাদের বিরুদ্ধে নাগারিক সংহতি", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৪, ৯ ডিসেম্বর, ০১।

৫৮। *দৈনিক প্রথম আলো*, "সামরিক ব্যয় কমাতে পারবে যুক্তরাষ্ট্র?", ২০১৩, ৩০ এপ্রিল: ০৮।

৫৯। *দৈনিক প্রথম আলো*, "যুক্তরাষ্ট্রে আয়বৈষম্য এখন সর্বোচ্চ", ২০১৪, ১৯ ডিসেম্বর : ১৫।

৬০। Michael Parenti, "Reflections on Politics and Academia: An Interview with Michael Parenti", Interviewed by Carl Boggs in the

academic Journal *New Political Science*, Available from www. Michael Parenti. org. [Accessed 2012].

৬১। Samir Amin, *Obsolescent Capitalism*, p.78.

৬২। জোসেফ. ই স্টিগলিৎজ, অনু. প্রতীক বর্ধন, "অসমতা ও মার্কিন শিশু", *দৈনিক প্রথম আলো*, (প্রজেক্ট সিন্ডিকেট থেকে সংগৃহীত), ২০১৪, ২৫ ডিসেম্বর, ১০।

৬৩। মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ১১৯-২০।

গ্রন্থপঞ্জি

Addo, Herb, *Imperialism: The Permanent Stage of Capitalism*, Japan: The United Nations University, 1986.

Afanasyev, V., *Marxist. philosophy: A Popular Outline*, (ed. by Hanna, George), Moscow: Progress publishers, 3rd ed., 1968.

Amin, Samir, *Obsolescent Capitalism*, (Tr. by Camiller, Patrick). London & New York : Zed Books Ltd, 2003.

Arendt, Hannah, *Imperialism: The Origins of Totalitarianism*, London: Allen and Unwin, 1968.

Arneson, Richard. J., æEquality", in Goodin, Robbert. E & Pettit, Philip. (eds.), *A Companion to Contemporary Political Philosophy.* U.K : Blackwell Publishers Ltd, 1995.

Barker, E., *Political Thought in England. 1948-1914*, London : Oxford University Press, 1963.

Batty, David, Copaenhagen reaction delegates speaks, London : *The Gardian*, Retrieved 22 December, 2009.

Beckerman, Wilfred, æGlobal Warming and International Action : An Economic Perspective", in Hurrell, Andrew and Kingsbury, Benedict. (eds.), *The International Politics of the Environment*, Oxford: Clarendon Press & New York: Oxford University Press, 1992.

Belsey, Andrew, æWorld Poverty, Justice and Equality", in Attfield, Robin and Wilkins, Barry, *International Justice and the Third World*, London and New York: Routledge, 1992.

B'Tselem, *Land Grab: Israel's Settlement in the West Bank. 13.* Online at: http://www.btselem.org/English/Publicaion/Summaries/Land Grab Map.asp. [Accessed May, 2002].

Ceadel, Martin, *Thinking about Peace and War*, Oxford: Oxford University Press, 1987.

Chomsky, Noam, *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Domination*, New York : Henry Holt and Company, LLC, 2003.

Clair, Michael. J., *Blood and Oil : The Dangers and Cosequence of America's Growing*, New York: Henry Holt, 2004.

Cline, William. R., *Political Economy of the Greenhouse Effect*, *Preliminary draft*, Washington, DC : Institute for International Economics, Aug. 1989.

Cohen, Benjamin, J. *The Question of Imperialism : The Political Economy of Dominance and Dependence*, London: Macmillan, 1974.

Cullity, Garrett, æEquality and Globalization", in Horton, Keith and Patapan, Haig. (eds.), *Globalisation and Equality*, London & New York : Routledge, 2006.

Cooper, Richard. N., æUnited States Policy towards the Global Environment", in Hurrell, Andrew and Kingsbury, Benedict (eds.), *The International Politics of the Environment*, Oxford : Clarendon Press & New York : Oxford University Press, 1992.

Curran, Giorel. æEnvironment, equality and globalisation.", in Horton, Keith and Patapan, Haig (eds.), *Globalisation and Equality*, London and New York : Routledge, 2006.

Dickhut, Willi, *War and Peace and the Socialist Revolution*, Germany : Drukerei Neur Weg GmbH., 2002.

Freedman, Lawrence and Karsh, Efraim, æWhy Bush Went to War", in Freedman, Lawrence (ed.), *War*, Great Britain: Oxford University Press, 1994.

Friedman, Milton, *Capitalism and Freedom*, Chicago : Chicago University Press, 2002.

Fuchs, Christian, æNew Imperialism : Information and Media Imperialism?", *Global Media and communication*, vol. 6(1), 2010.

Fuller, L.L., *The Morality of Law*, revised edn., New Haven conn : Yale University press, 1971.

Green, Thomas Hill, *The Principles of Political Obligations*, (With an introduction by Lord Lindsay), London : Longmans, 1960.

Greenspan, Alan, *The Age of Turbulence*, London : Penguin, 2007.

Hare, J.E. & Joynt, Carey B., 'Intervention', in Freedman, Lawrence, (ed.), *War*, Great Britain: Oxford University Press, 1994.

Harshe, Rajen, *Twentieth Century Imperialism : Shifting Contours and Changing Conceptions*, New Delhi: Sage Publications India Pvt. Ltd., 1997.

Hart, Michael and Negri, Antonio, *Empire*, Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 2000.

Harvey, David, æFrom Globlization to the New Imperialism", in Appelba and Robinson, (eds.), *Critical Globalization Studies*, New York: Routledge, 2005.

_____, *New Imperialism*, Oxford: Oxford University Press, Paperback Edition, 2005.

Hayek, Friedrich, *The Road to Serfdom*, Chicago: University of Chicago Press, 1944.

Hegel, G.W.F., *Philosophy of Right*. Tr. Dyde, S.W., Canada : Batoche Books Limited, 2001.

Hilferding, R. Tr. by Watnick, Morris & Gordon, (edited with an introduction by Bottomore, Tom), *Finance Capital*. London: Routledge & Kegan Paul, 1981.

Hobson, John Atkinson, Imperialism : *A Study*, Newyork: James Pott and company, 1902.

Hunt, Geoffrey, æIs there a conflict between environmental protection and the development of the Third World?”, in Attfield, Robin and Wilkins, Barry, *International Justice and the Third World*, London and New York: Routledge, 1992.

Hurrell, Andrew and Kingsbury, Benedict, æThe International Politics of the Environment: An Introduction”, in Hurrell, Andrew and Kingsbury, Benedict. (eds.), *The International Politics of the Environment*, Oxford : Clarendon Press & New York : Oxford University Press, 1992.

Jessop, Bola, æCorporatism and Syndicalism”, in Goodin Robert. E and Pettit, Philip, *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, U.K: Blackwell Publishers Ltd, 1996.

Johari, J.C., *Contemporary Political Theory : New Dimensions, Basic Concepts and Major Trends*, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1995.

Kant, Immanuel, Tr. by Patton, H.J., *Ground Work of the Metaphysic of Morals*, New York : Harper & Row, 1964.

Kemp, Tom, æThe Marxist Theory of Imperialism”, in Boulding, Kenneth. E & Mukerjee, Tapan, (eds.), *Theories of Imperialism*, Mich : Ann Arbour, 1972

Kerr, Duncan, æReclaiming Equality in a Globalised World”, in Horton, Keith and Patapan, Haig, (eds.), *Globalisation and Equality*, London and New York : Routledge, 2006.

Khatchadourian, Haig, æTerrorism and Morality”, in Almond, Brenda, (ed.), *Applied Philosophy*, London : Routledge, 1991.

Koebner, Richard, æThe Concept of Economic Imperialism” in Boulding, Kenncth and Mukerjee Tapan (eds.), *Theories of Imperialism*, Mich: Ann Arbor, 1972.

Landes, David. S., ææThe Nature of Economic Imperialism”, in Boulding, Kenneth and Mukerjee, Tapan (eds.), *Theories of Imperialism*, Mich: Ann Arbor, 1972.

Lenin, V.I., æA Caricature of Marxism”, in *Collected Works*, London: Lawrence and Wishart, Vol. 23, 1960.

_____, Tr. and Ed. by Kutzer, Julias, *Collected Works*, Moscow : Progress Publishers, Vol. 31, 2012.

_____, Tr. & Ed. by Hanna, Georgem *Collected Works*, Moscow: Progress Publishers, Vol. 29, 2011.

_____, *Imperialism, The Highest Stage of Capitalism*, in *Selected Works* (in three volumes), Moscow: Foreign Language Publishing House, 1960.

_____, *Imperialism: the Highest Stage of Capitalism*, in Christman, Henry M, (ed.), *Essential Works Lenin*, New York: Dover, 1917.

_____, *Selected Works*, Moscow: Gaspolitizdat, vol. I, Book 2, 1960.

_____, æSocialism and War”, in *Collected Works*, Moscow: Progress Publishers, Vol. 21, 1915.

Machiavelli, Nicolo, *The Prince*, London: Oxford University Press, 1921.

Mackenzie, John. S., *A Manual of Ethics*, London : University Tutorial Press, T.D.A., 6th editions, 1964.

Marx, Karl & Engels, Frederick, *Manifesto of the Communist Party*, in *Selected Works* in two volumes, Moscow: Foreign Language Publishing House, 1962.

Mill, John Stuart, *Principles of Political Economy*, edited with an introduction by Stephen Nathanson, Indianapolis & Cambridge: Hacket Publishing Company Inc., 2004.

_____, *Utilitarianism*, New York : Everyman's Library, 1964.

Modelski, George, æThe Theory of Long Cycles and U.S Strategic Policy", in Harkavy, Robert & Kolodziej (eds.), *American Security Policy and Policy Making*, United States of America : D.C. Health and Company, 1980.

Morgenthau, Hans, æSix Principles of Political Realism", in Freedman, Lawrence, (ed.), *War*, Great Britain: Oxford University Press, 1994.

Narain, Jaya, æFury, academics claim 9/11 was an inside job", *Daily mail.* avialable from www. daily mail. co. uk. [Accessed 2006].

Nielsen, Kai, æGlobal Justice, Capitalism and the Third World", in Attfield, Robin and Wilkins, Barry (eds.), *International Justice and the Third World*, London and New York: Routledge, 1992.

Nietzsche, F., Tr. by Holingdale, R.J., *Beyond Good and Evil*, Harmonds : Penguin Press, 1973.

Nkrumah, Kwami, *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism*, NewYork: International Publishers, 1965.

Nordhaus, W.D., æThe Economic Policy making in the Face of Global Warming", This paper presented to MIT conference on Energy and the Environment, Mar. 1990.

Parenti, Michael, *Against Empire*, New York : City Light Book House, 1995.

_____, æReflections on Politics and Academia: An Interview with Michael Parentiæ, Interviewed by Carl Boggs in the academic Journal *New Political Science.* Available from www. Michael Parenti.org. [Accseed 2012].

_____, æTo kill Iraq", available from www.Michael Parenti. org. com. [Accseed 2003].

Pfeffer, J., æInternational NGO's and primary health care in Mozambique the need for new model of collaboration", *Social Science & Medicine*, 56 (4), 2003.

Piddington, Kenneth, æThe Role of the World Bank", in Hurrell, Andrew and Kingsbury, Benedict (eds.), *The International Politics of the Environment*, Oxford: Clarendon Press of New York: Oxford University Press, 1992.

Pogge, Thomas W., æMoral Universalism and Global Economic Justice", in Horton, Keith and Patapan, Haig (eds.), *Globalisation and Equality*, London and New York : Routledge, 2006.

Portes, Alejandro and Roberts, Bryan R., æFree-Market City: Latin American Urbanization in the Years of the Neoliberal Experiment", *Studies in Comparative International Development*, 2005.

Prasad, Monica, *The Politics of Free Markets: The Rise of Neoliberal Economic Policies in Britain, France, Germany and United States*, Chicago: University of Chicago Press, 2006.

Prebishcs, Raul, æThe Latin American Periphery in the Global System of Capitalism", in *Human Resources, Employment and Development IEA*., Vol. I, 1983.

Ramsey, Paul, *The Just War: Force and Political Responsibility*, New York: Charles Seribner's Sons, 1968.

Rawls, John, *Theory of Justice*, U.S.A : Harvard University Press, 1971.

Robinson, William. I., *Promoting Polyarchy : Globalization, U.S Intervention and Hegemony*, Great Britain : Athenaeum Press, 2nd ed., 1998.

Russell, Bertrand, *Human Society in Ethics and Politics*, London: George Allen & Unwin Ltd., 1954.

_____, *Power*, London: Allen & Unwin, 1938.

Shue, Henry, æLegacy of Danger: The Kyoto protocol and Future Generations", in Horton, Keith and Patapan, Haig, (eds.), *Globalisation and Equality*, London and New York: Routledge, 2006.

Stern, Roger, "The Iranian Petroleum Crisis and the United States National Security", in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 104, No. 1, 2nd January, 2007.

Ten, C.L, "Constitutionism and the Rule of Law", in Goodin, Robert. E and Pettit, Philip, *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, UK: Blackwell publishers Ltd., 1996.

Titus, Harold. H., *Ethics for Today*, U.S.A : American Book Company, 2nd ed., 1954.

Tuazon, Bobby, æCurrent US Hegemony in Asia Pacific", Available from http.///www. coverage. org. nz/abc/pr.28-84.html. [Accseed December, 2003].

Wallace, Gerry, æWar, Terrorism and Ethical Consistency", in Almond, Brenda, (ed.), *Introducing Applied Ethics*, Oxford UK & Cambridge USA : Blackwell publishers, 1995.

Williamson, John, æWhat Washington Means by Policy Reform", in John Willamson (ed.), *Latin American Adjustment: Now How Much Has Happened?* Washington, D.C: Institute for International Economics, 1990.

Winslow, E.M., *The Pattern of Imperialism: A Study in Theories of Power*, New York: Octagon press, 1972.

Beijing Declaration, Para 6.

Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal concluded at Basel, 22 Mar. ILM 28 (1989), 657.

The declaration of the Hague was signed on 11 Mar. 1989, by 24 Prime Minister or Ministers. 11 of them were heads of government or cabinet officers of OECD member states.

Embassy of Sweden, Sweden Abroad, Sudan. Available from http:/lwww.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/khartoum/Business/ Risk-capital-and-financial-support-in-emerging-markets-and-post-conflict-countries., [Accessed 2012].

Regional Conferences Latin America, Return to Contents Issue 8: Present day imperialism, Caracas: M-L Comnunist Party of Ecuador (PCMLE) & Red Flag, Party of Venezuela (Bandera Roja), 1999.

Universal Declaration of Human Rights. available from www.un.org.

http://What-when-how.com./Social Sciences/petroleum industry-social science.

Wikipedia, 2013.

আলম, মশিউল, "দেশপ্রেমের আমেরিকান মডেল", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১২, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১২।

আহমেদ, কামাল, "রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের যত মিল", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৩, ১৭ জানুয়ারি, ১০।

ইসলাম, মইনুল, *পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশ*, ঢাকা: সূচীপত্র, ২০০৬।

উমর, বদরুদ্দীন, *দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭।

______, *সাম্রাজ্যবাদের নোতুন বিশ্বব্যবস্থা*, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫।

ওয়াহাব, শেখ আবদুল, *কান্টের নীতিদর্শন*, (ইমানুয়েল কান্ট রচিত *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* এর বাংলা অনুবাদসহ কান্টের নীতিদর্শনের ব্যাখ্যা ও আলোচনা), ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ১৯৮২।

ওয়াসিফ, ফারুক, "মৃত্যুতেও তুমি জয়ী হুগো চাভেজ", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৩, ৭ মার্চ, ১০।

______, "সিরিয়ায় পোস্টপেইড নোবেলজয়ীর প্রিপেইড যুদ্ধ", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৩, ২৯ আগস্ট, ১০।

______, "বর্ণবাদী বাংলাদেশ???" available from www. facebook.com/faruk. wasif?fref=ts., [Accessd 2013] .

______, "মাইনরিটি রিপোর্ট নাফিস কাহিনী" available from www.facebook.com/ faruk.wasif?fref=ts., [Accessed 2012].

কান্ট, ইমানুয়েল, অনু. হাই, সাইয়েদ আব্দুল, *নৈতিকতার দার্শনিকতত্ত্বের মূলনীতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

কার্স্টার্স, পিটার, "তেজস্ক্রিয় অস্ত্র ব্যবহার ও লিবিয়া যুদ্ধ", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১১, ২৩ মে, ১২।

কিবরিয়া, আসজাদুল, "১০ বছরে সোয়া লাখ কোটি টাকা পাচার", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১২, ১৯ ডিসেম্বর, ০১।

চমস্কি, নোয়াম, "গণতন্ত্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের গলাবাজি খুব বাজে রসিকতা", সাক্ষাৎকার গ্রহণ; ডেভিড বারসামিয়ান, অনু. আতাউর রহমান, সাক্ষাৎকার ২০১৩, *অন্য এক দিগন্ত*: ৬৮।

চৌধুরী, আব্দুল গাফফার, "ওসামা বিন লাদেন নিহত। তিনি কি দীর্ঘজীবী হবেন?", *দৈনিক যুগান্তর*, ২০১১, ৩ মে, সম্পাদকীয় পাতা।

চৌধুরী, ইব্রাহীম, "সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ১২৮ লাখ কোটি ডলার", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১১, ৪ মে, ১০।

প্যারেন্টি, মাইকেল, অনু. চৌধুরী, ওমর তারেক, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা : শ্রাবণ প্রকাশনী, জুলাই ২০০৫।

ফস্টার, জন বেলামি, "সর্বাধিক পরিমাণে তেল উৎপাদন এবং ইন্ধন সাম্রাজ্যবাদ", চৌধুরী, ফারুক (অনূদিত ও সম্পাদিত), *বাজার ও বৈষম্য: মান্থলী রিভিয়ু প্রবন্ধ সংকলন*, ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৯।

ফিস্ক, রবার্ট, 'কার পক্ষে লড়ছেন ওবামা!', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৩, ৩০ আগস্ট, ১৩।

ফেরদৌস, হাসান, "ওবামার আমেরিকায় শ্রেণীযুদ্ধ", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১২, ২৩ নভেম্বর, ১৩।

______, " 'নির্যাতন প্রতিবেদন' মুখোশ খুলে দিল মার্কিন সরকারের", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৪, ১৪ ডিসেম্বর, ০১।

______, "বর্ণবাদের বিরুদ্ধে নাগারিক সংহতি", *দৈনিক প্রথম আলো*,২০১৪, ৯ ডিসেম্বর ০১।

বসু, প্রদীপ, *উত্তর আধুনিক রাজনীতি ও মার্কসবাদ*, কলকাতাঃ পুস্তক বিপণী, ২০০৫।

মজীনা, ড্যান ডব্লিউ, "যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ", *দৈনিক প্রথম আলো,* সাক্ষাৎকার, ২০১২, ১৮ জুন, ১২।

মাইলাম, উইলিয়াম. বি, "কম নিরপেক্ষ পরিবেশে নির্বাচন মঙ্গলজনক হবে না", *দৈনিক প্রথম আলো,* সাক্ষাৎকার, ২০১৩, ৩ মার্চ, ১০।

ম্যাকচেজনি, রবার্ট, "গণমাধ্যম ফার্মগুলোর বাণিজ্যিক কেন্দ্রীভবনঃ যোগাযোগীয় অধিকারের প্রতি হুমকি", আহ্‌মেদ, মুসতাক, ফেরদৌস, নূর-এ-জান্নাতুল, ইসলাম, হুজ্জাতুল (অনু. ও সম্পা.), *কর্পোরেট মিডিয়ার সাংস্কৃতিক আগ্রাসন*, ঢাকা : শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৯।

মীর্জা, মাহা, "৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি সমাহার", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১২, ১১ ডিসেম্বর, ১২।

মুহাম্মদ, আনু, *অর্থশাস্ত্র পরিচয়*, ঢাকাঃ সংহতি প্রকাশন, ২০১০।

______,*পুঁজির অন্তর্গত প্রবণতা*, ঢাকা : সংহতি প্রকাশন, ২০১০।

______,*পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও অনুন্নত বিশ্ব*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকাঃ শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৬।

______, *বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিমুখ*, ঢাকাঃ শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৫।

______, *বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল*, ঢাকাঃ প্রচিন্তা প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯।

______, 'মন্দের ভালো বারাক ওবামা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১২, ৬ নভেম্বর, ১৩।

রনো, হায়দার আকবর খান, *আজকের সাম্রাজ্যবাদ*, ঢাকাঃ গণ প্রকাশন, ২০০৬।

______, *ফরাসী বিপ্লব থেকে অক্টোবর বিপ্লব*, ঢাকা ঃ তরফদার প্রকাশনী, ২০০৭।

______, *বিবিধ প্রসঙ্গ*, ঢাকা ঃ তরফদার প্রকাশনী, ২০০০।

______, *মার্কসীয় অর্থনীতি*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকাঃ তরফদার প্রকাশনী, ২০০৭।

রশীদ, হারুন, *মার্কসীয় দর্শন*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭।

রহমান, আখলাকুর, *মার্কসীয় অর্থনীতি*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭।

রামাদান, তারিক, অনু. হাবীব, আহসান, "আরব ও পাশ্চাত্যের সম্পর্কের হেমন্তকাল", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১১, ১২ মে, ১২।

রীয়াজ, আলী, "আমেরিকান রাষ্ট্র ও সমাজের গভীর ক্ষত", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৪, ২৩ আগস্ট, ১১।

______, "নাগরিক অধিকারের সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৪, ৭ ডিসেম্বর, ১০।

______, "সিরিয়ায় সম্ভাব্য মার্কিন হামলা নিয়ে নানা প্রশ্ন", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৩, ৫ সেপ্টেম্বর, ১০।

সিঙ্গার, পিটার, অনু. রায়, প্রদীপ কুমার, *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৪।

সোবহান, রেহমান, *বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার সংকট: বাংলাদেশের অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধাবলী*, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৩।

স্পেরো, জোয়ান এডলম্যান, অনু. আহমদ, মমতাজউদ্দীন, *আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের রাজনীতি*, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮৪।

স্টিগলিৎজ, জোসেফ. ই, অনু. বর্ধন, প্রতীক, "অসমতা ও মার্কিন শিশু", *দৈনিক প্রথম আলো*, (প্রজেক্ট সিন্ডিকেট থেকে সংগৃহীত), ২০১৪, ২৫ ডিসেম্বর, ১০।

______, "এ এক অসহায়ত্বের যুগ", অনু.বর্ধন, প্রতীক, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৪, ১৫ অক্টোবর, ১০।

হেইনমান, টিম, অনু. ওয়াসিফ, ফারুক, "মিয়ানমারের জাতিগত দ্বন্দ্ব ও যুক্তরাষ্ট্র", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১২, ১৩ অক্টোবর, ১২।

হেয়টার, টেরেসা, *বিশ্বদারিদ্র*, অনু. গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা: গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার, ১৯৮৩।

হোসেন, আকমল, নাসের, মো. খান, আসাদউল্লাহ, নাসরীন, গীতি আরা ও অন্যান্য, "সুন্দরবনকে বাঁচতে দিন?", *সাপ্তাহিক একতা*, ২০১৩, ২৯ সেপ্টেম্বর, ০৬।

দৈনিক প্রথম আলো, 'ইরাক যুদ্ধের ছায়া', ২০১৩, ৩০ আগস্ট: ০৮।

______,, "ইরাকে রাস্তায় পড়ে থাকে মরদেহ, চরম দুর্দশা, হাসপাতাল কর্মীরা পালিয়ে যাচ্ছেন : রেডক্রস", ২০০৭, ১২ এপ্রিল : ১০।

______, "ওরা কোথায় গেল!", ২০০৭, ২৭ জুলাই : শুক্রবারের সাময়িকীর চলতি বিশ্ব পাতা।

______, "গুয়ানতানামোয় বৃটিশ নাগরিককে নির্যাতনের অভিযোগ", ২০০৭, ২১ আগস্ট : ১১।

______, "চাভেজ অসম্পূর্ণ বিপ্লবের নায়ক!", ২০১২, ২ অক্টোবর: ১০।

______, "তদবিরে কোটি ডলার ব্যয় করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ১৫টি প্রতিষ্ঠান", ২০১২, ১৭ ডিসেম্বর:১৩।

______, "নাইজেরিয়ায় মার্কিন ওষুধ কোম্পানি ফাইজারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের", ২০০৭, ৬ জুন : ১০।

______, "নির্যাতনের আধুনিক পদ্ধতি", ১৪ ডিসেম্বর: শুক্রবারের সাময়িকীর চলতি বিশ্ব পাতা, ২০০৭।

______, "নোয়াম চমস্কির সঙ্গে সংলাপ: বিষয় সামরিক শাসন", ২০০৭, ৫ মে : ১২।

______, "পৃথিবীব্যাপী শরণার্থীর সংখ্যা বাড়ছে", ২০০৭, ২০ জুন : ১০।

______, "বিদেশি হস্তক্ষেপের বৈধতা আছে কি?", ২০১৩, ২৯ আগস্ট: ০৮।

______, "বিশ্বায়নবিরোধীদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ", ২০০৭, ১০ জুন : ১০।

______, "বেসরকারীকরণের পর অনেক তথ্যই আর পাওয়া যাচ্ছে না", ২০১২, ৮ আগস্ট: ১৫।

______, "বেসামরিক ইরাকিদের হত্যার ঘটনায় ব্ল্যাক ওয়াটার জড়িত", (*নিউইয়র্ক টাইম্‌স* এর প্রতিবেদন অনুসরণে), ২০০৭, ৪ অক্টোবর : ১০।

______, "যুক্তরাষ্ট্রে আয়বৈষম্য এখন সর্বোচ্চ", ২০১৪, ১৯ ডিসেম্বর : ১৫।

______, "যুক্তরাষ্ট্রে ধনীদের ওপর কর বৃদ্ধির প্রস্তাব বাতিল", ২০১২, ২২ ডিসেম্বর: ০৯।

______, "রবার্ট ফিস্কের কলাম", (লন্ডনের *দি ইনডিপেন্ডেন্ট* থেকে ভাষান্তরিত), ২০০৭, ২ সেপ্টেম্বর: ১২।

______, "রামজি বারুদের কলাম", আল-জাজিরা ডট নেটের সৌজন্যে প্রাপ্ত, ২০০৭, ১৩ সেপ্টেম্বর : ১২।

______, "শান্তিরক্ষা বাহিনীতে দেশের ভাবমূর্তি বাড়বে: প্রধানমন্ত্রী", ২০১৩, ১০ এপ্রিল: ১৬।

______, " শেভরনের বিস্ফোরক ভর্তি জাহাজ আটক", ২০১৩, ১৯ জানুয়ারিঃ ২০।

______, 'সামরিক পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে পেন্টাগন', ২০১৩, ২৫ আগস্টঃ ০৭।

______, "সামরিক ব্যয় কমাতে পারবে যুক্তরাষ্ট্র?", ২০১৩, ৩০ এপ্রিলঃ ০৮।

______, "স্বপ্নের নায়ক চাভেজ", ২০১৩, ৮ মার্চঃ ১০।

______, "স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থরক্ষায় সোচ্চার বাংলাদেশ", ২০১৩, ৬ ডিসেম্বর : ১৫।

______, "হামলার পক্ষে মার্কিন সিনেট কমিটি", ২০১৩, ৫ সেপ্টেম্বর : ০৯।

দৈনিক যুগান্তর, "রবার্ট ফিস্কের কলাম", (কাউন্টারপাঞ্চ থেকে ভাষান্তরিত), ২০০৭, ১২ জুনঃ১০।